চিতা-বহ্নিমান

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

পূজনীয়া কাকীমা

শ্রীমতী ননীমুখী দেবী

শ্রীচরণকমলেষু—

ফাল্গুনী

মানবসমাজ যুগযুগান্ত ধরিয়া অনন্তের উদ্দেশে, অমৃতের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে নির্ভয়ে তাহার অন্তর-প্রদীপখানি জ্বালাইয়া। এই অভিসার-পথের শেষ হয়তো সে পায় নাই, তথাপি উচ্চতর জীবনানুভূতির এই যে আকুতি—ইহাই তাহাকে করিয়াছে সৎ—সুন্দর,—শাশ্বত—পার্থিব অন্য যে কোন জীব অপেক্ষা উন্নততর! মানুষের অন্তরের সেই অনুভূতির সর্ব্বোচ্চ স্তর প্রেম—চির-জানা, চির-অজানা, যাহাকে সম্পূর্ণভাবে জানিবার সাধনাই সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

সাহিত্য মানব-জীবনকে শুচি, শুভ্র ও সুন্দর করিবে, তাহাকে তাহার আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে—জানাইয়া দিবে সে মানুষ,—সে অন্য জীব হইতে স্বতন্ত্র; এইখানেই তাহার সার্থকতা। যে সাহিত্য প্রেমের মুখোস পরিয়া নির্লজ্জ কামায়ণের অভিব্যক্তিতে অতিসাধারণ মানুষের অবসর বিনোদনের সহায়তা করে—তাহা সাহিত্যের ব্যভিচার মাত্র।

তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান সর্ব্বসাধারণের আশীর্ব্বাদে জয়যুক্ত হউক—ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

বিনীত—

প্রকাশক

তপতী বড় হইয়া উঠিল।

মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আধুনিক যুগে অবশ্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই, তথাপি একমাত্র কন্যার বিবাহটা একটু শীঘ্রই দিবার ইচ্ছা মিঃ শঙ্কর চ্যাটার্জির! সম্বন্ধও পাকা এবং দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। বাকি শুধু বিবাহটার!

তপতী এবার বি, এ, পরীক্ষা দিবে, তাহারই জন্য ব্যস্ত সে। বিবাহের নামে বাঙালী মেয়েরা যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তপতীর তাহা কিছুই হয় নাই। কেন হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে—বাপ-মার হাতের দেওয়া অনিবার্য্য শাস্তি যখন লইতেই হইবে, তখন ভাবিয়া লাভ কি! বিয়েটা হইয়া গেলেই আনন্দ-বা-নিরানন্দ যাহোক একটা করা যাইবে। এখন পরীক্ষার পড়াটা করা যাক্।

কিন্তু ইহাতে ভাবিবার কিছুই নাই। তপতীর জন্য ভদ্রবংশের জনৈক শিক্ষিত এবং সুন্দর যুবক প্রস্তুত হইতেছেন! আর তপতী তাঁহাকে দেখিয়াছেও। বিবাহের পর যুবকটিকে বিলাতে পাঠান হইবে পূর্ত্তবিদ্যা শিখিবার জন্য, ইহাই মিষ্টার এবং মিসেস চ্যাটার্জির ইচ্ছা।

এই তপতী—শিক্ষিতা, আধুনিকা এবং প্রগতিবাদিনী। উহাকে লাভ করিবার জন্য সোসাইটির কোন যুবক না সচেষ্ট! দিনের পর দিন তপতীকে ঘিরিয়া তাহারা গুঞ্জন তুলিয়াছে, গান করিয়াছে, গবেষণা করিয়াছে তপতীর ভবিষ্যৎ লইয়া। হাঁ, তপতী অনিন্দ্যা, অনবদ্যাঙ্গী অসাধারণীয়া। কিন্তু এহেন তপতীকে লাভ করিবে মাত্র একজন, ইহা সহ্য করা অপরদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু উপায় কি? ধনী পিতা তাহার, যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাহারই হাতে কন্যা দান করিবেন। অপরের তাহাতে কি বলিবার থাকিতে পারে!

মিঃ চ্যাটার্জির "তপতী-নিবাস" নামক নবনির্মিত বিশাল প্রাসাদে মহা-সমারোহে বিবাহোদ্যোগ চলিতেছে। বর এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু বরযাত্রীগণ প্রায় অনেকেই আসিয়াছেন এবং খাইতেছেন। রাত্রি প্রায় দশটা, অতি মলিন বেশ, ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে, মাথার চুল সম্পূর্ণভাবে মুণ্ডিত একটি যুবক আসিয়া মিঃ চ্যাটার্জির সহিত দেখা করিতে চাহিল। বিবাহ-সভায় এরূপ অতিথি কেই বা পছন্দ করে! কিন্তু যুবক দেখা করিবেই।

মিঃ চ্যাটার্জি কন্যা সম্প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তথাপি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিজের খাস কামরায় নামিয়া আসিলেন।

একখানি জীর্ণ দলিল বাহির করিয়া যুবক বলিল, আমার বাবার বাক্সে এই দলিলখানি পেয়েছি, এটা আপনার—আর সম্ভবতঃ দরকারী। দয়া করে গ্রহণ করুণ। মিঃ চ্যাটার্জি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—তুমি মহাদেবের ছেলে? এত বড়ো হয়েছ! বসো বাবা, আজ আমার মেয়ের বিয়ে, এখানেই খেয়ে যাবে!

—আমার কিন্তু অন্যত্র কাজ ছিল। যুবক সবিনয়ে জানাইল।

—তা থাক, কাজ অন্যদিন করবে, বসো!

মিঃ চ্যাটার্জি দলিলখানি গ্রহণ করিলেন। সত্যই দরকারী দলিল। যুবককে আর একবার বসিতে অনুরোধ করিয়া তিনি ভিতরে গেলেন।

বর আসিয়াছে এবং বরের পিতা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মিঃ চ্যাটার্জি আসিতেই তিনি বলিলেন,—

—পণএর টাকাটা আমায় দিয়ে দিন, তারপর ছেলে আপনার, যা-খুসি করবেন তাকে নিয়ে।

—হ্যাঁ, বেয়াই মশাই, কাল-পরশুই আপনার টাকাটা দিয়ে দেবো।

—কেন? আজই দিয়ে ফেলুন না! ছেলে তো আমি বেচেই দিচ্ছি। নগদ কারবারই ভালো।

—এ রকম কথা কেন বলছেন বেয়াই-মশাই! মিঃ চ্যাটার্জি অত্যন্ত আহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

—বলছি, যে, আমায় যে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার কথা, সেটা দিয়ে ছেলেকে আপনার নিজস্ব করে নিন্; আমি নগদ কারবারই ভালোবাসি!

—কিন্তু আজই তো দেবার কথা নয়। আর এই রাত্রে অত টাকা কি করে দেওয়া যাবে বলুন! নগদ টাকাটা কাল নিলে কি ক্ষতি হবে আপনার!

—ওসব চলবে না চ্যাটুজ্যেমশাই, টাকা না-পেলে আমি পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবো!

—উঠিয়ে নিয়ে যাবেন?

বিরাট বিবাহ সভা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সভ্য, শিক্ষিত সমাজে এরূপ একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে, কেহ কল্পনাও করে নাই। মিঃ চ্যাটার্জি রুদ্ধ-রোষ দমন করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, যান উঠিয়ে নিয়ে, টাকা দেবো না!

—হেমেন—চলে এসো—বলিয়া বরকর্ত্তা ডাক দিলেন। বর তৎক্ষণাৎ সুড়সুড় করিয়া উঠিয়া আসিল। বরকর্ত্তা মিঃ চ্যাটার্জিকে উদ্দেশ করিয়া

বলিতে লাগিলেন—ফাঁকি দিয়ে বিয়েটি আজ সেরে নিয়ে কাল উনি আমায় কলা দেখাবেন! ওসব চলবেনা চাটুজ্যে মশাই, আমার পণএর টাকাটা ফেলে দিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে যা ইচ্ছে করুন! আপনি তো ধনী, টাকাটা না-দেবার কি কারণ থাকতে পারে?

—টাকা দেবো না! মিঃ চ্যাটার্জি সরোষে বলিয়া উঠিলেন।

—আচ্ছা, তাহলে—হেমেন, চলে এসো!

বর ও বরকর্ত্তা উঠিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলে "আঃ, কি করেন ঘোষাল মশাই, বসুন," বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি দারোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওঁরা, বেরিয়ে গেছেন? বেশ, গেট্ বন্ধ করে দাও, আর যেন না ঢোকেন।

সকলে অবাক হইয়া গেল। মিঃ চ্যাটার্জি খাসকামরায় আসিয়া ডাকিলেন—তোমার বিয়ে এখনো হয়নি তো বাবা?

—আজ্ঞে না। কেন?

—এসো, তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা ছিল, তোমাকে আমার জামাই করবো। এতদিন ভুলে ছিলুম, তাই ঈশ্বর আজ ঠিক দিনটিতে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। এস বাবা!

—আমি? আমি কি আপনার মেয়ের যোগ্য?

—নিশ্চয়! তুমিই তার যোগ্য।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অসামান্যা সোসাইটি গার্ল তপতী চ্যাটার্জির সহিত নিতান্ত এক দীনহীন ব্রাহ্মণ যুবকের বিবাহ হইয়া গেল।

তপতীর পুরুষ বন্ধুরা, যাহারা কৌশলে এই বিবাহ পণ্ড করিবার জন্য ঘোষাল মহাশয়কে টাকা চাহিতে বলিয়াছিল, বুঝাইয়াছিল যে মিঃ চ্যাটার্জির মৎলব ভাল নয়—তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল, তপতীকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের কাহাকেও ডাকা হইল না। সব আশায় তাহাদের ছাই পড়িল দেখিয়া তাহারা মুণ্ডিত-মস্তক, রৌদ্রদগ্ধ,

গোবেচারী বরের মুণ্ডপাত কামনা করিয়া গৃহে ফিরিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত রহিল না।

পরদিন সকালে কুশণ্ডিকার পর বরকে জিজ্ঞাসা করা হইল—বাবাজি কতদূর পড়াশুনো করিয়াছ? উত্তরে তপনজ্যোতি জানাইল, অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্কুল হইতেই তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অবশ্য নিজে বাড়ীতে সে তাহার পর যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়াছে। পিতৃবিয়োগের পরবৎসরই মাতৃবিয়োগ হওয়ায় সে অনাথ হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সম্প্রতি গয়ায় পিতৃতর্পণ শেষ করিবার সময় পিতার বাক্সের কাগজপত্রাদি নদীর জলে বিসর্জ্জন দিতে গিয়া মিঃ চ্যাটার্জির দলিলখানি দেখিতে পায় এবং উহাই তাহাকে এখানে আসিতে বাধ্য করে।

শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। তপতী চ্যাটার্জির মত সুন্দরী, শিক্ষিতা বি-এ পড়া মেয়ের এই কি উপযুক্ত বর! মেয়েরা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, পুরুষেরা সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে—ওকে তো আর চাকরী করতে হবে না। সই করতে পারলেই চলে যাবে। তপতীর সমবয়সী বন্ধুগণ সামনে সহানুভূতি জানাইয়া অন্তরালে বলিল, —আচ্ছা হয়েছে! যেমন অহঙ্কারী মেয়ে!

তপতী নিজে কিছুই বলিল না। গত রাত্রে ব্যাপারটার আকস্মিকতা তাহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, বরের সহিত আলাপ করা হইয়া উঠে নাই। পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই অযোগ্যের হাতে দিবেন না, এই বিশ্বাসই তাহার ছিল, আজ কিন্তু সমস্ত শুনিয়া পিতার বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর কিছুই করিবার নাই।

মিঃ চ্যাটার্জি ও মিসেস চ্যাটার্জি দুঃখিত হইলেন। জিদের বশে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু নিরুপায়ের সান্ত্বনা স্বরূপ তিনি ভাবিলেন, তাঁহার জামাতাকে তো কেরাণীগিরি করিতে হইবে না। নাইবা হইল সে বি-এ, এম-এ পাশ। কন্যাকে ডাকিয়া তিনি শুধু বলিলেন,—

—খুকী, তোর বাবার অপমানটা ও বাঁচিয়েছে, এইটুকু মনে রাখিস্।

খুকী তথাপি চুপ করিয়া রহিল এবং পরীক্ষার পড়ায় মনোযোগ দিবার জন্য পাঠগৃহে চলিয়া গেল।

তপনজ্যোতি জানাইল,—সে যেখানে থাকে তাহাদিগকে বলিয়া আসা হয় নাই, অতএব সে আজ যাইতেছে, আগামী কল্য সকালে ফিরিয়া আসিবে।

উৎসবগৃহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের সংলগ্ন বারান্দায় একখান সোফা পুষ্প-পত্র দিয়া সাজান হইয়াছে। চন্দ্রালোকে তাহা স্নিগ্ধ হইয়া বর-বধূর অপেক্ষা করিতেছে। তপনজ্যোতিকে আনিয়া সেখানে বসানো হইল। দুইচারজন রসিকা তাহার সহিত রহস্যালাপের চেষ্টাও করিল, কিন্তু তপনজ্যোতি বিশেষ কোন সাড়া দিল না! সকলেই বুঝিল—পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কথা কহিতে জানে না। বিরক্ত হইয়া সকলে চলিয়া গেল। তপনজ্যোতি তখন ভাবিতেছিল, যাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে, কেমন সে, তপনজ্যোতিকে সে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না! মন তাহার এতোই উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে যে অন্য কাহারও সহিত কথা বলা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অধীর চিত্তে সে বধূর অপেক্ষা করিতে লাগিল। সঙ্গিনীগণ তপতীকে লইয়া আসিল। তপনের হৃদয় নবোঢ়া বধূর মতই দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তপতী কিন্তু সঙ্গিনীগণকে দরজা হইতেই বিদায় করিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং যে বারান্দাটুকুতে বর বসিয়াছিল, তাহার ও

ঘরের মধ্যকার দরজাটি সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া যেন তপনকে বুঝাইয়া দিল যে শয়নকক্ষে বরের প্রবেশ নিষেধ।

কাচের সার্সির মধ্যে চাহিয়া তপন দেখিতে লাগিল, তপতী শয়নের বেশ পরিধান করিল, তারপর উজ্জল আলোটা নিবাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ নীল আলো জ্বালাইল এবং সটান শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

তপন স্তম্ভিত! অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, হয়ত তপতী জানে না যে, সে এখানে বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে সে রুদ্ধ দরজার বাহিরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—তপতী! দরজাটা খোল!

তপতী পিছন ফিরিয়া শুইয়াছিল। তেমনি ভাবেই জবাব দিল, —ঐখানেই থাকুন।

তপনের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম বিমূঢ় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে তো তাহার আশঙ্কাই সত্য হইয়াছে। তপতী তাহাকে গ্রহণ করিবে না। তাহার পঞ্চবিংশ বর্ষের নির্ম্মল নিষ্কলুষ প্রেমকে তপতী এমন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল! কিন্তু কি কারণে! অর্থাভাবে সে কলেজে পড়িতে পারে নাই, কিন্তু পড়াশুনা সে যথেষ্টই করিয়াছে এবং এখনো করে! এই কথা সে আজ নিজে তপতীকে জানাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সুরুতেই তপতী তাহাকে এমনভাবে বাধা দিল যে কিছুই আর বলিবার উপায় রহিল না। নীরবে সে ভাবিতে লাগিল, তাহাকে গ্রহণ না-করিবার কি কি কারণ তপতীর পক্ষে থাকিতে পারে। সে ডিগ্রীধারী নয়, কিন্তু পড়াশুনা সে ভালই করিয়াছে এবং সে-কথা গতকল্য যতদূর সম্ভব জানাইয়াছে। অবশ্য আত্মশ্লাঘা করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই যথাসম্ভব বিনয়ের সহিতই জানাইয়াছে। দ্বিতীয়, সে পল্লীগ্রামে জন্মিয়াছে কিন্তু সে তো সহরবাসের অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছে; তৃতীয়, ব্রাহ্মণত্বের গোঁড়ামী তাহার একটু বেশী, তপতী একথা মনে করিতে পারে—কিন্তু বি-এ পড়া মেয়ের পক্ষে কাহাকেও কিছুমাত্র চিনিবার চেষ্টা না করিয়াই একটা বিরুদ্ধ

ধারণা করা কি ঠিক! তপনের চেহারা এমন কিছুই খারাপ নয় যে তপতীর চক্ষু পীড়িত হইবে। বরং চেহারার প্রশংসাই তপন এতাবৎকাল শুনিয়াছে। তবে হইল কি?

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে তপনের দুটী চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। জীবনের কত সাধ, কত আশা আজই বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তপনেরই অন্তর-বেদনা যেন শিশিরে শিশিরে ঝরিতেছে। কিন্তু এই গভীর বেদনাকে এত শীঘ্র বরণ করিয়া লইবে তপন! নাঃ—আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। তপন বলিতে চাহিল—ওগো, তুমি যাহা মনে করিয়াছ, তাহা আমি নহি, আমায় সুযোগ দাও, আমি তোমার যোগ্য হইবার চেষ্টায় জীবনপাত করিব।

তপন পুনরায় উঠিয়া দেখিতে লাগিল তপতীর শয্যালুণ্ঠিত সুকোমল দেহখানি। তপতী ঘুমাইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ বেণীদুটি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া কোমরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে, যেন দুইটী কৃষ্ণকায় সর্প তাহাকে পাহারা দিতেছে। সুখসুপ্তির সুদীর্ঘ নিশ্বাস তপনকে জানাইয়া দিল—তপতী তাহার নহে, তাহার হইলে এত সহজে, এত নিরুদ্বেগে সে এমন করিয়া ঘুমাইতে পারিত না।

চকিতে তপনের মস্তিষ্কে একটা বিদ্যুৎচিন্তা খেলিয়া গেল। তবে, তবে হয়ত যাহার সহিত তপতীর বিবাহ হইল না, তাহাকেই সে ভালবাসে—কিম্বা—ভাবিতে গিয়া তপন অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। যুগসঞ্চিত হিন্দুসংস্কারে গঠিত তাহার মন যেন কোন অতল বিষ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। একি হইল! তাহার সুন্দর সুনির্ম্মল জীবনে এ কার অভিশাপ! সে তো ইহা চাহে নাই। ধনী-কন্যাকে বিবাহ করিবার লোভ তাহার কোন দিন ছিল না। কিন্তু যাক—তপন স্থির করিয়া ফেলিল, তপতীকে কিছুই সে বলিবে না। তাহার বাঞ্ছিতকে—যদি অবশ্য তপন ব্যতীত অপর কেহ তাহার বাঞ্ছিত হয়—ফিরিয়া পাইতে তপন সাহায্যই করিবে।

তপন সেই যে ভোরে উঠিয়া গিয়া তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষটিতে শয়ন করিয়াছে, বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, এখনো উঠে নাই। প্রথমে সকলেই ভাবিয়াছিল, ইহা বধূর সহিত রাত্রি-জাগরণজনিত অনিদ্রার আলস্য। কিন্তু তপতী দিব্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দেহমনে ক্লান্তির কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন—হাঁরে, তপন কখন ওঘরে গিয়ে শুয়েছে? এখনো উঠছে না কেন?

—আমি তার কি জানি—বলিয়া তপতী অন্যত্র চলিয়া গেল।

ইহাকে নবোঢ়ার লজ্জা মনে করিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মা চিন্তিত মুখে তপনের ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—গা অত্যন্ত গরম—তপন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। প্রথম ফুলবাসরের পরেই জামাইয়ের জর—আধুনিক সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও তপতীর মা'র মনের সাধারণ বাঙ্গালী-মেয়ের সংস্কার ইহাকে অমঙ্গল-সূচক মনে করিল। ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—জর কেন হোল বাবা? কখন থেকে হোল?

তপন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, শিয়রে জ্যোতির্ম্ময়ী জননী মূর্ত্তি। তাহার চিরদিনের স্নেহবুভুক্ষু মন কাঁদিয়া উঠিল—

"স্নেহ-বিহ্বল করুণা ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখিরে"

তপন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই মা, আর ঐ তাঁর মেয়ে! ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার তপন জীবনে আর দেখে নাই। স্নিগ্ধ শিশু-কণ্ঠে সে উত্তর দিল—একটু ঠাণ্ডা লেগেছে মা, কিছু ভয়ের কারণ নাই, একটা দিন উপোষ দিলেই সেরে যাবে!

—ডাক্তার ডাকি বাবা—জননীর স্নেহকরপুট তপনের ললাটে নামিল।

—না মা, ওষুধ আমি খাইনে—কিছু ভাবনা নেই আপনার। আমি কালই ভাল হয়ে যাবো মা—আপনার মঙ্গল হাতের ছোঁয়ায় অসুখ কতক্ষণ টিকতে পারে?

পুত্র-বঞ্চিতা শিক্ষিতা জননী এমন করিয়া মা-ডাক কোনদিন শুনেন নাই। অন্তর তাঁহার বিমল মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

আপনার গর্ভজাত পুত্রের স্থানেই তিনি তপনকে সেই মূহূর্ত্তে বরণ করিয়া লইলেন,—বলিলেন—কি খাবে বাবা, সাবু?

—না মা, সাবু আমি খেতে পারি নে, বেঙাচির মত দেখতে লাগে।

—আচ্ছা বাবা, একটু গ্লাক্সো দিই।

—শুধু একটু গরম দুধ দেবেন মা,—এ বেলা আর কিছু খাবো না। আর আমি একা শুয়ে থাকবো—আপনার খুকীর বন্ধুরা যেন আমায় জ্বালাতন না করে; এইটুকু দেখবেন।

—আচ্ছা, আমি বারণ করে দেবো।

মা চলিয়া গেলেন, তপন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কূলহীন পারহীন চিন্তা-সমুদ্রে সে যেন তলাইয়া যাইতেছে। কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে আজ? এতাবৎকাল সে নিজের জীবনকে যে-ভাবে গঠিত করিয়াছে, তাহাতে তপতীকে বিবাহ করার পর অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা তাহার কল্পনারও অতীত, অথচ তপতীকে পাইবার সমস্ত আশাই বুঝি নির্ম্মূল হইয়া গেল! কিন্তু মা! আশ্চর্য্য ঐ মহিমময়ী নারী! উহার গর্ভে জন্মিয়াছে সে, যাহাকে গত রাত্রে তপন দেখিয়াছে! যে নিষ্ঠুরা নারী শীতের রাত্রে একজনকে বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারে! কিম্বা তপন ভুল দেখিয়াছে, সে ইহার কন্যা নহে। কিন্তু যতদূর মনে হয়, ইনিই মা এবং এই সংসারের কর্ত্রী। ইহারই কন্যা এত নিষ্ঠুর হইল কিরূপে? হিন্দুনারী হইয়াও আপনার স্বামীকে বুঝিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না, বুঝাইবার সুযোগ পর্য্যন্ত দিল না! ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য যতই ভীতিপ্রদ হউক, যেমনই কদর্য্য হউক, তপন তাহাকে আবিষ্কার করিবে। তারপর যথা কর্ত্তব্য করা যাইবে।

ভাবিতে গিয়া তপন আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।—যদি সে দেখে, তপতী অন্যাসক্তা, তপতী তাহার অন্তরে অপরের মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিতেছে —তপন কি করিবে? ভাবিতে গিয়াই তপনের মনে হইল—হয়ত তাহাই সত্য, তপনকে তাহাই সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং তপতীকে সুযোগ দিতে হইবে তাহার বাঞ্ছিতকে লাভ করিবার জন্য। বর্ত্তমানে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভাবিবার নাই। যদি সত্যই সে কাহাকেও ভালবাসে তবে তাহাকেই লাভ করুক। অন্যথায় তাহার কুমারী-হৃদয় একদিন তপনের কাছে ফিরিয়া আসিবে—সেই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করিবে তপন। যদি তাহাও না হয় তবে তপনের জীবন—সে তো চিরদিনই দুঃখের তিমির-গর্ভে চলিয়াছে, তেমনই চলিবে।

ক্লান্ত তপন কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

সহরতলীর সর্পিল পথ ধরিয়া চলিয়াছে বিনায়ক। মন তার বিষাদখিন্ন। তার একমাত্র অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু তপনের অন্তরে বিষাক্ত কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে। সে কাঁটা তুলিয়া ফেলার উপায় বাহির করা সহজ নহে, কারণ তুলিতে গেলে তপনের হৃদপিণ্ডটিকে জখম করিতে হয়। বিনায়ক ভাবিতেছে আর চলিতেছে। দিকে দিকে বাসন্তী শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছে; মাঘ মাসের শেষ হইয়া আসিল। সরস্বতী পূজা, কিন্তু পূজার শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তপন আসিবে না। বিনায়কের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তপনের বিরুদ্ধে। কেন সে না দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে গেল? মিঃ চ্যাটার্জির বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তো তপনের লোভ নাই। লোভ তাহার কিছুতেই নাই। আজ দ্বাদশ বৎসর বিনায়ক তপনকে দেখিয়া আসিতেছে। অথচ সেই তপন কিনা এক কথায় মিঃ চ্যাটার্জির মেয়েকে

বিবাহ করিয়া বসিল ? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে। নহিলে সারা বাংলা দেশে তপনের মত ছেলের বধূ যোগাড় করা কিছুই কঠিন ছিল না।

বিনায়ক গভীর দুঃখের মধ্যে আত্মবঞ্চনার শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে; তাহার হাসি পাইল নিজের বোকামীর জন্য। তপন কোনদিন বিনা কারণে কিছুই করে না। তপনের হৃদয়, আকাশের তপনের মতই জ্বলন্ত, জাগ্রত, জ্যোতির্ম্ময়।

কারখানায় আসিয়া পড়িল বিনায়ক। খেলনা তৈয়ারীর ছোট্ট কারখানা। তপনের মস্তিষ্ক-উদ্ভূত নানাপ্রকার খেলনা এখানে তৈরী হয় শিশুমনের উৎকর্ষতার উপযোগী করিয়া। তপনই ইহার জনক এবং বিনায়ক তাহার মালিক ও পরিচালক। তপন নিজের খাওয়া পরার যৎসামান্য খরচ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করে না। কারণ সে একা, তাহার খরচ খুবই কম, আর বিনায়কের মা-ভাই-বোন আছে, বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে হয় এবং বাজার করিয়া খাইতে হয়।

বিনায়ককে একা আসিতে দেখিয়া শ্রমিকবর্গ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, —ছোট্‌দা কই বড়দাদাবাবু ?

শ্রান্তকণ্ঠে বিনায়ক উত্তর দিল—অসুস্থ ! তোমাদের জন্য মা'র কাছে প্রার্থনা জানিয়ে দু'লাইন কবিতা পাঠিয়েছে :—

"দীর্ণ-জীর্ণ জীবনে তোমার বাসন্তী-বিভা ছড়ায়ে দিও,
দুঃখ-আর্ত্ত-বঞ্চিত প্রাণে নব যৌবনে আশ্বাসিও।"

এইবার এসো ভাই সব, পূজায় বসি।

সকলেই ক্ষুব্ধ হইল, উদ্বিগ্ন হইল কিন্তু পূজার সময় হইয়াছে। বিনায়ক পূজায় বসিল। করযোড়ে কর্ম্মিগণ উপবিষ্ট রহিল।

পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করিয়া বিনায়ক বলিল—তোমাদের ছোট্‌দা দুচারদিন আসতে পারবে না ভাই সব, অসুখের জন্য নয়, অন্য কারণ আছে। ভেবো না তোমরা।

—তিনি ভালো আছেন তো ?

—হাঁ, সামান্য সর্দ্দি মত হয়েছে।

বিনায়ক একাকী ফিরিয়া চলিল। দুই পাশে কচুরীপানার জঙ্গল শুকাইয়া উঠিয়াছে। দূরে দূরে দুই একটা গাছে লাল ফুল ফুটিতেছে। বাসন্তীর আগমনে সবই যেন লাল হইয়া যায়, এমন কি, তপনের হৃদয়টাও আজ রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বিনায়ক নিশ্বাস ফেলিল একটা।

তপন, তাহার বাল্যবন্ধু তপন—জীবনে যে কোনদিন কোনরূপ অসৎকার্য্য করে নাই, কাহারও মনে বেদনা দেয় নাই, জীবন পণ করিয়া যে পরোপকারবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সেই তপনের জীবনে এমন দুর্ব্বিপাক কেন ঘটিল ? তপন না থাকিলে মাতা-ভ্রাতা-ভগিনীকে লইয়া বিনায়ক আজ ভাসিয়া যাইত। এম-এ পাশ করিয়াও যখন চল্লিশ টাকার চাকুরী জুটিল না তখন একদিন নিরাশ নয়নে গড়ের মাঠে বিনায়ক বসিয়া ভাবিতেছিল, আত্মহত্যাই তাহাকে করিতে হইবে। ঠিক সেই সময় তপন রাস্তার উপর-দাঁড়ানো মোটরগাড়ীর আরোহীগণকে বিক্রয় করিতেছিল তাহার স্বহস্তের প্রস্তুত খেলনা। বিনায়ককে ক্লান্ত অবসাদখিন্ন দেখিয়া সেই তো এই কারখানার পত্তন করে নিজের হাতের আংটি বেচিয়া। সেদিন ছিল তিন টাকা ভাড়ার একটি চালাঘর এবং দুইজন শ্রমিক, বিনায়ক আর তপন। সে আজ আট বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। আজ এই কারখানায় পঞ্চাশ জন শ্রমিক কাজ করে। প্রস্তুত খেলনা বিদেশী খেলনার সহিত প্রতিযোগিতা করে। নীট্ আয় মাসিক দুই শত টাকার কম নয়।

কিন্তু তপন ইহার কতটুকু অংশ গ্রহণ করিয়াছে! মাসে পনর টাকাও সে গ্রহণ করে নাই, সবই বিনায়কের সংসার পালনের জন্য দান করিয়াছে। এই অসাধারণ বন্ধুবৎসল তপন আজ ভাগ্যের ফেরে ক্ষতচিত্ত, আর্ত্তহৃদয়—অথচ বিনায়ক তাহার কোন উপকার করিতে

পারে না! হয়ত পারে। বিনায়ক দ্রুত পা চালাইয়া নিকটবর্ত্তী একটি দোকানে আসিয়া কয়েক আনা পয়সা দিয়া ফোন করিল।

অসুস্থ তপন আসিয়া ফোনে বলিল,—কি বলছিস্ বিনু?

—তুই আত্মপরিচয় কেন দিবিনে তপু—তাহলে সে তোকে ভালবাসবে!

—না, তার দরকার নাই। যে আমায় কুৎসিৎ দেখে ভালবাসলো না, সে আমায় সুন্দর দেখে ভালবাসতে পারে না, যে আমায় মূর্খ ভেবে গ্রহণ করলো না, আমাকে পণ্ডিত দেখে গ্রহণ করবার তার আর অধিকার নেই। যদি সে অন্য কাউকে চায় তবে তারই হাতে ওকে তুলে দেবো।

—কিন্তু তাহলে......

—থাক্ বিনু—এসব কথা ফোনে হয় না।

তপন ফোন ছাড়িয়া দিয়াছে। বিনায়ক গভীর শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িল। বাড়ী আসিয়া যখন সে পৌছিল তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে এবং স্নেহময়ী জননী তাহার আহার্য্য লইয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছেন।

বিনায়ক খাইতে বসিল।

তপতী চ্যাটার্জি সাবান-ঘষা একরাশ চুলে লাল ফিতা বাঁধিয়া বাসন্তী রং-এর কাপড় পরিয়া সেতার কোলে চলিয়াছে কলেজ-হোষ্টেলে সরস্বতী পূজা করিবার জন্য। সেখানে সে গাহিবে, নাচিবে এবং রূপের বিদ্যুতে সকলকে চমকিত করিয়া দিবে।

মা বলিলেন—খুকী, তপন ওঘরে সরস্বতী পূজা করছে, যা প্রণাম করে আয়।

নাক বাঁকাইয়া তপতী কহিল,—তুমি যাও, আমার প্রণাম করবার ঢের জায়গা আছে।

তপতী গিয়া গাড়ীতে উঠিল। তপতীর দুই একজন বন্ধু, যাহারা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তাহারা কিন্তু তপনকে একবার দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। তপনের কক্ষদ্বারে গিয়া দেখিল, ক্ষৌম-বস্ত্র-পরিহিত, উত্তরীয়-আবৃত-দেহ তপন পিছন ফিরিয়া পূজা করিতেছে। তাহার মুণ্ডিত মস্তকের উপর লাউয়ের বোঁটার মত টিকিতে একটা গাঁদা ফুল। তরুণীর দল আর স্থির থাকিতে পারিল না। একটা ছোট্ট কাঁচি আনিয়া তপনের টিকিটি আমূল ছাটিয়া দিল। হাসির উচ্ছল শব্দে মুখ ফিরাইয়া তপন দেখিল, ঘরে চাঁদের হাট। সে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া পূজা করিতে লাগিল। তাহার চন্দন-চর্চ্চিত মুণ্ডিত মুখশ্রী আধুনিক আলোকপ্রাপ্তাদের মোটেই ভাল লাগিল না। তাহার উপর তপন কয়েকদিনের অসুস্থতার জন্য দাড়ি কামায় নাই, ইহা তাহার দ্বিতীয় অপরাধ। সর্ব্বোপরি সে যে-পুস্তক খানির উপর পুষ্পার্ঘ অর্পণ করিতেছিল, সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, লালচে রংএর কাগজের মলাটে তাহার নাম লেখা "হারু ঠাকুরের পাঁচালী।"

ঐ বটতলার নিদারুণ অশ্লীল বই তপন পড়ে এবং সরস্বতীর পূজার জন্য উহারই উপর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে! ইহা অপেক্ষা কদর্য্যতার পরিচয় আর কি হইতে পারে! উহার আর কোন বই নাই, আর কিছু পড়িবার যোগ্যতা নাই! কি হইবে উহার সহিত রসিকতা করিয়া। তরুণীদল বাহিরে আসিল মুখ টেপাটেপির হাসিতে। তপতীর অদৃষ্ট সম্বন্ধে যাহারা এতাবৎ ঈর্ষাপরায়ণা ছিল, তাহারা বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল; তপনের অর্ব্বাচীনতাটা তাহারা আজ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

গাড়ীতে বসিয়া তপতী বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঝঙ্কার দিয়া কহিল—এরকম দেরী করলে যাবো না আমি! রেবা মৃদু হাসিয়া

বলিল,—দেখে এলাম তোর বর—পাঁচালি পড়ছে। এবার সচিত্র প্রেম-পত্তর আউড়ে চিঠি দেবে তোকে—"যাও পাখী বলো তারে—"

সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন তপনের কর্ত্তিত টিকিটি আনিয়াছিল, তপতীর অঞ্চল-বিদ্ধ ব্রোচ্ টিতে সেই টিকিটি আটকাইয়া দিয়া কহিল—তোর বরের মাথার ধ্বজা—রাখ্ বুকে গুঁজে!

আবার হাসি! রাগে তপতীর যেন বাকরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; রোষকষায়িত নয়নে সে ড্রাইভারকে ধমক দিল—জল্‌দি চালাও—জল্‌দি! বান্ধবীদের মধ্যে একজন সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল,—তপু, কি করে জীবনটা কাটাবি তুই?

অন্যজন বলিল,—রিয়েলি, উই আর সো শ্যরি!

তৃতীয়া বলিল,—মন্দই বা কি ভাই! বেশ হুকুম মত চল্‌বে, গা-হাত-পা টিপে দেবে, মাঝে মাঝে পাঁচালি পড়ে শোনাবে, দরকার হলে রান্না-বান্নাটাও—

হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে আর একজন বলিল.—চেহারাটাও ঠিক রাঁধুনী বামুনের মতন।

তপতীর আপাদমস্তক জ্বলিতেছে, কিন্তু উপায় নাই। ইহারা যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঐ রকমই নিশ্চয়, বিরুদ্ধে তপতী কিছুই বলিতে পারে না। তাহার যত রাগ গিয়া পড়িল তাহার বাবার উপর। বাবা তাহার একি করিলেন? একটা নিতান্ত অশিক্ষিত, সভ্য সমাজের অপাংক্তেয় ছেলের সহিত তপতীর বিবাহ দিলেন। আশ্চর্য্য! ইহাই যদি বাবার মনে ছিল তবে তপতীকে তিনি এত লেখাপড়া শিখাইলেন কেন? তপতী তো ঠাকুরদার কাছে যতটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছিল তাহাতেই বেশ চলিত। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর তপতীকে কলিকাতায় আনিয়া তিনি কলেজে ভর্ত্তি করিয়াছেন। তাহার জন্য গানের মাষ্টার রাখিয়াছেন, নাচের মাষ্টার রাখিয়াছেন! পাঁচ-সাতটা

ক্লাবে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন, এক কথায় সম্পূর্ণ আধুনিক ছাঁদে তপতীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা কি ঐ পাঁচালীপাঠকারী টিকিওয়ালা গণ্ডমূর্খের জন্যই! বেশ—তপতী ইহার শোধ তুলিয়া তবে ছাড়িবে।

তপতীর ব্যবহার কয়েক দিন মিসেস্ চ্যাটার্জি লক্ষ্য করিতেছিলেন। আজ তাহার মুখে বিদ্রোহের বাণী শুনিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিলেন। গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া তপতী সীমাহীন তিক্ততার সহিত জানাইল—আমার বন্ধুরা তোমার জামাইয়ের কাছে যেন না যায়, বুঝেছো—তা হলে আমায় বাড়ীছাড়া হতে হবে।

—কেন?—মা স্নিগ্ধকণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন!

—কেন! তপতীর কণ্ঠে অগ্ন্যুদগার হইল—কেন, তা জানো না! একটা হতভাগা মূর্খ লোককে ধরে এনেছো—টিকি রাখে, পাঁচালী পড়ে—আবার কেন! লজ্জা করলো না জিজ্ঞাসা করতে?

মা নিঃসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তে সামলাইয়া কহিলেন, —গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে এসেছে, তাই টিকি রয়েছে, ওটা তুই ছেঁটে দিস্!

—তুমি ছাঁটো গিয়ে, ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে—আর পাঁচালী শুন্‌বে—।

—পাঁচালী পড়তে আমি বারণ করে দেবো, খুকী!

—কিছু তোমায় করতে হবে না, শুধু এইটি করো যেন আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা না হয়, তা'হলেই বাধিত থাকবো।

তপতী রোষভরে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। মা একবার তপনের কক্ষে আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া গেলেন, ক্লান্ত অসুস্থ তপন একক-শয্যায় ঘুমাইতেছে। কক্ষের মৃদু আলোক তাহার প্রশস্ত ললাটে আসিয়া পড়িয়াছে—যেন রূপকথার রাজপুত্র, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এখনি জাগিয়া উঠিবে। মিসেস্ চ্যাটার্জি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, এমন সুন্দর ছেলে, লেখাপড়া কেন সে শেখে নাই! পর মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল তপনের দারুণ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কথা। পিতার মৃত্যুর পর

পিতৃহীন হইয়া তপনকে পাঠ্য পুস্তক বেচিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়। কিন্তু কি-ই বা উহার বয়স? এখনো তো পড়াশুনা করিলেই পারে!

মিসেস চ্যাটার্জি স্বামীর কক্ষে আসিলেন। মিঃ চ্যাটার্জি তখনও তাঁহার অপেক্ষায় জাগিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—খুকী ফিরেছে?

—হাঁ, এইমাত্র ফিরলো!

মিঃ চ্যাটার্জি নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন। মিসেস চ্যাটার্জি কয়েক মিনিট ভাবিয়া বলিলেন,—খুকী কিন্তু তপনকে মোটেই পছন্দ করছে না।

বিস্ময়ের স্বরে মিঃ চ্যাটার্জি কহিলেন,—কেন! অপছন্দের কি কারণ?

—ছেলেটাকে আমার তো খুব ভাল লাগছে গো, তবে লেখাপড়া ভালো জানে না, পাঁচালী, ছড়া, এই সব নাকি পড়ে! খুকী তো এই ক'দিন একবারও তার কাছে যায় নি। কতবার বললাম, জ্বর হয়েছে, একবার যা, কাছে গিয়ে বোস, তা কথাই কানে তুললো না। আজ আবার এসে বললো, তার বন্ধুরাও যেন ওর কাছে না যায়। আমি বাবু বেশ ভাল মনে করছি না। অত বড় মেয়ে!

পত্নীর এতগুলি কথার উত্তরে মিঃ চ্যাটার্জি হাসিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন,—খুকীর পরীক্ষাটা হয়ে যাক—তারপর দেখে নিও। ও ছেলেকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, আর জানতাম ওর বাবাকে। সেই বাপের শতাংশের এক অংশও যদি ও পেয়ে থাকে, তা হলে ও হবে অসাধারণ।

—কিন্তু খুকী যে ওর সঙ্গে মিশছেই না—বলে মুর্খ, পাড়াগেঁয়ে!

—মূর্খ তো নয়ই, পাড়াগেঁয়েও নয়। আমি দুচারটা কথা কয়েই বুঝেছি। কিছু ভেবো না তুমি, আমি ওকে পরশু থেকেই আমার ব্যবসায়-এ লাগাব, আর তোমার খুকী ইতিমধ্যে পরীক্ষাটা দিয়ে নিক্। তারপর দুজনকে শিলংএ নতুন বাড়ীটাতে দেব পাঠিয়ে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, পাঁচালী, ছড়া, এ সব পড়ে কেন? ইংরাজী না জানুক, বাংলা ভালো বই, মাসিকপত্র, এসব তো পড়তে পারে!

—তুমি বোলো সে কথা। আর ইংরাজি যে একেবারে জানে না, তা তো নয়, যা জানে তাতে আমার অফিসের কাজ চলে যাবে; আর তোমার ঐ আধুনিক সমাজের ধারাধরণ শিখতে মাস খানেকের বেশী লাগে না। আমি ওকে আপ-টু-ডেট করে দিচ্ছি। ভেবো না তুমি।

মিসেস চ্যাটার্জি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন মিসেস চ্যাটার্জি তপনকে চা খাওয়াইতে বসাইয়া বলিলেন, —তুমি পাঁচালী কেন পড় বাবা? খুকীর বিস্তর মাসিক পত্রিকা আসে—সেই গুলো পড়ো। ভাল ভাল বাংলা বই পড়ো, বুঝলে!

উত্তরে তপন স্মিত হাস্যে কহিল,—পাঁচালী বাংলার আদি সাহিত্য মা, ওর ওপর এত রাগ কেন আপনাদের!

—না বাবা, আজকাল ওগুলো আর চলে না কি না, তাই বলছি। আধুনিক সমাজে ওর কদর নেই।

—কিন্তু আমি আধুনিক নই মা, অত্যন্ত প্রাচীন, আপনার শ্বশুরের মতন প্রাচীন। আর ঐ পাঁচালীখানা আপনার শ্বশুরমশায়ের—আপনারই বাড়ীতে পেয়েছি কাল!

স্নিগ্ধ মধুর হাসিয়া মিসেস চ্যাটার্জি বলিলেন,—ওঃ তাই বলো বাবা, তুমি শ্বশুর—আবার ফিরে এলে বুঝি?

তপন মৃদু হাসিয়া বলিল,—হাঁ, মা, এবার ছেলে হয়ে এলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি যে সমাজে বাস করেন সে সমাজে এরূপ কথার চলন বিশেষ নাই, সেখানে কথা-বার্ত্তার স্রোত আন্তরিকতাহীন কৃত্রিমতার মধ্যে বহিয়া যায়। কিন্তু সে-সব ছেঁদো কথা এমন করিয়া তো মনকে আকর্ষণ করে না। এ যেন নিমেষে আপন করিয়া লয়। তপন যেন ক্রমশঃ তাঁহার পুত্রহীনতার স্থানটিকে জুড়াইয়া দিতেছে। এমন সুন্দর ছেলেকে

খুকী তাঁহার গ্রহণ করিবে না! নিশ্চয় করিবে। খুকীর পরীক্ষাটা হইয়া যাক—তারপর মিসেস চ্যাটার্জি খুকীর উপর চাপ দেবেন। তপন তো বাড়ীতেই রহিল। ব্যস্ত হইবার কিছু কারণ নাই।

পরদিন সাহেব কোম্পানীর দোকানের কোট-প্যান্টালুন পরাইয়া মিঃ চ্যাটার্জি তপনকে নিজের অফিসে লইয়া গেলেন। তপন এখন হইতে তাঁহাকে কাজ কর্ম্মে সাহায্য করিবে।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার টু-সীটার খানায় খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া তপতী স্নান করে এবং বাপের সহিত চা খাইয়া পড়িতে বসে। তপন সে-সময় আপনার ঘরে স্নান করিয়া পূজা করিতে থাকে। যখন তপন খাইতে আসে তখন একমাত্র মিসেস চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেহই থাকে না।

খাইয়াই তপন বাহির হইয়া যায়, বহুস্থানেই তাহাদের কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টে বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাই দেখিতে। ফিরিয়া যখন আসে তখন তপতী খাইয়া বিশ্রাম করিতেছে আপনার ঘরে। তপন মধ্যাহ্ন-ভোজন সারিয়া আবার বাহির হয় অফিসে। বিকাল সাড়ে পাঁচ-ছয়টায় ফিরিয়া আসে জল খাইবার জন্য। তপতী তখন কোন দিন বন্ধুদের লইয়া বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছে, কোন দিন-বা লনে টেনিশ খেলিতেছে, কোন দিন হয়ত বন্ধুবান্ধবদের সহিত সঙ্গীতের আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। তপনের সহিত তাহার সাক্ষাতের অবসর নাই, ইচ্ছাতো নাই-ই। দৈবাৎ উহা ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, কিন্তু তপতী যতখানি এড়াইয়া চলে, তপন এড়াইতে চায় ততোধিক। বৈকালিক জলযোগ সারিয়া তপন পুনরায় বাহিরে চলিয়া যায় এবং ফিরিয়া আসে রাত্রি সাড়ে দশটার আগে নয়।

মিষ্টার বা মিসেস চ্যাটার্জি তাহাকে এতখানি পরিশ্রম করিতে দিতে চান না, কিন্তু তপন মৃদু হাসিয়া বলে,—গরীবের ছেলে মা আমি, খেটে

খেতেই তো জন্মেছি। মিসেস চ্যাটার্জি ক্ষুব্ধস্বরে বলেন,—সে যখন ছিলে বাবা, ছিলে, এখন তো তোমার কিছু অভাব নাই, অত খাট্‌নি কমাও তুমি। তপন আরো মধুর করিয়া উত্তর দেয়—বাবাকে একটু সাহায্য করবার জন্য আমি চেষ্টা করছি মা,—আমার বিদ্যে-সাধ্যি অল্প, তাই খুব সাবধানে কাজ করি, যাতে ভুল কিছু না হয়। খাট্‌নি আমার কিছু লাগে না মা।

মিসেস চ্যাটার্জির আর কিছু কথা যোগায় না। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—তোমার জন্য একটা গাড়ী কিনে দিই বাবা।

—কি দরকার মা! ট্রামে তো দিব্যি যাচ্ছি-আসছি।

কিন্তু পরদিন মিঃ চ্যাটার্জি তপনের জন্য একখানা গাড়ী কিনিয়া আনিলেন। তপন সেদিন নূতন গাড়ী চড়িয়া অফিসে গেল। বিকালে ফিরিয়া গাড়ীখানা গাড়ীবারান্দায় রাখিয়া সে জল খাইতে বসিয়াছে, তপতী দেখিল, নূতন গাড়ীখানা দেখিতে খুবই সুন্দর। সে অন্য সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া গাড়ীটাকে লইয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল। তপন নীচে আসিয়া দারোয়ানের মুখে দিদিমণির কীর্ত্তি শুনিয়া মৃদু হাসিল এবং ট্রামের পাশখানা পকেটে ঠিক আছে, দেখিয়া লইয়া হাঁটিয়া গিয়া ট্রামে উঠিল।

রাত্রে ফিরিতেই মা বলিলেন,—খুকীটা বড্ড দুষ্ট বাবা, তোমার গাড়ী নিয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিল। আবার বক্‌তে গেলুম, তো হাসে!

—নিক্‌-না মা; ছেলেমানুষ, ঐ গাড়ীটা যদি ওর ভাল লাগে তো নিক—আমি ট্রামে বেশ যাতায়াত করতে পারি।

—না বাবা, তুমি এমন কিছু বুড়ো মানুষ নও। আর খুকীর তো গাড়ী রয়েছে। তুমি দিও-না ওকে তোমার গাড়ী।

উত্তরে তপন মৃদু হাসিল, কিছুই বলিল না। খাইতে খাইতে সে ভাবিতে লাগিল, তপতীর ইহা নিছক ছেলেমানুষি, নাকি, ইহার অন্তরালে আরো কিছু আছে? এই দীর্ঘ পনরদিন একটিবারও তপনের সহিত

তাহার দেখা হয় নাই। দুজনেই দুজনকে এড়াইয়া চলিয়াছে ; হঠাৎ তাহার জন্য ক্রীত গাড়ীখানা লইয়া তপতীর বেড়াইতে যাইবার উদ্দেশ্য কি ? সে কি চায় যে তপন তাহার সহিত মিশুক, তাহার সঙ্গে বেড়াইতে যাক—কিম্বা তাহার বিপরীত ! তপন কিছুই স্থির করিতে পারিল না। খাওয়া শেষ করিয়া আপনার কক্ষে গিয়া শয়ন করিল।

কিন্তু ঘুম কি আসিতে চায় ! তপতী তাহার পঞ্চবিংশতি বর্ষের জীবনে জ্বাল ধরাইয়া দিয়াছে। তপন এই কয়দিন লক্ষ্য করিয়াছে, যাহাদের সহিত তপতী বেড়াইতে যায়, গান করে, টেনিশ খেলে, তাহারা সকলেই আধুনিক সমাজের তরুণ-তরুণী ; সুশ্রী, সভ্য এবং সর্ব্বতোভাবে তপতীর যোগ্য। এত লোককে ছাড়িয়া কেন যে মিঃ চ্যাটার্জি তপনের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, তপন তাহা ভাবিয়া পায় না। তাহার পিতার সহিত নাকি মিঃ চ্যাটার্জির বন্ধুত্ব ছিল। তপন যখন নিতান্ত ছোট তখনই নাকি মিঃ চ্যাটার্জির কন্যার সঙ্গে তপনের বিবাহের কথা হয়। কিন্তু এতদিন মিঃ চ্যাটার্জি সে কথা ভুলিয়াই-বা রহিলেন কেন, আর আজ এতকাল পরে সেই অঘটনটা ঘটাইয়াই-বা দিলেন কেন ! কিন্তু ভাবনা নিষ্ফল। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া স্নান-পূজা যথারীতি সারিয়া সে বাহিরে যাইবার জন্য আজো তাহার গাড়ীখানি লইতে আসিয়া দেখিল, তাহারই গাড়ী লইয়া তপতী প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনো ফিরে নাই। তপতীর গাড়ীটা অবশ্য গ্যারেজেই রহিয়াছে, কিন্তু তপনের উহা লইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। শুধু সঙ্কোচ বলিলেই যথেষ্ট হয় না, হয়তো একটু ঘৃণার ভাবও মনে আসিল তাহার। কতদিন তপন দেখিয়াছে, ঐ গাড়ীখানার চালকের স্থানে তপতী এবং পাশে হয় মিঃ ব্যানার্জি, না হয় মিঃ অধিকারী কিম্বা মিঃ চৌধুরী—কোনদিন বা তিনজনই। ও গাড়ী না লওয়াই ভালো। তপন ট্রাম ধরিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

তপতী বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার টু-সীটার গ্যারেজে রহিয়াছে। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল—জামাইবাবু গাড়ী নেহি লিয়া?

—নেহি হুজুর—ট্রামমে চলা গিয়া।

তপতী উপরে চলিয়া আসিল এবং নিঃশব্দে আপন ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে বসিল। মা কিন্তু সমস্তই জানিয়াছেন; কন্যার ঘরে আসিয়া একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন,—খুকী, আজও তুই ওর গাড়ী নিয়েছিলি?

—নিলুম তো কি হোল মা? ও আমার গাড়ীটায় চড়লো না কেন? বলে দিও ঐটা নিতে! এ গাড়ীটা বেশ দেখতে, তাই নিয়েছিলুম। এই গাড়ীটাই আমি নেবো এবার থেকে!

মা বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—কেন, তোর গাড়ী কি মন্দ?

—মন্দ কেন—এটা নতুন, বেশ রংটা আর দৌড়ায় খুব। কিন্তু আমার গাড়ীটাও খারাপ নয়—চড়ে দেখতে বলো একদিন।

তপতী মধুর হাসিল। মা ভাবিলেন, খুকী তাঁহার জামাতার সঙ্গে ভাব করিতে চায়। বয়স্কা মেয়ে, লজ্জায় সব কথা খুলিয়া বলে না, আর এযুগের মেয়েদের চিনিবারও উপায় নাই। হয়ত খুকী তপনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কিছু কহিয়াছে, হয়ত ইহা ভালরই লক্ষণ। মা খানিকটা স্বস্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন,—বেশ তো, দুজনে বদ্‌লাবদ্‌লি করিস।

—হাঁ, তুমি বলে দিও সে কথা!

তপতী পাঠে মন দিল। মা চলিয়া আসিলেন। দুপুরে তপন খাইতে আসিলে মা বলিলেন,—তুমি খুকীর গাড়ীটাই নাও বাবা, তোমার গাড়ীর সবুজ রং ওর বড্ড পছন্দ হয়েছে, তাই তোমারটাই নিতে চাইছে।

—বেশ তো মা, ও নিক্—গাড়ীর আমার কী-ই-বা দরকার? তখনও যেমন চলছিলাম, এখনো তেমনি চলবো ট্রামে।

—না, বাবা—না—মা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহলে আমি খুকীর কাছ থেকে গাড়ীটা কেড়ে নেবো।

—ছিঃ মা, ওর এখন পড়ার সময়, মনে আঘাত পাবে। আমি কিছু মনে করছি না মা, দুটো গাড়ীই থাকলো, যখন যেটাতে খুসী ও চড়বে।

—তুমি তাহলে কি ট্রামেই চড়বে বাবা—? মাতার স্বরে আতঙ্কের আভাস স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

হাসিয়া তপন বলিল—আচ্ছা মা, আমি একটা মোটর বাইক কিনে নেবো।

—বড্ড বিপজ্জনক গাড়ী বাবা—ভয় করে।

—কিছু ভয় নেই মা, আমার জীবনে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে না।

মা খানিকটা আশ্বস্ত হইয়াও বলিলেন,—মেয়েটার কি যে কাণ্ড!

—আপনার খুকীর গাড়ী নাহলে একদিনও চলে না, আর আমার পা-গাড়ীতে আমি পঁচিশ বছর চলে এলুম। আমার জন্য অত ভাবছেন কেন মা! তাছাড়া মোটর বাইকে চড়তে আমি ভালো বাসি!

—বেশ বাবা, তাই করো তাহলে—আজই কিনে নাও একখানা মোটর বাইক।

খাওয়ার শেষে আপন কক্ষে আসিয়া তপনের হাসি পাইতে লাগিল। প্রাচুর্য্যের মধ্যে যাহাদের বাস তাহারা অর্থ-সম্পদ দিয়াই মানুষকে বশ করিতে চায়। কিন্তু মানুষ যে অর্থের অপেক্ষা অন্য একটা জিনিষের বেশী আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা ইহারা কিরূপে জানিবে? যাক্, মোটর বাইক একখানা কিনিতেই হইবে, নতুবা মা ভাবিবেন, খুকীর উপর তপন রাগ করিয়াছে। পরদিনই তপন একটা মোটর বাইকে চড়িয়া বাড়ী ফিরিল।

পরীক্ষার জন্য তপতী কিছুদিন যাবৎ অত্যন্ত ব্যস্ত তাই তাহার সঠিক স্বরূপ তপন দেখিতে পাইতেছে না। তথাপি সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে,

তপতীর নিকট তপনের কোন আশা নাই। তপতী তাহার বন্ধুদের মধ্যে কাহাকেও নিশ্চয় ভালবাসে, কিম্বা এমনও হইতে পারে, তপতী আজো কাহাকেও ভাল বাসিবার সুযোগ পায় নাই, তবে তপনকে যে সে কোনো দিন গ্রহণ করিবে না, ইহা নানাভাবে বুঝাইয়া দিতে চায়।

আজও তপন বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহার মোটরবাইকখানা লইয়া সেই যে তপতী লনের চক্রাকার পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, নামিবার নামটি নাই। তপন নীরবে গেটের নিকট মিনিটকয় দাঁড়াইল,—ভাবটা,— তাহাকে দেখিয়া যদি তপতী বাইকখানা ছাড়িয়া দেয়। তপন পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তপতী বাইকের বিকট শব্দ করিয়া বাহির হইয়া গেল একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে। অর্থাৎ এবাড়ীর সব জিনিষেই তপতীর অধিকার, তপনের কিছুমাত্র অধিকার নাই। তপন হাঁটিয়া গিয়া ট্রামে উঠিল। তারপর সে সনাতন ট্রামেই যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল।

মা কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে মেয়েকে বলিলেন,—এসব তোর কি কাণ্ড খুকী!

উচ্ছ্বল হাসিতে ঘর ভরাইয়া তুলিয়া খুকী জবাব দিল,—

—জানো মা, মোটর গাড়ী সব মেয়েই চালায়, কিন্তু মোটরবাইক চালাতে বেশী মেয়ে জানে না—আমি তাদের হারিয়ে দিলাম।

মা খুসী না হইয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—তোর বাবাকে বল, তোর জন্যে একখানা কিনে দিক, ওরটা কেন নিলি ?

—নিলুম, তাতে তোমার জামাই ধন্য হ'য়ে যাবে, বুঝেছো!

তপতী হাসিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল একটা ইংরাজী গানের এক লাইন গাহিতে গাহিতে।

খুকীর মন তপনের প্রতি অনুকূল না প্রতিকূল! আপনার গর্ভজাত কন্যার অন্তর-রহস্য মা আজ কিছুমাত্র অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না।

তাঁহাদের সময়ে এসব ছিল না। ধনী শ্বশুরের আদরিণী পুত্রবধূ হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, প্রথম দর্শনের দিনটি হইতেই স্বামীকে আপনার বলিয়া চিনিয়াছিলেন, স্বামীও তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ-যুগের আবহাওয়া কখন কোন্ দিক দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা বুঝিবার সাধ্য স্বয়ং মহাকালের আছে কিনা সন্দেহ।

তপন বাড়ী ফিরিলে তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—ট্রামেই তো এলে বাবা? তপন।

—হাঁ মা। কিন্তু আপনি এত ভাবছেন কেন! ট্রামে বিস্তর বড়লোকের ছেলে চড়ে। ট্রাম কিছুই খারাপ নয় মা।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দরিদ্র এই ছেলেটী নিজেকে দরিদ্র বলিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। এখনি হয়ত বলিয়া বসিবে, "আমি ফুটপাতের মানুষ মা, আপনার আবুহোসেনি রাজত্বে এসে নাই-বা চড়লাম মোটরে। রাজত্ব তো র'য়েছে!" আর ইহাকে দেওয়া জিনিষ যখন তাঁহারই মেয়ে কাড়িয়া লইয়াছে তখন বেশি কিছু বলিতে যাওয়া উচিত নয়। হয়তো মনে করিবে, নিজের মেয়েকে ব'লতে পারেন না, যত কথা আমাকে বলা হয়। উহার ভালমান্‌ষির সুযোগ লইয়া খুকী কিন্তু বড়ই অন্যায় করিতেছে, একটু ভাবিয়া বলিলেন, —খুকীর গাড়ীটাইবা কেন তুমি নাও-না বাবা?

—গাড়ীর দরকার নেই মা, অনর্থক কেন ভাবছেন আপনি! আর দরকার যখন হবে তখন নেবো। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আমরা বুঝব সে-সব!

মা ভাবিলেন, হয়তো তাহাই ঠিক,—খুকীর সহিত তপনের কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে। তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

আহারান্তে তপন চলিয়া যাইতেছিল, মা বলিলেন,—খুকীর জন্মদিন বাবা, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো!

চেষ্টা ক'রবো মা—বলিয়া তপন চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় বাড়ীতে মহা সমারোহ। আধুনিক সমাজে বিবাহের পূর্ব্বেই অবশ্য মেয়ের জন্মদিন-উৎসব ধুমধামে হইয়া থাকে, বিবাহের পর উহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়; কারণ, জন্মদিন-উৎসবটা ছেলেদের ও মেয়েদের পরস্পর পছন্দ করিয়া বিবাহ-বন্ধনের জন্য প্রস্তুত হইবার দিন। কিন্তু তপতী ইহাদের একমাত্র কন্যা. তাই জন্মদিনটা এবারও হইতেছে।

তপতীর বন্ধুর দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গান গাহিতেছে একটি মেয়ে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তপতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। অনেকেই মিসেস চ্যাটার্জিকে জামাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিসেস চ্যাটার্জি প্রত্যেককে জানাইলেন, সে জরুরী কাজে গিয়াছে, এখনি আসিবে।

মিসেস চ্যাটার্জির অসাক্ষাতে মিঃ অধিকারী কহিলেন,—সেই বামুন ঠাকুরটি কোথায় গেলেন? ভয়ে পালিয়েছেন নাকি?

মিঃ ব্যানার্জি উত্তর দিলেন—ভয়ে নয়, ভাবনায়; আমরা তার বোকামী ধরে ফেলবো বলে!

মিঃ চৌধুরী বলিলেন,—রেবা দেবী সেদিন তার টিকি কেটে দিয়েছেন।

রেবা দেবী কহিলেন,—মাথাটা মুড়োনো আছে, তুই ঘোল ঢেলে দিস তপতী!

—না না না মিস্ চ্যাটার্জি, ঘোল নয়, ওর মাথায় কড্‌লিভার অয়েল দেবেন, চুলগুলো একটু ভিটামিন খেয়ে বাঁচবে!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিস্ চ্যাটার্জি আখ্যাতা তপতী কহিল,—চুপ করুন, মা শুনতে পেলে বকবেন এখনি।

—বকবেন কি? এর জন্য দায়ী তো আপনার মা আর বাবা! আপনার মত সর্ব্বগুণান্বিতা মেয়েকে একটি বানরের গলায় দিতে ওঁদের বাধলো না?

তপতী চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণপরে কহিল,—মিঃ ব্যানার্জি তো আমায় 'দুল' দিয়েছেন, মিঃ চৌড্রী দিলেন ব্রোচ, আর মিঃ অধিকারীর কথা ছিল যা দেবার তা না দিয়ে অন্য একটা বাজে জিনিষ দিলেন; ওঁর শাস্তি হওয়া দরকার।

সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল,—"সার্টেনলি!"

মিঃ অধিকারী কহিলেন,—সে জিনিস আপনি নিলে আমি কৃতার্থ হ'য়ে যাবো।

—নিশ্চয়ই নেবো, দিন!

—জিনিষটা কি মিঃ অধিকারী!—প্রশ্ন করিলেন মিঃ ব্যানার্জি!

—একটা ডায়মণ্ড রিং—উত্তর দিল তপতী স্বয়ং।

সকলেই একটু বিচলিত হইল। বিবাহিতা মেয়েকে আংটি দেওয়া চলে কি? কিন্তু তপতী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে চায়, সে আজো বিবাহিতা নহে এবং সেইজন্যই "মিস্ চ্যাটার্জি" নামে অভিহিতা হইতে আপত্তি করে না। মিঃ অধিকারী ধনীর সন্তান। তিনি তপতীর জন্য আংটি কিনিয়া আনিয়া ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা বাহির করিয়া তপতীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তপতী তাহা পরাইয়া দিবার জন্য বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

মিঃ অধিকারীর আংটি পরানো তখনো শেষ হয় নাই, মা'র সঙ্গে তপন আসিয়া ঢুকিল, হাতে তাহার একগুচ্ছ অশোক ফুল। মা তপতীর কাণ্ড দেখিয়া মুহূর্ত্তে থ' হইয়া গেলেন, কিন্তু তপনের নিকট কোনরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া কহিলেন,—প্রণাম কর খুকী...

তপতী উঠিল না, যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। তপন এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল,—থাক মা, আমি এমনি আশীর্ব্বাদ করছি—বলিয়া সে অশোকগুচ্ছটি তপতীর হাতে দিতে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিল,

—তোমার জীবনে পবিত্র হোমশিখা জলে উঠুক···

তপতী পুষ্পগুচ্ছটা টানিয়া ছুড়িয়া দিয়া সরোষে বলিল,—যাত্রা-দলে প্লে করে নাকি? আশীর্ব্বাদের ছটা দেখো!

বন্ধুর দল হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তপন মা'কে কহিল,—বলুকগে মা, আমি কিছু মনে করিনি।

তপন আপন কক্ষে চলিয়া গেল। মা'ও অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত হইয়া চলিয়া গেলেন! বন্ধুর দল হাসি থামাইয়া বলিল,—সত্যি একটা ওরাংওটাং।

পরদিন সকালে আসিল শিখা, তপতীর বন্ধুদের মধ্যে নিকটতমা। আসিয়াই বলিল,—কাল সবে এসেছি ভাই, তোর বর কোথায় বল—আলাপ করব।

—আলাপ করতে হবে না, সে একটা যাচ্ছেতাই।

—ওমা, সেকি! কেন?

—যা কপালে ছিল ঘটেছে আর কি। হুঁ, ঠাকুরদা নাকি গণনা ক'রে বলেছিলেন, আমার বর হবে অদ্ভুত, তাই অদ্ভুতই হ'য়েছে, যাত্রাদলের ভাঁড় একটা।

শিখা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন তপু, ব্যাপার কিরে?

—ব্যাপার তোর মাথা! যা, দেখে আয়, ওঘরে রয়েছে!

শিখা আর কোন কথা না বলিয়া তপনের কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তপন তখন পূজা শেষ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেছে। পিছন ফিরিতেই শিখার সহিত চোখ মিলিল। তাহার চন্দন-চর্চ্চিত পূত দেহকান্তি, উন্নত প্রশস্ত ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক-রেখা, গলায় শুভ্র উপবীত শিখাকে মুহূর্ত্তে যেন অভিভূত করিয়া দিল। শিখা ভুলিয়া গেল, সে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহার বন্ধুর বরের সঙ্গে। ভুলিয়া গেল উহার সহিত শিখার সম্বন্ধ কি! যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে গিয়া শিখা আভূমি লুণ্ঠিত হইয়া তপনকে প্রণাম করিয়া বসিল।

মৃদু হাসিয়া তপন কহিল,—তুমি কে ভাই দিদি? এ সমাজে তোমাকে দেখবার আশা তো করিনি?

পাঁচ সাত সেকেণ্ড শিখার কণ্ঠরোধ হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে কহিল,—আমি আপনার ছোট বোন, আর তপতীর বন্ধু, আর জাষ্টিশ মুখার্জির মেয়ে।

—ওঃ! তুমিই শিখা! কিন্তু একটা কথা আছে!

—বলুন!

—এখানে আমাকে তুমি কেমন দেখলে, কি দেখলে, কিছুই বলবে না তোমার বন্ধুর কাছে বা কারো কাছে। আজ বিকালে আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে যা-কিছু বলবার বলবো—অনেক কথা আছে। তুমি এখন বাড়ী চলে যাও ভাই শিখা!

—যাচ্ছি। কিন্তু আমার নাম জানলেন কি করে?

—মা'র কাছে শুনেছি। আচ্ছা, এখন আর কথা নয়!

শিখা বাহিরে আসিয়া আপনার গাড়ীতে উঠিয়া প্রস্থান করিল, তপতীর সহিত আর দেখাও করিল না।

তপনের অভ্যর্থনার জন্য শিখা পরিপাটি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। কয়েক-মিনিটের-দেখা তপনের কথা শিখা আজ সারাদিন ভাবিয়াছে। আশ্চর্য্য ঐ মানুষটী! মুহূর্ত্তে যে এমন করিয়া আপন করিয়া লইতে পারে, তপতী তাহার সম্বন্ধে কেন ওরূপ কথা বলিল! শিখা সমস্ত দিন ভাবিতেছে, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে। তপতীর বিবাহের গোলযোগের কথা ভাগলপুরে থাকিতেই সে শুনিয়াছিল তাহার মা'র চিঠিতে। আজ তপতীর সেই বরকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। শিখারা দুই বোন, দাদা বা ছোট ভাই নাই,—তপন যদি শিখার দাদা হয়,—শিখা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—হাঁ, হইয়াছেনই তো!

তপতীর সহিত ফিরিবার সময় দেখা না করিয়া আসাটা ভাল হয় নাই। কিন্তু উনি যে বারণ করিলেন। ওঁর কথার অবাধ্য তো হওয়া যায় না। তপতী রাগ করে করুক— তাহার সহিত ভাব করিতে বেশী দেরী হইবে না। ব্যাপারটা তো শোনা যাক দাদার মুখ হইতে।

তপন আসিয়া পৌঁছিল। পরণে অফিসের পোষাক, হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট। শিখা আগাইয়া যাইতে হাসিমুখে বলিল,—চিনতে পাচ্ছিস্ ভাই দিদি?

—চিনবার তো কথা নয়, যা ভোল বদলেছো!—বদলেছেন?

—থাক্, আর 'ছেন' জুড়তে হবে না। দুজনেই হাসিয়া উঠিল। শিখা আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিল,—কখন যে মনের মধ্যে দাদার আসনখানি জুড়ে ব'সেছো, টেরই পাই নি। নিজের অজ্ঞাতসারেই "তুমি" বলে ফেললাম।

—তোর কাছে এমনটাই আশা ক'রছিলাম ভাই। চল, বাবা-মা'কে প্রণাম করি গিয়ে।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে শিখা তপনকে ভিতরে আনিয়া তাহার মা-বাবার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তপন হেঁট হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া

উঠিয়াই বলিল,—আমি নিজে নিমন্ত্রণ নিয়েছি, কাকীমা, আপনার দুষ্টু মেয়ে করেনি নিমন্ত্রণ!

—হাঁ, করেনি—নিমন্ত্রণ করবার সুযোগ দিয়েছিলে? যাবা মাত্র তাড়িয়ে ছাড়ল মা! এত্তো দুষ্টু!

জাষ্টিশ মুখার্জি অত্যন্ত নিরীহ এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার গাম্ভীর্য্য টুটাইয়া তিনি কহিলেন,—শঙ্কর ব'লছিল যে জামাই তার খুব ভালো হ'য়েছে, তা এতো ভালো হয়েছে, কে জানতো! বসো বাবা, তুমি তো ফরম্যালিটির ধার দিয়েও যাওনা দেখছি। খুব ভালো ছেলে!

—তোমার খুব ভালো লেগেছে,—নয় বাবা? এতো কথা বলে ফেল্লে যে! শিখা কৌতুক হাস্যে চাহিল তার বাবার পানে।

শিখার মা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, বলিলেন,—তোমার আর একটা জোড়া নেই বাবা? দুটোকেই বাঁধতুম!

শিখা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—ওকি গরু নাকি মা, বাঁধতে চাইছো?

—তোর বন্ধু সেদিন সার রমেনের বাড়ীর পার্টিতে ব'লছিল, তার বর নাকি হ'য়েছে একটা গরু। তাই তোর জন্যেও একটা এমনি গরু আমরা খুঁজছি।

—না মা, গরুটরু বলো না, আমার দাদা যে ও। শিখা মৃদু হাসিয়া বলিল।

নিশ্চয় আপনি বলবেন কাকীমা। আমার মা আমায় শেষ দিন পর্য্যন্ত গরু আর গাধা ব'লতেন। তারপর থেকে আর কেউ বলে নি। আপনি বলুন তো, আপনার কণ্ঠে আমার মা'র কণ্ঠস্বর শুনে নিই আর একবার!—তপনের দুটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। শিখার মাতা বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—তুমি যদি গরু হও বাবা, তাহ'লে মানুষ

কে, তাই ভাবছি। কিন্তু বাবা, অফিস থেকে আসছো তো? এসো, হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গল্প করবে'খন।

খাইতে বসিয়া তপন বলিল,—শিখার বিয়ে দিতে চান কাকীমা! আপনার কিছু ঠিক করা নেই তো?

—না বাবা, ঠিক কিছু নেই। মেয়েকে আর বড় ক'রতে ভরসা করিনে বাবা; চারদিকে দেখছো তো, ধিঙ্গি মেয়েরা সব মোটরে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। বয়স বাড়ছে, বিয়ে হ'চ্ছে না। সমাজে কত মেয়ে যে আইবুড়ো র'য়েছে তার ঠিক নাই!

—অপনাদের সমাজের তো এই রকমই গতি কাকীমা। কিন্তু সমাজের উপর আপনি চট্‌লেন কেন?

—না বাবা, আমাদের সেকালের সমাজই ভালো ছিল। বিয়ে করবে না, ধিঙ্গিপনা করে বেড়াবে, তারপর বয়েস বাড়লে আর বিয়েই হবে না। এই তো হ'চ্ছে আকৃছার!

—আশায় আশায় থাকে কাকীমা, মনে করে, আরো ভালো বর জুটবে, তারপর আরো ভালো, এমনি করেই বয়স বেড়ে যায়। আর আমাদের সমাজের মত আপনারা তো কচি মেয়ের জোর করে বিয়ে দেন না; জোর করে বিয়ে দেবার অবশ্য আমিও পক্ষপাতী নই, তবে ষোল থেকে কুড়ি একুশের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিৎ।

শিখা এতক্ষণ নতমুখে তপনের চা তৈরী করিতেছিল, বাগ পাইয়া বলিয়া উঠিল,—তপির বয়স এখনো কুড়িও পেরয় নি, অতএব মা ভৈঃ দাদা!

—তুই থাম—গুরুজনের সঙ্গে কথা বলবার সময় বাগড়া দিস নে!

শিখা অনাবিল আনন্দে তপনের মুখের দিকে চাহিল। শিখার দাদার অধিকারটি তপন অতি সহজে গ্রহণ করিয়াছে। এমন করিয়া কেহ কোনদিন তাহাকে ধমক দেয় নাই, এমন মিষ্ট, এমন আন্তরিকতা পূর্ণ।

হাসিমুখে সে চা আগাইয়া দিয়া বলিল,—আচ্ছা, গুরুজনের সঙ্গে কথা শেষ হ'লে ডেকো আমায়। শিখা চলিয়া যাইতেছে, মা বলিলেন,—যাচ্ছিস কেন?

শিখা দুই পা ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—ভাবছো কেন মা? ও তোমার আধুনিক যুগের চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, মুখার্জি, ঘোষ, বোস, মিত্তির নয়। শিখা না থাকলেও ওর চলবে, বরং ভালোই চলবে। আমি কিছু বেল ফুল তুলে নিয়ে আসি।

শিখা চলিয়া গেল। তপন মধুর হাসিয়া বলিল,—কাকীমা, এই আধাবিলেতী সহরের বুকের উপর মেয়েকে আপনারা কি ক'রে এমন শুদ্ধাচারিণী রেখেছেন?

আমি ওকে খুব কড়া নজরে রাখি বাবা। চারিদিকে তো দেখছি। আমি ছিলুম ভটচার্জি বামুনের মেয়ে, একেবারে সনাতনপন্থী; এখনকার সব দেখে মনে হয়, ভাল আমাদের সমাজে অনেকই ছিল, মন্দ যে না ছিল তা নয়, কিন্তু মন্দটা বেছে না ফেলে আমরা ভালমন্দ সবই বিসর্জ্জন দিয়েছি অথচ যাদের অনুকরণ করতে চাইছি, তাদের ভালোগুলো ছেড়ে মন্দগুলোই নিচ্ছি!

তপন হাসিমুখে শুনিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—আমি দেখেই বুঝেছিলাম কাকীমা, আপনার সতী-শোণিত ওর প্রতি শিরায় বইছে। আচ্ছা কাকীমা, আপনি আমার উপর নির্ভর যদি করেন তো ওর যোগ্য এবং আপনার মনের মত ছেলে আমি ওর জন্যে এনে দেবো। কিন্তু আমি যে আপনাদের বাড়ী এসেছি বা মাঝে মাঝে আসবো, একথা যেন কোনরূপে আমার শ্বশুরবাড়ীতে প্রকাশ না পায়। কারণ শিখার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক হওয়া উচিত বলে ওঁরা মনে করছেন, শিখা তার থেকে আমার ঢের বেশি আপনার।

—তুমি ওঁদের বলে আসনি বুঝি?

—না,—এবং কোন্নোদিন বলে আসবোনা। কারণ ওঁদের জামাই সম্পর্কে তো আর আমি আপনার বাড়ীতে আসছি না, আসছি আপন বোনটিকে দেখতে। আমি কায়-মন এক ক'রে কথা বলি কাকীমা, শিখার সঙ্গে আমার সহোদরা বোনের আর কিছু তফাৎ নাই। আমি তো আজকালকার "দা-জাতীয়" জীব নই—যাকে তাকে আমি 'দাদা' ব'লতে অনুমতি দিই না।

—বেশ বাবা, তুমি শিখার দাদা, এ তার গৌরব। তোমার ক'টি ভাই-বোন?

—আমার কেউ নেই কাকীমা, একটা খুড়তুতো বোন আছে। আর এই সারা বিশ্ব-সংসারে আজ সকাল পর্য্যন্ত সেই একমাত্র মেয়ে ছিল, যার সঙ্গে আমি যখন তখন কথা বলি, দুষ্টুমী করি। আজ থেকে হোল আমার দুটি বোন, শিখা আর সে!

শিখা আসিয়া পড়িল একটা রূপার রেকাবীতে কতকগুলি ফুটন্ত বেলফুল লইয়া। বলিল,—পাদুটি বাড়াও তো! তোমার পায়ে শ্বেতপুষ্প ছাড়া আর কিছুই দেওয়া যায় না।

মা বলিলেন,—তোমরা গল্প করো বাবা, আমি ঘরের কাজ দেখি। তিনি চলিয়া গেলে তপন বলিল,

—লক্ষ্মী বোনটি, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, সত্যি উত্তর দিস্।

—তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না দাদা, যদিও মিথ্যে অনেক সময়ই বলি আমি!

তপন তাহার বিবাহ হওয়ার পর হইতে এই দুই মাসের ঘটনা শিখাকে বলিয়া গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল,

—ওর মতলব কি শিখা, ওকি কাউকে ভালবাসে?

—তাতো জানিনে দাদা, সেরকম কিছু তো দেখিনি! দাদা, তোমায় ও ভুল বুঝেছে। আমি কালই ওকে বুঝিয়ে দেবো!

—"না"। তপনের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ়—না শিখা, তাহ'লে তোকে আর ভগ্নীস্নেহ দিতে পারবো না। সে আমায় ভালো যদি বাসে, এমনিই বাসবে, কারো প্ররোচনায় নয়। আমি যেমন, যেমনটি সে আমায় দেখেছে, তেমনি ভাবেই আমি তার হৃদয় জয় ক'রতে চাই। যদি না পারি, জানবো সে আমার নয়।

কয়েকটি মিনিট নীরবে কাটিয়া গেল। তপন পুনরায় আরম্ভ করিল —আমি তো আধুনিকা কোন ককেট্ মেয়েকে বিয়ে করতে আসিনি শিখা, আমি ভেবেছিলুম, বিয়ে ক'রছি স্বর্গীয় মহাত্মা শ্যামসুন্দর চাটুজ্যের নাত্নীকে। যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া তপন সেই স্বর্গীয় মহাত্মার উদ্দেশে নতি জানাইল। তারপর বলিল,—আর শুনলাম, আমার বাবা নাকি মিঃ চ্যাটার্জিকে কথা দিয়েছিলেন, তাই পিতৃসত্য পালন আর বিপন্ন মিঃ চ্যাটার্জিকে সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলাম; আর ভেবেছিলাম, আমার অনন্ত-জীবনের সাথীকে হয়ত ঐ বাড়ীতেই খুঁজে পাব।

ব্যথায়-বেদনায় তপনের কণ্ঠ মলিন শুনাইতেছে। শিখা অভিভূতের মত তপনের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখ তাহার জলে ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। এই অপরূপ সুন্দর হৃদয়বান মানুষটিকে তপতী গ্রহণ করে নাই,—আশ্চর্য্য!

—তুমি আমায় অনুমতি করো দাদা, আমি কালই তোমার সাথীকে এনে দেবো—সে তোমায় চেনেনি এখনো!

—না শিখা, তা হয় না। আমার স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে তার ভালবাসা পাওয়া এখন আর আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়। আমি জানি প্রত্যেক মেয়েই চায়, তার স্বামী রূপবান, জ্ঞানবান, ধনবান হোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তা কারো না হয়, তবে সে কি এমনি ক'রে স্বামীর অন্তর চূর্ণ ক'রে দেবে? হিন্দু নারী সে, পবিত্র বৈদিক-মন্ত্রে তার বিয়ে হয়েছে, যে বিয়ের জের জন্ম হতে জন্মান্তরে চলে বলেই-না শাস্ত্রের বিশ্বাস—সেই

ধর্ম্মের মেয়ে হ'য়ে সে স্বামীকে একটা সুযোগ পর্য্যন্ত দিল না নিজেকে প্রকাশ করবার! আমি বুঝেছি শিখা, এই অহঙ্কারের মূলে দুটো জিনিষ থাকতে পারে। এক; সে অন্য কাউকে ভালবাসে, যাকে পেল না ব'লে গভীর ক্ষুব্ধ হ'য়েছে ; নয় ত, সে আজো অনন্যাসক্তা, পবিত্র আছে, কাউকেই ভালোবাসে না। যদি শেষের কারণই সত্যি হয়, তবে আমি তাকে এমনি থেকেই ফিরে পাব, আর যদি প্রথম কারণটা সত্যি হয়, তাহ'লে সে আমায় হাজার ভালবাসলেও আমি তাকে গ্রহণ করবো না। আমার জীবনে অন্যাসক্তা নারীর ঠাঁই নেই।

শিখা শিহরিয়া উঠিল। তপতী এ কি করিয়া বসিয়াছে! যে অদ্ভুত চরিত্রবান স্বামী সে লাভ করিয়াছে, তাহাতে তপতীকে অন্যাসক্তা ভাবিয়া ত্যাগ করা তপনের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।...গভীর স্তব্ধতার মধ্যে শিখা ভাবিতে লাগিল।

—বোনটি, আমার মায়ের পেটের বোনের সঙ্গে তোর আজ কিছু তফাৎ নেই। আমার কথা রাখবি তো?

নিশ্চয় দাদা, তোমার কথার অবাধ্য হবো যেদিন সেদিন তোমায় দাদা বলবার যোগ্যতা হারাবো যে।

তপতীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ সে আসিয়া বসিবে বন্ধুদের আসরে। উপরে প্রসাধনে সে এখন ব্যস্ত। বন্ধুগণ ততক্ষণ আসরটা জমাইয়া তুলিতেছেন।

রেবা দেবী বলিল,—এবার কিন্তু তপতী বরের সঙ্গে মিশিবার বিস্তর সময় পাবে—বুঝেছো, এতকাল তো বৃথাই কাটালে সব। এখনো সে দেখেনি, কিন্তু একবার দেখলে আর রক্ষে নাই।

সমস্বরে ব্যানার্জি-চ্যাটার্জি-ঘোষ প্রশ্ন করিল—কেন?

—কারণ ছেলেটা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি সুন্দর কথা ; তপতী আবার কাব্যপ্রিয়, ওর একটা কথাতেই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে।

—বলো কি ! সে ত একটা বোকারাম, মূর্খ !

—মোটেই না ! আমি মাত্র একদিন গিয়েছিলাম তার কাছে। আমায় দেখে কি বল্লে জানো ?

—কি বল্লে !

—বল্লে, আসুন ! আপনি কোন দেশীয়া ? নমস্কার না করমর্দ্দন করবো ! আমি বল্লাম, একদম স্বদেশী, নাম শ্রীমতী রেবা দেবী। তা বল্লে কি জানো ? বল্লে, রেবা তো উপল-বিষমে বিশীর্ণা ! কিন্তু আপনি তো দেখছি শীর্ণা নন !

—উত্তরে তুমি কি বল্লে ?—মিঃ ব্যানার্জি প্রশ্ন করিলেন।

—বল্লাম, আমি মোটা হলে তো কিছু যায় আসে না, তপতী খুব স্লিম্।...

—ও কথা তুমি বলতে গেলে কেন ? তপতীর রূপ ওর না দেখাই তো দরকার।

—শোনই-না কথাটা। তপতী স্লিম্ শুনে বল্লে, বড্ড খুসী হলুম শুনে ; ওর তন্বী দেহ-তরবারী দিয়ে অনেককে জবাই করতে পারবে, কি বলেন ? আমি তো অবাক ! বল্লুম, হাঁ, আমাদেরগুলো একদম ভোঁতা।

—তাতে কি বল্লে ? মিঃ ব্যানার্জি শুধাইলেন !

—বল্লে, শান দিয়ে নিন। অত রুজ-পাউডার-লিপষ্টিক্ রয়েছে কি জন্যে ! শুনে আমি চুপ করে গেলুম। ও মুখ ফিরিয়ে 'হারুঠাকুরের পাঁচালী' পড়তে লাগলো। পরদিন তপতীর মা বারণ করলেন ওখানে যেতে। নইলে ওর জবাব আমি দিতাম।

—বারণ করলেন কেন ?

—তা জানিনা, বোধহয় ও বিরক্ত হয়।

—বিরক্ত নয়, ভয় করে, ওর বিদ্যে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

—ওর বিদ্যে প্রকাশ হলে তোমাদের বিশেষ সুবিধা হবে না। কারণ ও সত্যি বিদ্বান—তোমাদের মত শ্যালো নয়।

ইতিমধ্যে মিঃ অধিকারী আসিয়া পৌছিলেন। এই মিঃ অধিকারীকে এখন আর ইহারা সুনজরে দেখিতেছেন না। কারণ তপতী তাহার কাছ হইতে আংটি লইয়াছে। অধিকারীই তাহা হইলে তপতীর মন আকর্ষণ করিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক!

রেবা তাহাকে দেখিয়া বলিল,—আসুন মিঃ অধিকারী, এবার আমাদের মেঘদূতের আপনিই তো যক্ষ।

মিঃ অধিকারী আত্মপ্রসাদের হাস্য করিলেন। ওদিকে তিন-চারটি যুবক তাহার দিকে জনান্তিকে ক্রুদ্ধ ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে। বিনয়ের সহিত অধিকারী কহিলেন,—বেশ, আমি সম্মত।

—কিন্তু সম্মতিটা যাঁর কাছ থেকে পাওয়া চাই, তিনি এখনো টয়লেটে ব্যস্ত; ঐ এসে পড়েছে।

তপতী তর তর বেগে সিড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। সুদীর্ঘ বেণী সর্পাকারে দুলিতেছে। তাহার অর্দ্ধেকটা আচ্ছন্ন করিয়া ধূপছায়া রঙের অঞ্চলপ্রান্ত পিঠের উপর দিয়া কোমরের কাছে পড়িয়াছে। সমস্ত তনুলতা ঘিরিয়া একটা স্নিগ্ধ সুরভি।

সকলে তাহাকে সহাস্যে অভিবাদন করিল। একজন প্রশ্ন করিল, —পরীক্ষা নিশ্চয় ভালই দিলেন!

—হাঁ—আজকার প্রোগ্রাম কি! অকাজে বসে থাকা?

—না, নিশ্চয় না! আজই আমরা ঠিক করবো আগামী মেঘদূত উৎসবে কে কি রোলে নামবেন! প্রথমে দু'একটা গান হোক, একটু নাচও যদি হয় আপনার!

হাসির বিদ্যুৎ ছড়াইয়া তপতী কহিল—নাচ আজ নয়, বড় ক্লান্ত। পরশু বরং চলুন একটা ষ্টীমার ভাড়া করে খানিকটা বেড়িয়ে আসি!

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—হুর্‌রে! এইতো চাই! থ্রি চীয়ার্স ফর মিস্ চ্যাটার্জি!

তপতী আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্যানার্জি শুধাইলেন,—সেই ভদ্রলোকটির খবর কি, দ্যাট্ গুড্ ওল্ড ম্যান?

মধুর হাসিয়া তপতী বলিল,—থাক্, তার কথায় কি দরকার! ওর ওপর জেলাস হবার কোন দরকার নাই, ও আমাদের ছায়াও মাড়াবে না।

—গুড্! না মাড়ালেই আমরা খুসী থাকবো।

তপতী এবং আরো অনেকের গান গাওয়ার পর আগামী উৎসবের কর্ম্মসূচী প্রস্তুত হইল এবং আগামী কল্যকারও একটা খসড়া তৈরী হইল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, সকলে চলিয়া গেলে তপতী উপরে আসিয়া দেখিল, তপন খাইতে বসিয়াছে। মা সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। তপতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মা ডাকিলেন,—আয় খুকী, খেয়ে নে। তপন ওদিকে মুখখানা এতই নীচু করিয়া দিয়াছে যে প্রায় দেখা যায় না। মা দেখিয়া বলিলেন,—খাও বাবা, অত লজ্জা কেন!

তপতীর দিকে তপন পিছন ফিরিয়াই ছিল, সেই ভাবেই উত্তর দিল, —লজ্জা না মা, অনভ্যাস! খাওয়া হয়ে গেছে, উঠ্‌লাম।

—দুধ খাওনি বাবা এখনো!

—আজ আর দুধ খাবো না মা, বড্ড ঘুম পাচ্ছে—তপন মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

মিসেস্ চ্যাটার্জি তপতীকে বলিলেন,—খাওয়ার পর তুই আজ ওর ঘরে গিয়ে শুবি খুকী!

তপতী অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—তুমিও সেকেলে হ'য়ে যাচ্ছ মা! কোন ঘরে শুতে হবে, না হবে, আমি খুব ভালো জানি। আমি আর কচি খুকীটি নই!

মিসেস্ চ্যাটার্জি অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া বলিলেন,—সে কি খুকী, তোর মতলব কি তা'হলে!

ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া উঠিতেছে বুঝিতে পারিয়া তপতী সাবধান হইয়া গেল। বলিল,—তুমি মিছেমিছি অত ভাবো কেন মা! দিন পালিয়ে গেল নাকি?

তপতী হাসিয়া উঠিল। মা ভীতভাবেই বলিলেন,—কিন্তু আজই-বা গেলি?

—না-মা-না, ভাল একটা দিনক্ষণ ঠিক করো। তোমার ঐ গোঁড়া বামুন জামাইয়ের কাছে কৃষ্ণপক্ষের দিনে নাই-বা গেলাম!

মা খানিকটা প্রসন্না হইলেন। তাঁহারা দিনক্ষণ না-মানিলে কি হইবে, তপন তো মানে! হাঁ, সেই ভাল হইবে। একটা ভাল দিন তিনি ঠিক করিবেন।

তপতী আহার সারিয়া আপন কক্ষে গিয়া হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। মা'কে কত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়! কিন্তু পাঁজিতে ভাল দিনের অভাব নাই এবং মা কালই তাহা বাহির করিবেন। আচ্ছা, তখন অন্য মতলব খাটানো যাইবে। তপতী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

একখানা প্রকাণ্ড গাড়ীতে আসিয়া নামিল তপন আর শিখা—বিনায়ক অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া থমকিয়া গেল; কর্ম্মিগণ বিব্রত হইয়া উঠিল। মীরা ব্যতীত নারী অতিথি এখানে কখনো কেহ আসে নাই। বিনায়ক কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া একটা নমস্কার করিল। অন্যান্য সকলেই তাহার অনুসরণ করিল কোন প্রকারে। কিন্তু শিখা সহজ হাসিতে সকলকে চকিত করিয়া দিয়া বলিল,—সব কিন্তু খুঁটিয়ে দেখাবেন, বিনায়ক বাবু, চলুন আগে অফিস দেখি আপনার!

কে এ? তপন যাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সে নয় নিশ্চয়ই। তপনটা কি ফন্দিবাজ! কাহাকে লইয়া আসিতেছে, কিছুমাত্র জানায় নাই। তপন বলিল—তুই ওর সঙ্গে ঘুরে সব দেখ ভাই শিখা, আমি ততক্ষণ একটা নতুন খেলনার নক্সা করি—কেমন?—তপন গদীতে আসিয়া বসিল।

—আচ্ছা,—আসুন বিনায়ক বাবু।

নিরুপায় বিনায়ক শিখাকে লইয়া কারখানা দেখাইতে গেল। ছোট, ছোট যন্ত্রগুলি হাতেই চলে। একটা মাত্র বিদ্যুৎ পরিচালিত কল রহিয়াছে। যতদুর সম্ভব শিখা বুঝিতে চেষ্টা করিল। বিনায়ক ধীরে ধীরে বলিয়া গেল এই কারখানা প্রতিষ্ঠার করুণ ইতিহাস, তাহার দরিদ্রজীবনের কাহিনী। লাজুক বিনায়ক নতমুখেই কথা কহিতেছে। বড় সুন্দর লাগিল শিখার। কোনরূপ ঔদ্ধত্য নাই, সহজ অনাড়ম্বর লোকটি। বন্ধুবাৎসল্যে চোখ দু'টি ছলছল করিতেছে। বিনায়ক বলিয়া চলিল, —তপনকে যদি না পেতাম শিখা দেবী, তা'হলে হয়ত বিনায়কের অস্তিত্বও মুছে যেতো। কিন্তু তপনের কিছুই ক'রতে পারলাম না।

—ক'রতে পারলেন না কেন কিছু! চেষ্টা করেছেন?

—কি চেষ্টা ক'রবো? তপন তো হাত পা বেঁধে দিয়েছে।

শিখাও নীরব হইয়া গেল। তপনকে সে এই কয়দিনে ভালরকমই চিনিয়াছে।

খানিক পরে বিনায়ক জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি চেনেন তাকে? কিসের এত অহঙ্কার তার?

—শুধু চিনি নয়, সে আমার বিশেষ বন্ধু! আপনার মত আমারও হাত-পা দাদা বেঁধে দিয়েছেন।

বিনায়ক শুধু বলিল,—হুঁ!

শিখা বলিল,—কিন্তু আপনি ভাববেন না বিনায়কবাবু, যতদুর জানি তপতী এখনও নিষ্কলঙ্ক আছে। সে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পারবে!

বিনায়ক আবার একটা হুঁ দিল!

একটি কিশোর কর্ম্মী আসিয়া বলিল,—বড়দাদাবাবু, ছোট-দা ডাকছেন আপনাদের।

—"যাচ্ছি"! বলিয়া উভয়ে উঠিল। চলিতে চলিতে শিখা বলিল, —আপনারা বুঝি এদের বড়দা আর ছোট্‌দা!

—হাঁ, এখানে চাকর কেউ নেই। সবাই ভাই ভাই, সব অংশীদার।

—সব নিয়মই বুঝি আপনাদের দুজনের মস্তিষ্ক-প্রসূত?

—সবই ঐ তপনের সৃষ্টি দেবী। মাথা আমার খোলে না। ও যা বলে, তাই আমি করে যাই।

আশ্চর্য্য এই লোকটি! বন্ধুর উপর এমন অগাধ স্নেহ আর শ্রদ্ধা একযোগে পোষণ করিতে শিখা আর কাহাকেও দেখে নাই। নিজে তিনি কেমন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা মাত্র করিলেন না। বিনায়কের দিকে একটা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া শিখা হাসিয়া বলিল,—সবই'ত ওঁর বলছেন, আপনার নিজের কি কিছুই নাই?

—আছে, আমার নিজের অতুল সম্পদ আছে। ঐ বন্ধু, আমার তপন।

শিখা অভিভূত হইয়া গেল। দুজনে অফিস ঘরে আসিয়া পৌছিল। অফিস দেখিয়া শিখার চোখ জুড়াইয়া যাইতেছে। দেওয়ালে টাঙানো শিশুমূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত। মেঝের আলপনাগুলি কোন্ অতীত যুগের সহিত যেন বর্ত্তমানের যোগ স্থাপন করিতেছে। ঘরে ধূপ-সুরভিত বাতাস মন্থর-মদির। চতুর্দ্দিকে শান্তির আবহাওয়া। একটাও চেয়ার বা টেবিল নাই; থাকিলেও যেন এ ঘরে মানাইত না।

শিখা দ্বিধাহীন মনে ঠিক তপনের ছোট্ট বোনটির মতই পলাশপাতাটা টানিয়া লইয়া খাইতে বসিল! খাইতে খাইতে বলিল,—তোমাদের এখানে তো ভাই রোজ পিক্‌নিক্—আমার কিন্তু যেদিন খুসী ভাগ রইল এতে।

বিনায়ক বলিল,—খুকীটা যেন আপনার রোজই হয়।

শিখা বলিল,—আপনার ভাগে তা'হলে কম পড়ে যাবে। দুই ভাই-বোনে জুটলে আপনি পারবেন না।

হাসিতে হাসিতে বিনায়ক কহিল,—না-হয় হেরেই জিতবো।

—অর্থাৎ! শিখা তাকাইল!

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বিনায়ক বলিল,—অর্থাৎ এত বেশী হারবো যে-হারের দিক দিয়ে আমিই হব ফার্ষ্ট!

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

তপতী আসিয়া অনুযোগ করিল,—সকাল থেকে তিনবার ফোন কর'লাম মা, শিখা কিছুতেই আসছে না—আমাদের পার্টিতে যাবে না ব'ল্ছে।

—কেন? কি হোল তার? যাবে না কেন? মা নিরীহের মত প্রশ্ন করিলেন।

—কে জানে! তোমার জামাই কিছু ব'লেছে নাকি? সেই যে সে-দিন ওর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল, তারপর থেকে আর শিখা আসে নি।

—জামাই কি বলবে খুকী! ওর নামে মিছেমিছি কেন বদনাম দিচ্ছিস?

মা বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু তপতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—খুব বল্‌তে পারে! যা অসভ্য! ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভদ্রতা করা কিছু বিচিত্র নয়!

—ও কথাই বলে না তো বেশী, ভদ্র কি আর অভদ্রই কি। তোদের পার্টিতে ওকে নিয়ে যাচ্চিস তো আজ—দেখে নিস্ আমার কথা ঠিক কি না।

—ওকে নাই-বা নিয়ে গেলুম মা, বিস্তর বড় বড় লোক যাবে, সেখানে যদি কিছু অসভ্যতা ক'রে বসে, গঙ্গার জলে সে লজ্জা ধোয়া যাবে না।

—সে কি খুকী, ওকে না নিয়ে গেলে ভাববে কি! লোকেই-বা ব'লবে কি?

নিরুপায় তপতী রাজি হইল, নতুবা মা হয়ত একটা 'সীন ক্রীয়েট' করিয়া বসিবেন। বলিল,—আচ্ছা, তাহ'লে এই জিনিষ ক'টা কিনে নিয়ে যেতে বলো—তপতী একটা লিষ্ট দিল।

বন্ধুবর্গের সহিত তপতী পূর্ব্বেই যাত্রা করিল। তপনকে মা যেমনটি আদেশ করিয়াছিলেন, সে তেমনি ভাবেই গিয়া ষ্টীমারে উঠিল এবং জিনিসগুলি চাকরের হাতে দোতালায় তপতীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া নীচেই বসিয়া রহিল। যথাসময়ে ষ্টিমার ছাড়িয়া গেল।

উপর হইতে সঙ্গীতের মধুর স্বরলহরী ভাসিয়া আসিতেছে। তপন অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, —ঐ সভায় গিয়া একখানি গান গাহিলেই সে তপতীকে আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু যে নারী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা, তাহাকে তপনের আর প্রয়োজন নাই। তপনের জীবনসঙ্গিনীর স্থানে সে বসিতে পাইবে না।

তপতীর পরিচিতের সংখ্যা শতাধিক। প্রায় সকলেই আসিয়াছে। অতবড় ষ্টিমারখান জুড়িয়া নানা ভাবে নানা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। পরিচিত হিসাবে মিঃ ঘোষাল, যাঁহার সহিত তপতীর বিবাহ হইবার কথা ছিল, তিনিও আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই তপতী বলিয়া উঠিল, —আসুন, বাপের লক্ষ্মী ছেলে—আছেন কেমন?—এই বিদ্রূপ সকলেই উপভোগ করিল কিন্তু মিঃ ঘোষালের বুকের ভিতর কোথায় যেন একটা

আনন্দের শিহরণ জাগিতেছে। বাপের ডাকে বিবাহ-সভা হইতে উঠিয়া যাওয়া তাঁহার চরম নির্ব্বুদ্ধিতা, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য তো তাহা ছিল না। তপতীর বাবাই তো যত গোল বাধাইলেন। টাকাটা ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া যাইত। মিঃ ঘোষালের জীবনে এই ব্যর্থতার ক্ষতি কোনোদিন পূরণ হইবে না তথাপি আজ তিনি আনন্দিত হইলেন এই ভাবিয়া যে, তপতীর অনুযোগের অভ্যন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে তাঁহার প্রতি ভালোবাসার ইঙ্গিত। তপতী সেদিন তাঁহাকে চাহিয়াছিল, আজো তাঁহাকে না পাওয়ার দুঃখ অনুভব করে। প্রীতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, —বরাতে সইলো না তপতী দেবী, আমার দোষ কি বলুন ? নইলে বাবার কথাকে মান্য আমি জীবনে ঐ একবারই করেছি, আর ঐবারই শেষ বার। কিন্তু এখন তো···

—হাঁ, এখনো লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে থাকুন !

যে তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়া মিঃ ঘোষালের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু যাহাদের তিনি দেখিতেছেন, সকলেই প্রায় পরিচিত, স্বল্পপরিচিত। প্রশ্ন করিলেন,—তিনি কি আসেন নি—আপনার স্বামী ?

"স্বামী" কথাটা উচ্চারিত হইতে শুনিয়াই তপতীর মুখ লজ্জারক্ত হইয়া গেল।

—কি জানি, আছে কোথায় ওদিকে—বলিয়াই সে অর্গান লইয়া বসিল। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকলে জানিল, জামাইবাবু নীচে একাই বসিয়া আছেন। চপলা তরুণীর দল তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিল এবং তপনকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। অতিথিবর্গ দেখিল, তাহার চোখে একটা ঘন সবুজ রংএর ঠুলি, কপালে ও গণ্ডে চন্দনপঙ্ক। এদিকে পরণে কোট প্যাণ্ট এবং মাথায় হ্যাট। এই অদ্ভুত বেশ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল, বিরক্ত হইল এবং একটা বিজয়ের উল্লাসও অনেকেই অনুভব

করিল। তপতীর অহঙ্কার চুর্ণ হইয়া গিয়াছে! তপতী কোন দিন স্বামীর দিকে চাহে নাই, আজো চাহিল না। তরুণীর দল তপনকে লইয়া এক জায়গায় বসাইয়া দিল, বলিল,—স্বদেশী আর বিদেশীতে মেলাচ্ছেন বুঝি! কিন্তু টুপিটা খুলুন, টিকি আর কাটবো না—অভয় দিচ্ছি!

তপন শান্ত স্বরে বলিল,—ভরসা পাচ্ছিনে, টিকির বদলে মাথাই যদি…

হাসিতে হাসিতে একজন বলিল,—মাথা তা' হলে আছে আপনার? আমরা ভেবেছিলাম, তপতী সেটা ঘুরিয়ে দিয়েছে অনেক আগেই।

তপন নিতান্ত গোবেচারার মত বলিল,—টিকি না থাকায় ওঁর ঘোরাতে অসুবিধা হচ্ছে।

রেবা দেবী আসিয়া বলিল,—আমি কেটেছিলাম টিকি, আমি শ্রীমতী রেবা…

—আপনি আমার বড্ড উপকার করেছেন রেবা দেবী, টিকির উপর দিয়েই ফাঁড়াটা উৎরে গেল! মাথাটা বাঁচতেও পারে।

—বাঁচ্‌বে না, ওটাকে আজ তপি'র পায়ে সমর্পণ করবো।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে তপন কহিল,—ওঁর পা থেঁতলে না যায়।

তপতী ওদিক হইতে ক্রুদ্ধস্বরে ডাকিল,—কি ক'রছিস্‌ তোরা? এদিকে আয়-না সব!

—তোর বর যে যাচ্ছে না ভাই—বলিয়াই তাহারা তপনকেও ধরিয়া আনিয়া একটা টিপয়ের কাছে বসাইয়া দিল। তাহার অদ্ভুত বেশ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মৃদুগুঞ্জনে বিদ্রূপ সুরু হইয়া গিয়াছে। তপতীর কানেও দুই চারটা কথা ভাসিয়া আসিল কিন্তু এখানে সে নিরুপায়। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে একবার তপনের দিকে আঁখিপাত করিল। চোখের ঠুলি এবং চন্দনে মুখখানা আচ্ছন্ন। লোকটা কালো কি ফর্সা তাও বোঝা যায় না। মাথায় টুপি থাকার জন্য চুলও

দেখা যাইতেছে না। গঙ্গা-বক্ষে এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিই পাওয়া উচিত কিন্তু হাসিতে গিয়াই মনে পড়িয়া গেল, ঐ কিম্ভূত কিমাকার লোকটা তাহার স্বামী! তপতীর কান্না পাইতে লাগিল। আত্মসম্বরণ করিবার জন্য সে রেলিংএর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীরবে-চা-টুকু শেষ করিয়া উঠিয়া তপন বলিল,—নমস্কার, আমি নীচেই ব'স্‌ছি গিয়ে!

তাহার রূপ, আচার, ব্যবহার দেখিয়া সকলেই বুঝিয়াছিল, এখানে বসিবার সে যোগ্য নয়। কেহই বিশেষ কিছু বলিল না। তপতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তপন চলিয়া যাইবামাত্র মিঃ ঘোষাল কহিলেন, —ওই লোকটা আপনার বর? আশ্চর্য্য! আপনার বাবার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না।

অত্যন্ত উষ্মার সহিত তপতী জবাব দিল,—থাক্, আমার বাবা আপনার বুদ্ধি ধার করতে যাবেন না নিশ্চয়ই।

তপতীর মনের অবস্থা বুঝিয়া সকলেই এ আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। তপতী কিন্তু আর কোন কথাই কহিল না। অপমানে তাহার সারা অন্তর জ্বলিতেছে। ষ্টিমার জেঠিতে ফিরিবামাত্র সে চার পাঁচজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া নিজে গাড়ী চালাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

তপন একধারে দাঁড়াইয়া দেখিল, আপন মনে হাসিল। ইহাদের সে নিষ্ঠুর ভাবে ঠকাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে আসিয়া সে ট্রামে উঠিল।

তপতী গৃহে ফিরিয়া শয্যায় লুটাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। আজ তাহার ঠাকুরদা'র কথাগুলি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন,—"তোর যা বর হবে দিদি, তার আর জোড়া মিলবে না"—তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়তির এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ হইয়া দেখা দিবে—কে জানিত! তপতী স্থির করিয়া ফেলিল—অপমান করিয়া ঐ বর্ব্বরকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া

দিবে। সারা জীবন তপতী একা থাকিবে, সেও ভালো—তথাপি উহার সহিত এক গৃহে বাস অসম্ভব।

দুঃস্বপ্নের মধ্যেই তপতীর রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে তাহার গা-হাত-পা ব্যথা করিতেছে, উঠিল না। মা আসিয়া ডাকিলেন,—শরীর খারাপ খুকী! উঠছিস নে কেন?

মায়ের উপর এক চোট ঝাল ঝাড়িয়া লইতে গিয়া তপতী থামিয়া গেল। বেচারী মা, উহার কি দোষ? জামাইকে স্নেহ মমতা করা শাশুড়ীর কর্ত্তব্য।

তপতী উঠিয়া পড়িল। স্নান সারিয়া চা খাইতে আসিয়া দেখিল, রবিবার বলিয়া তপন বাহিরে যায় নাই চা খাইতেছে। তপতীর গলার স্বর শুনিয়াই সে মুখ নীচু করিল, যেন তপতী তাহাকে দেখিতে না পায়।

তপতী আসিয়া তপনকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষ স্বরে বলিল,—ঐ বৈরাগী আগে চা খেয়ে যাক্, তারপর আমি খাবো।

মা রাগিয়া বলিলেন,—ছিঃ খুকী, কি সব বল্‌ছিস?

তপন হাসিয়া কহিল,—ভালই তো ব'লছে মা! বৈরাগী যেন আমি হতে পারি। অনেক তপস্যায় মানুষ বৈরাগী হয় মা! বৈরাগ্য সাধনার ধন।

রোষভরে তপতী বলিয়া চলিল,—যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার নাই! —তপতী চলিয়া গেল।

মা বলিলেন,—কি সব তোমাদের ব্যাপার বাবা, ঝগড়া করেছো নাকি?

—কিছু না মা, ঝগড়া আমি করিনে। আমার চন্দন তিলক ওর পছন্দ নয়; তা কি করা যাবে বলুন! কারো রুচির খাতিরে চন্দন মাখা আমি ছাড়তে পারবো না।

তপনের মুখের হাসি দেখিয়া মা আশ্বস্ত হইলেন। ছোটখাটো কিছু একটা উহাদের হইয়া থাকিবে। দম্পতীর কলহ, ভাবনার কিছুই কারণ নাই।

তপন চা খাইয়া উঠিয়া গেলে তপতী আসিয়া বসিল। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর! মা হাসিয়া বলিলেন,—ঝগড়া-টগড়া করিস নে খুকী—ছেলেটা বড্ড ভালো।

—অত ভালো ভালো নয়, বুঝলে মা! অত ভালো হতে ওকে বারণ করে দিও।

—তুই বারণ করিস, আমার কি দায়?

তপতী রুখিয়া উঠিল। বলিল,—ঐ 'ইডিয়ট্'টাকে শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুল্‌তে তো দায় প'ড়েছিল তখন—যত সব…

কিন্তু তপতী সামলাইয়া লইল। মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—চুপ কর খুকী, স্বামীকে ওসব বলতে নেই।

তপতীর ইচ্ছা হইতেছিল, মা'কে আচ্ছা করিয়া কয়েকটা কথা শুনাইয়া দেয়। বলে যে, 'তোমরা যাহাকে আনিয়াছ, সে আমার পদ-সেবারও যোগ্য নহে। তাহাকে আমি লইব না। তোমরা তাহাকে লইয়া যাহা খুসি করিতে পার।' কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্রী হইবে, বাবা শুনিবেন, এখনি একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়া যাইবে, অতএব সে থামিয়া গেল।

মা বলিলেন,—দিন ঠিক করেছি, পয়লা বোশেখ তোদের আবার ফুলশয্যা হবে।

—আচ্ছা, পয়লা বোশেখ সে কথা ভাবা যাবে—বলিয়া তপতী চলিয়া আসিল।

শিখা কেন আসিল না কাল? তাহাকে যে তপতীর কি ভীষণ দরকার! তপতী আবার ফোন্ করিল!

শিখা ফোনে আসিয়া বলিল,—কি ব'লছিস তপু?

—আমার বিপদে তুই চিরকাল সাহায্য ক'রেছিস্ শিখা; আজ আমার এই ঘোর দুর্দ্দিনে কেন তুই লুকোচ্ছিস্ বল ত?

শিখা স্নেহভরা গলায় বলিল,—লুকোইনি তপু! আমি একজন সন্ন্যাসী দাদা পেয়েছি, তাঁর কাছেই এ কয়দিন কাটলো। এখনি আবার আসবেন তিনি।

—বেশ তো, তাঁকেও নিয়ে আয়।

—যাবেন না। আলাপ-পরিচয় না হ'লে যাবেন কেন?

—তা হ'লে কি আমি যাবো তোদের বাড়ী?

—আসতে পারিস, তবে দাদার সঙ্গে দেখা হবে না।

—কারণ?

দাদা চট্ ক'রে কারো সঙ্গে আলাপ করেন না! তারপর তুই আর্য্যনারী হয়ে স্বামীকে গ্রহণ করিস নি, শুনলে চটে যাবেন।

মুহূর্ত্তে তপতীর অন্তর রোষ-রক্তিম হইয়া গেল,—বলিল,—থাক্ ভাই, সেই আর্য্যপুত্রের সঙ্গে আলাপ করার আমার দরকার নাই। তাহ'লে আসবি নে?

—না ভাই, মাফ করিস!

—আচ্ছা, আর ডাকবো না তোকে।

তপতী ফোন্ ছাড়িয়া দিল। ওদিকে ফোন্ হাতে করিয়া শিখা বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে!

সকালবেলার শীতল হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। একটা চাঁপাগাছের তলায় তিনখানা বেতের চেয়ার পাতিয়া শিখা অপেক্ষা করিতেছিল। মাত্র মাস খানেক হইল তপনের সহিত তাহার পরিচয়, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ঐ স্পর্শমণির পরশে শিখার অন্তর যেন সোনা হইয়া গেল। কিন্তু ঐ মণিটি যাহার সে উহাকে পাথর ভাবিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। তার মত দুর্ভাগিনী আর কেহ

আছে কি না, শিখা জানে না। তপতীর জন্য শিখার অন্তর করুণায় দ্রব হইয়া উঠিল।

তপন ও বিনায়ক আসিয়া পৌঁছিল। শিখা প্রণাম সারিয়া বলিল,—একটা কথা শোন দাদা,—একটা প্রার্থনা।

—কি বল্? তোর প্রার্থনা পুরানো তো দাদার গৌরব।

—জানি। অনুচিত কিছু চাইবো না দাদা! তুমি তপতীর সঙ্গে বা তার কাছে এমন দুচারটা কথা বল, যাতে সে তোমাকে চিনবার সাহায্য পায়, অন্ততঃ উৎসুক হয়।

—তাতে লাভ কি শিখা?

—আছে লাভ। আমার বিশ্বাস, তপতী আজো তোমার অযোগ্যা হ'য়ে যায় নি। ওর প্রথম জীবন অত্যন্ত সুন্দর, ওর ঠাকুরমা-ঠাকুরদার হাতে গড়া। ও এই সোসাইটির চার্মে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, কিন্তু এখনো নষ্ট সে হয় নি। তুমি ওকে বাঁচাও দাদা।

—মরণ-বাঁচনের অধিকার আমার হাতে নেই শিখা। তবে যদি সে আজো অনন্যপরায়ণা থাকে, যদি সে সতী থাকে, তা'হলে তাকে আমি পাবো। তার জন্য আয়োজনের তো কিছু দরকার নেই। তবুও তোর কথা রাখবো যতটা সম্ভব।

শিখা নীরবে নতনেত্রে স্বহস্ত-প্রস্তুত খাবারগুলি সাজাইতে লাগিল। বিনায়ক ফুটন্ত চাঁপা ফুলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ফুলটা ফুটিয়াছে অত্যন্ত উঁচুতে, নাগাল পাওয়া যায় না। বিনায়ক একটা লাফ্ দিল।

শিখার করুণ মুখশ্রী হাসিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল,—শুধু কারখানার হিসাবই দেখেন না, ফুলের খবরও রাখেন দেখছি!

হাসিমুখে বিনায়ক বলিল,—রাখি, কিন্তু নিজের জন্য নয়, মীরাটা বড্ড ফুল ভালবাসে।

—আমার জন্যও একটা পাড়বেন।

বিনায়ক ত্বরিতে জবাব দিল,—কেন, আপনার তো দাদা র'য়েছে, দিক্ না পেড়ে!

ঠোঁট ফুলাইয়া শিখা কহিল,—দাদা তো আছেই, আপনি বুঝি কেউ নন? কথাটা বলিয়াই শিখার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিল, তপন কিঞ্চিৎ দূরে একটা কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে। নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য ডাকিল—দাদা, খাবে এসো!

বিনায়ক কিন্তু কথাটার জের ছাড়ে নাই, কহিল,—আমার সঙ্গেও তা'হলে একটা সম্পর্ক আপনার হওয়ার দরকার! কী সম্পর্ক বাঞ্ছনীয় আপনার?

—আপাততঃ বন্ধু! শিখা জবাব দিয়া সরবৎ তৈরী করিতে লাগিল।

ঐ "আপাততঃ" কথাটীর মধ্যে রহিয়াছে যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত তাহাই ভাবিতে গিয়া শিখার হাস্যমধুর মুখের পানে চাহিয়া বিনায়ক বুঝিল, শিখাকে পাওয়া তাহার পক্ষে খুব কঠিন না-ও হইতে পারে। কিন্তু তাহার ভয় করিতেছে। তপনের দারুণ ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা তাহাকে আতঙ্কিত করিয়াছে। এই সোসাইটিতে দরিদ্র বিনায়ক আবার ঢুকিবে! শিখা তাহার আকাঙ্খার ধন, শিখাকে পাইলে ধন্য হইয়া যাইবে বিনায়ক কিন্তু শিখাকে সে রাখিবে কোথায়?

—কি ভাবছিস্ বিনু—বলিয়া তপন ফিরিয়া আসিল।

—ভাবছেন, আমার সঙ্গে উনি কি সম্পর্ক পাতাবেন—বলিয়া শিখা গ্লাসের সরবৎ আরো বেগে নাড়িতে লাগিল। মুখে তাহার হাসি মাখানো।

তপন শিখার গায়ে একটা কৃষ্ণচূড়ার ঝরা ফুল ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, —দুষ্টু, আমার বন্ধুকে বিব্রত করে তুলেছিস্?

—কি করা যায় দাদা, তোমার বন্ধু যদি নিঃসম্পর্কীয়া কাউকে ফুল তুলে না দেন, তা'হলে সম্পর্ক একটা পাতানো ভাল নয় কি ? মীরাটা কিন্তু বড্ড দেরী করছে ভাই !

—থাম্—তার স্বামী, শাশুড়ী, শ্বশুর। সকালবেলা বিস্তর কাজ! ঐ তো এসেছে !...

প্রকাণ্ড একটা গাড়ী গেটে ঢুকিতেই শিখা ছুটিয়া গিয়া মীরাকে জড়াইয়া ধরিল—আয় দুষ্টু, এত্তো দেরী ক'রলি যে... !

—চুপ, চুপ,—বিনুদা এক্ষুনি মার লাগাবে। ওর কারখানার পাংচুয়ালিটি বড্ড কড়া। কিন্তু বিনুদার মুখটা যেন,—কি হয়েছে বিনুদা ? মীরা বিনায়কের মাথার চুলে হাতের আঙুলগুলি ডুবাইয়া নাড়িতে লাগিল।

—না বোন্‌টি, কিছু হয়নি ; আয়, তোর জন্য এই ফুলটা পেড়ে রেখেছি।

মীরা ফুলটা লইয়া খোঁপায় পরিতে পরিতে বলিল,—তোর কই, শিখা ?

শিখা করুণ কণ্ঠে কহিল,—আমায় দাদাও দিল না, তোর বিনুদাও না।

—বা-রে ! বিনুদা, ফুল পেড়ে দাও, আমার হুকুম, ওঠো !

বিনায়ক উঠিতে যাইতেই শিখা ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল,—না-না, আগে খেয়ে নিন— !

মীরা যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এমনি ভঙ্গী করিয়া বলিল,—বটে ! আমার চেয়ে তোর দরদ ওর উপর বেশি ? আচ্ছা ! তোমাকে ওর হাতে দিয়ে দিলুম বিনুদা, বুঝে কর গিয়ে এবার থেকে।

মীরা সটান তপনের পায়ের কাছে বসিয়া হাঁটুতে চিবুক রাখিয়া বলিল,—কাল কি হোল দাদা, কেঁদেছিলে সারা রাত ?

—না বোন্‌টি, কাঁদবো কেন ? তোর দাদা কি এতো দুর্ব্বল !

কথাটা বলিয়াই তপন মীরার খোঁপা হইতে চাঁপা ফুলটা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—

"আমারে ফুটিতে হোল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে—আমি চম্পা"।

ব্যাপারটা বেশ সরস হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মীরার প্রতি উচ্চারিত তপনের শেষের কথাটি এই ক্ষুদ্র সভাটিকে সচকিত করিয়া দিল। এইখানে এমন একজন আছে, অতলান্ত সাগরের মত যাহার বেদনা পারহীন, কূলহীন। তাহার কথা শিখা বা বিনায়ক ভুলিয়া না গেলেও খুব তীক্ষ্ণ ভাবে মনে রাখে নাই।

তপনের কথায় শিখার নারী-হৃদয়ের কোমলতা যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল, তিরস্কারের স্বরে সে বলিল,—তুমি হয়তো খুবই কঠিন দাদা, কিন্তু তুমি এমন ক'রে কথা বলো যে পাষাণও কেঁদে ওঠে।—শিখার দুইচোখ কারুণ্যে কোমল হইয়া উঠিল।

মীরা শিখার কাছে আসিয়া স্নেহের মাধুর্য্যে কহিল,—দাদা আমার আকাশের তপনের মতই নিজেকে ক্ষয় ক'রে পৃথিবীকে আলোক দেবে। এই তার সাধনা শিখা!

—তোরা ভাই বোন দু'জনেই সমান, মীরা। তোদের হাসিভরা কথা শুনে জনহীন প্রান্তর পর্য্যন্ত কেঁদে ওঠে।

মীরা এবং তপন অপ্রস্তুতের মত চুপ করিয়া গেল। বিনায়ক অবস্থাটাকে একটু হালকা করিবার জন্য বলিল,—কান্না মানুষের প্রথম অভিব্যক্তি!

রুখিয়া শিখা জবাব দিল,—তাই অমনি বন্ধু জুটিয়েছেন, প্রতি কথায় কাঁদাবে!

বিনায়ক বলিল,—রোদনের মধ্যে দিয়েই আমরা শ্রেয়ঃ লাভ করি, শিখা দেবী।

—রাখুন আপনার ফিলজফি! শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে আমার ধারণা আপনার সমান না হতে পারে।

—না হতে পারে, কিন্তু হতেও তো পারে !—তপন টিপ্পনি দিল।

—রাগিও না দাদা, ভাল লাগছে না। তোমার বন্ধুর শ্রেয়ঃ যদি দিনরাত কান্না দিয়ে পাওয়া যায়, তা'হলে আমার তা চাইনে !

—আমরা কে কি চাই তা আমরা নিজেরাই জানিনে শিখা দেবী—বিনায়ক বলিল।

—রাখুন, রাখুন, এটা আপনার কলেজের ক্লাশরুম নয়। আমি কি চাই, তা আমি খুব ভাল ক'রেই জানি !

মীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল,—জানিস্ তো চেয়ে নে-না ভাই।

রোষরক্ত নয়নে শিখা ডাকিল,—মীরা ? ভালো হ'চ্ছে না !

হাসি বিকশিত মুখে মীরা বলিল,—খুব ভালো হ'চ্ছে শিখা !

দোতলার বারান্দা হইতে শিখার মা ডাকিয়া বলিলেন,—রোদ্‌টা কড়া হ'য়ে উঠলো তপন, ঘরে এসো বাবা তোমরা।

তপন ও মীরা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। এ যাওয়ার উদ্দেশ্য এতই স্পষ্ট যে শিখা লজ্জা-নতমুখে খাবারের বাসনগুলি গুছাইতে লাগিল। বিনায়ক একটা ফুল পাড়িয়া শিখার হাতে দিয়া বলিল,—বেশ, তা'হলে বন্ধুই হ'লেন—কেমন, রাজি ?

—রাজি !—শিখা নতমুখে বলিল কথাটা।

ইচ্ছা থাকিলেও বেশীক্ষণ বিনায়কের কাছে একলা থাকিতে শিখার লজ্জা করিতেছিল। উভয়ে চলিয়া আসিল ছায়াঢাকা বারান্দায়।

পয়লা বৈশাখ সকালে উঠিয়াই তপতীর মনে পড়িল, নববর্ষের নিমন্ত্রণ-লিপি কেনা হয় নাই। আজই বন্ধুগণকে তাহা পাঠান উচিৎ। বৎসরের

প্রথম দিন বলিয়া হয়তো তপনের উপর তাহার মনটা একটু প্রসন্ন ছিল।

মা'কে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—আমার নববর্ষের নিমন্ত্রণ-লিপি কেনা হয় নি মা, এখুনি যেতে হবে। সে আবার সেই কলেজ ষ্ট্রীট—এ পাড়ায় পাওয়া যায় না।

মা বলিলেন,—তা যা-না কলেজ ষ্ট্রীট, কিনে আন্‌গে!

—একা যাবো মা? ওদিক পানে আমি বেশী যাইনে।

মা এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন, তারপরেই হাস্যদীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, —একা কেন যাবি, তপনকে নিয়ে যা। যাও তো তপন, নববর্ষের কার্ড কিনে আনো গিয়ে।

এতোটা তপতীর ইচ্ছা ছিল না। ঐ অভদ্র লোকটাকে লইয়া বাজার করিতে যাইতে সে নারাজ। কিন্তু মা যে-ভাবে কথাটা বলিলেন, তপতী আর না যাইয়া পারে না। সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, —বেশ, গাড়ীটা বের করুক।

তপন নীরবেচা পান শেষ করিয়া উঠিয়া গেল এবং গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া চালকের আসনে বসিয়া তপতীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সুন্দর একটা হালকা রং-এর শাড়ী পরিয়া তপতী নামিয়া আসিল। কিন্তু ঐ সুবেশা তরুণীকে একটা চন্দন-তিলক আঁকা কিম্ভূতের পাশে দেখিলে লোকে ভাবিবে কি! দুই মুহূর্ত্ত ভাবিয়া তপতী ভিতরের আসনে উঠিয়া বসিল—তপন গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কলেজ ষ্ট্রীটের একটা বড় দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তপতীর গাড়ী। নামিয়া সে দোকানে ঢুকিল। সম্ভ্রান্ত তরুণী দেখিয়া দোকানের কর্ম্মীরাও প্রয়োজন জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

তপতী কার্ড দেখিতে চাহিল; একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল তপন গাড়ীতে বসিয়া রাস্তার ওপারের ফুলের দোকানটায় সাজানো ফুলগুলির

দিকে চাহিয়া আছে। দোকানের একজনকে তপতী আদেশ করিল,—ওকে বলুন তো দু'টাকার ফুল কিনে আনুক।

সে ব্যক্তি দোকানের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া কহিল,—এ ড্রাইভার, দু'রুপেয়াকো ফুল লে-আও।

তপন নীরবে নামিয়া ফুলের দোকানে চলিয়া গেল। তাহাকে 'ড্রাইভার' সম্বোধন করায় তপতীর প্রথমটা লজ্জাই হইয়াছিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিল, দোকানের কর্ম্মচারীর কিছুমাত্র অপরাধ নাই। মৃদু হাসিয়া সে কার্ড চাহিয়া লইল এবং মূল্য দিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া চালকের আসনে নিজে বসিল।

তপন অনেকগুলি ফুলের একটা বোঝায় মুখ আড়াল করিয়া ফিরিতেই তপতী নিজের বাঁ-দিকের খালি জায়গাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, —রাখুন।

তপন ফুলগুলি সেখানে রাখিয়া দেখিল, তপতীর পাশে বসিবার আর স্থান নাই। সে ভিতরের সীটে আসিয়া বসিবামাত্র তপতী গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি একটি লোককে দেখিয়া তপতী গাড়ী থামাইয়া প্রশ্ন করিল,—এখানে কোথায় ?

—রুগী দেখতে গিয়েছিলাম—ফির্‌ছি।

—আসুন গাড়ীতে—বলিয়া তপতী ফুলগুলি স্বহস্তে তুলিয়া নিজের কোলের উপর রাখিয়া ভদ্রলোকের বসিবার স্থান করিয়া দিল আপনার পাশে। ভদ্রলোক তপনকে চিনেন না, কিন্তু তপতী পরিচয় করাইয়া না দেওয়ায় তাহার দিকে একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন।

তপন নীরবেই বসিয়া রহিল। তাহাকে এইভাবে অপমান করিবার জন্যই তবে তপতী সঙ্গে আনিয়াছে! ভালই! ব্যথা তপনের অন্তরে জাগিতেছে, কিন্তু সহ্যশক্তিও তাহার অসীম। ওদিকে তপতী গাড়ী

চালাইতে চালাইতে কথা বলিতেছে,—এইখানেই নিমন্ত্রণ ক'র্‌ছি, নিশ্চয়ই যাবেন বিকালে!

—নিশ্চয়ই যাবো—আপনার হাতের লিপি না পেলে বছরটাই মিছে হবে!

—খোসামুদি খুব ভালো শিখেছেন, দেখ্‌ছি। কার কার স্তব কর'ছেন আজকাল?

—স্তব করবার যোগ্য মেয়ে কমই থাকে মিস্ চ্যাটার্জি!

—যেমন আমি একজন—বলিয়াই তপতী উচ্ছলভাবে হাসিয়া উঠিল। ভদ্রলোক বিব্রত হইতে গিয়া সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন,—কথাটা সত্যি!

—ওঃ! এইখানে নামবেন তো—আচ্ছা, নমস্কার!

ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীর দরজায় নামিয়া গেলন। তপতী আবার গাড়ী চালাইল। তপনকে সে যথেষ্ট অপমান আজ করিয়াছে। যদি সে মা'কে গিয়া সব কথা বলিয়া দেয়! তপতীর মাথায় এতক্ষণে একটা দুশ্চিন্তা জাগিল। পিছন ফিরিয়া দেখিল, তপন গাড়ীর কিনারায় মাথা রাখিয়াছে। তাহার কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশগুলি বাতাসে উড়িয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তপতী দেখিয়াছিল তপনের মুণ্ডিত মস্তক, আজ দেখিল তাহার মাথার চুলগুলি নরম রেশমের মত থোকা থোকা হইয়া উড়িতেছে। তপতীর বুকে অকস্মাৎ একটা মমতার শিহরণ জাগিল। গাড়ী বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াছে। গেটে ঢুকিয়া তপতী নামিতেই দেখিতে পাইল, তপন নামিয়া দারোয়ানকে বলিতেছে,—মা'কে বলে দিও, আমি বারোটা নাগাদ ফিরবো।

তপতী কত কি ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

বিকালের স্নান সারিয়া তপন যখন খাইতে আসিল তপতীর বন্ধুরা তখন মহাসমারোহে আহারে বসিয়াছে। তপনকে দেখিয়া দু'একজন একটু নাক সিট্‌কাইল। অধিকাংশই তাহাকে চেনে না।

বন্ধুরা যে বারান্দায় খাইতে বসিয়াছে, তপন তাহা পার হইয়া ওদিকের ঘরে তাহার নিত্যকার খাইবার স্থানে গিয়া বলিল,—কৈ মা, খাবার দিন!

—ওখানে বসবে না বাবা—ওদের সঙ্গে?

—না মা, আমার অসুবিধা বোধ হয়। ওদের দলের তো আমি নই মা!

তপতী উৎকর্ণ হইয়াছিল, মা'র সহিত তপনের কি কথা হয় শুনিবার জন্য। যেটুকু সহানুভূতি আজ তপনের উপর তাহার জন্মিয়াছিল, মুহূর্ত্তে তাহা উবিয়া গেল! উনি ওদের দলের নন—কি বাহাদুরী! উহার জন্য তবে তপতীকেই বুঝি ভদ্র-সমাজ ত্যাগ করিতে হইবে। রাগিয়া তপতী চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আরো কি কথা হয় শুনিবার জন্য দাঁড়াইল। মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা বাবা, এখানেই বোস। তিনি একটা চপ ও একটা কাটলেট তপনকে খাইতে দিলেন।

তপন নিতান্ত বিনয়ের সহিত বলিল,—ওসব আমি ভালবাসিনে মা, মাছ-মাংস তো আমি খুব কম খাই, আমায় রুটি মাখন, আর জেলি দিন।

তপতী আর শুনিল না। ঐ দারুণ বর্ব্বরকে লইয়া তাহাকে ঘর করিতে হইবে! ইহা অপেক্ষা তপতী যেন মরিয়া যায়। মা জানুক সব কথা, তপতী ঐ হতভাগাকে যেমন করিয়াই হউক বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে।

মনের ভিতরটা যেন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে বন্ধুগণের প্রতি তাহার স্নেহাধিক্যে। সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজ সমাধা করিল, তপতীর জয়গান করিল এবং নূতন তৈরী লন্‌টাতে খেলিবার জন্য গিয়া জমায়েত হইল।

তপনকে আর একচোট অপমান করিবার জন্য চেঁচাইয়া তপতী বলিল,—আমি খেল্‌তে যাচ্ছি মা, বারান্দা থেকে দেখো কেমন খেলা শিখেছি!

মা বলিলেন,—তুমি টেনিশ খেলবে না বাবা?

—ও খেলা আমি খেলিনে মা, ওটা বড়লোকদের খেলা, আমাদের পোষায় না।

—হলোই-বা, যাও, একটু খেলা কর গিয়ে।

—না মা, আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি!

তপন বাহির হইয়া গেল।

মার মন সন্তানের কল্যাণকামনায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। খুকীর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া মিসেস চ্যাটার্জ্জি অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িতেছেন। স্বামীকে সব কথা খুলিয়া বলিতেও তাঁহার ভয় হয়,—কারণ তিনি জানেন, স্বামীই এই ব্যাপারের মূল। খুকী তপনকে দেখিতে পারে না, শুনিলেই তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাইবেন। আর খুকী ঠিক কি ভাবে তপনকে দেখিতেছে, তাহা মাও সঠিক জানিতে পারিতেছেন না। এ-যুগের তরুণ-তরুণীকে লইয়া ফ্যাসাদ বড় কম নয়। যাহা হউক, আজ তিনি উহাদের ফুলশয্যার আয়োজন করিয়াছেন। খুকীর ঘরে তপনকেই আজ তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

রাত্রে খাওয়া শেষ হইলে স্নেহকোমল কণ্ঠে মা বলিলেন,—খুকীর এখন আর পড়াশুনোর চাপ নেই, বাবা, যাও ওর কাছে একবার আজ।

তপন একটু চকিত হইল, তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল,—ওর মনের উপর চাপ দিচ্ছেন কেন মা? এ যুগের মেয়েরা মনের উপর চাপ সহ্য করে না।

—কিন্তু বাবা···

বাধা দিয়া তপন বলিল,—আপনি সব কথা বুঝবেন না মা, আর আমি বলতেও পারবো না। তবে আমার হাতে আপনার খুকীকে সম্প্রদান ক'রেছেন,—এ কথা যদি ঠিক হয় তা'হলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার

ক'র্তে হ'বে সে ভার আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আপনাদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। আরো কিছু দিন যাক্।

মা তপনের কথা শুনিয়া কয়েক মিনিট নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর করুণকণ্ঠে কহিলেন,—খুকীর ঐ বন্ধুগুলোকে আমার ভয় করে বাবা—

—কিছু ভয় নেই মা, মেয়ে আপনার যথেষ্ট চালাক! ওরা তার কোন ক্ষতি ক'র্তে পারবে না। আর ক্ষতি যদি হ'য়ে থাকে, তা'হলে অনেক আগেই তা হ'য়েছে।

—সে কি কথা বাবা!—মাতা শিহরিয়া উঠিলেন।

—না মা, বিচলিত হবেন না। আপনার মেয়েকে বুঝ্‌তে সময় লাগে! তবে যতদূর মনে হয়, সে আত্মরক্ষায় সক্ষম। আমার ঘুম পাচ্ছে মা, শুইগে!

মা আর কিছুই বলিলেন না, বলিতে তাঁহার বাধিতেছিল। আপন কন্যার সম্বন্ধে আপনার জামাইএর সহিত কতক্ষণই বা আলোচনা করা যায় এইরকম একটি বিষয় লইয়া! তপন চলিয়া গেলে তিনি তপতীর কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তপতী অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া গিয়াছে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি শয়নকক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু ফিরিয়া গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। আধুনিক আলোক-প্রাপ্তা শিক্ষিতা মেয়েকে তিনি অধিক আর কি বলিতে পারেন! যতদূর বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। এ সমাজে এতখানিও কেহ বলে না। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, খুকী জানে, তপন ও-ঘরে আজ যাইবে, অথচ খুকী নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িল! তপনের জন্য এতটুকু উদ্বেগ, একটুখানি উৎকণ্ঠাও কি তাহার মনে জাগে না? সমস্ত ব্যাপারটা মিসেস চ্যাটার্জির অত্যন্ত দুর্জ্জেয় বোধ হইতেছে।

তপনই-বা কেন ও ভাবে জবাব দিল? তপন যাহা বলিল, হয়ত সেই কথাই সত্য; জোর করিলে খুকীর জেদ বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু জোর

করিতে হয় কিসের জন্য! আজ দুই আড়াই মাস তিনি তপনকে দেখিতেছেন, তাহার মতঃ চোখ-জুড়ানো ছেলে তিনি কমই দেখিয়াছেন। খুকী যদি তাহাকে অভদ্র বা ইডিয়ট্ মনে করিয়া থাকে তবে অত্যন্ত ভুল করিয়াছে—খুকীর এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। মিসেস্ চ্যাটার্জি কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন ক্রমশঃ।

ওদিকে পদশব্দটা ফিরিয়া যাইবা মাত্র তপতী চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল, তপন নহে, মা। তপন আসিতেছে ভাবিয়াই সে ঘুমের ভান করিয়াছিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মা'কে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইল। হয়ত তপন আসিবে না, কিম্বা পরে আসিবে! রাত্রি তো এগারটা বাজিয়া গেল।

তপতী দরজা খোলা রাখিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। তপন তাহা হইলে আজ আসিবে না। তপতী যেন বাঁচিয়া গেল। তপন আসিলে তাহাকে একটা নির্ম্মম আঘাত করিবার জন্য তপতী প্রস্তুত হইতেছিল,—আসিল না, ভালই হইল। কিন্তু সত্যই কি আসিবে না?

তপতী পা-টিপিয়া-টিপিয়া এদিকের বারান্দা পার হইয়া তপনের রুদ্ধদ্বার শয়ন-কক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে নিদ্রিত ব্যক্তির ভারী নিশ্বাসের শব্দ আসিতেছে। তপন তাহা হইলে ঘুমাইয়া গিয়াছে! কিন্তু কেন? তপতী মা'র কথায় সম্মতি দেয় নাই, কিন্তু প্রতিবাদও করে নাই। যাক্, না আসিয়া ভালই করিয়াছে। তপন তাহা হইলে বুঝিয়াছে যে তপতী তাহাকে চায় না। তপতী নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে গিয়া ঠিক বুঝিল না, আধুনিক যুগের বিকৃত শিক্ষা তাহার নৈরাশ্যকে নিশ্চিন্ততার রূপে দেখাইতেছে কি না। তপতী ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। ঘুম তাহার ভালই হইবার কথা, কিন্তু অনেক—অনেকক্ষণ তপতী জাগিয়া রহিল সে'দিন।

পরদিন সকালে তপতীর ক্লান্ত-বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখিয়া মা সস্নেহে কহিলেন,—বরের সঙ্গে ভাব্‌সাব্‌ করগে খুকী, দেখবি, ছেলেটা খুব ভালো।

ঝঙ্কার দিয়া তপতী কহিল,—তুমি বড্ড বাড়াবাড়ী ক'র্‌ছো মা, থামো এবার!

মা মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটা ভয়ানক কিছু উহাদের হইয়াছে, কিন্তু কী হইয়াছে? প্রশ্নের উত্তর মা খুঁজিয়া পাইলেন না তপতীর মুখের কোনো রেখায়। মায়ের চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া তপতী নিজের কথাটা সম্বন্ধে সচকিত হইল, মৃদু হাসিয়া কহিল,—এত বড়ো মেয়েকে কিছু শেখাতে হয় না মা, তোমার অত ভাবনা কেন? ভাব-সাব হ'য়েছে আমাদের। এক ঘরে না শুলেই বুঝি আর ভাব হয় না!

তপতীর মুখের হাসি দেখিয়া মা অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিলেন। আজকালকার চালাক ছেলেমেয়ে, হয়ত মা'কে ফাঁকি দিয়া বিদায় করিয়া উহারা দুইজনে মিলিত হইয়াছে। তাই তপতীর জাগরণ-ক্লান্ত মুখশ্রী মা'কে অত্যন্ত আনন্দ দিল। স্নেহ-বিগলিত স্বরে তিনি কহিলেন, —বেশ মা, আমার মনটা খুব চঞ্চল হয়েছিল কিনা, তাই ব'ল্‌ছিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো তা'হলে!

মধুর হাসিয়া তপতী কহিল,—হাঁ, একদম নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাও, কিছু ভাবনার দরকার নেই তোমার।

তপন, আসিয়াই ঘরের মধ্যে তপতীকে দেখিয়া দরজার কাছে থামিয়া গেল। মা ডাকিলেন,—এসো বাবা, খাবে। তপতীর পাশ কাটাইয়া তপন ও-দিকের একটা চেয়ারে মুখ ফিরাইয়া বসিল। তপতা সন্ধানী

দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক দেখিতে চাহিল কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। কোট-প্যান্টলুনে সমস্ত দেহটা ঢাকা। মুখের উদ্ধাংশে তিলক এবং চোখে সবুজ ঠুলি। মুখখানা অমন ভাবে ফিরাইয়া রাখিবার হেতু কি! তপতীর আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল, মুখের ডোলটা বোধ হয় ভাল নয়, হয়ত দাঁতগুলো উঁচু কিম্বা ঠোঁট দুইটা পুরু, তাই তপতীকে দেখাইতে চাহে না। কিম্বা লজ্জাও হইতে পারে। তপতী মাথার চুলগুলি শুধু দেখিতে পাইতেছে। ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত চুলগুলি পিছনদিকে উল্টাইয়া দিয়াছে, সদ্যস্নাত চুল-ঝরা একটা জলধারা ঘাড়ের পাশে গড়াইয়া আসিতেছে, ঘাড় এবং কাঁধের সংযোগস্থলে একটা ডাগর কালো তিল! পিছনটা তো খুবই সুন্দর মনে হইতেছে, আর ফিগারটাও বেশ,—লম্বা, দোহারা, বলিষ্ঠ!

সবই হয়ত ভাল, কিন্তু অসভ্য যে! আবার ঐ দারুণ গোড়ামী, তিলক-ফোঁটা, নিরামিষ খাওয়া,পাঁচালী পড়া—নাঃ, উহাকে লইয়া তপতীর চলিবে না। খাওয়া শেষ করিয়া তপতী উঠিয়া গেল, কিন্তু একেবারে চলিয়া গেল না, বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল তপনের সহিত মা'র কথা শুনিবার জন্য। মা বলিতেছেন,

—কাল তোমার কথাটা আমি ভেবে দেখলাম বাবা, ঐ ঠিক। তবে তোমরা দুটি আমাদের সর্ব্বস্ব-ধন। তোমাদের ভালর জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তপন সহাস্যে কহিল,—আচ্ছা মা, আমার দ্বারা আপনার খুকীর কিছু মন্দ হবে ব'লে কেন আপনি মনে ক'রছেন?

শুনিতে শুনিতে তপতী বিরক্ত হইয়া উঠিল। উনি তপতীর ভাল করিয়া দিবেন। কী আস্পর্দ্ধা! মা বলিলেন,—তোমাদের দুটিকে সুখী দেখবার জন্যই বেঁচে আছি বাবা!

মা'র কণ্ঠে কল্যাণাশীষ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অপার্থিব

মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া প্রতারণার কথা বলিতে তপনের বিবেক পীড়িত হইতেছে! সে চুপ করিয়া খাইতে লাগিল। তপতী পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—আমায় আর এক কাপ চা দাও মা, খুব কড়া করে!

মা অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। নিশ্চয়ই উহারা কাল মিলিত হইয়াছিল, রাত জাগার জন্য খুকীর কড়া চা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বলিলেন,—আর একটু খুকী ঘুমোগে, শরীরটা ঝরঝরে হ'য়ে যাবে।

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, অনুভব করিল, খুকীর অভিনয় চমৎকার জমিতেছে। মা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মাতৃত্বের এই ব্যাকুল আবেদন তপনের মনকে আর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কিছুই সে করিতে পারে না। মা'র কন্যাই যখন অভিনয় করিতেছে, তখন সে আর কি করিবে?

বিষাদখিন্ন তপন বাহিরে চলিয়া গেল। তপতীও কড়া চা খাইয়া আপনার কক্ষে আসিল, হাসিল খানিক আপন মনে এবং কবিতার খাতাটা টানিয়া লইয়া "বঞ্চিতের বেদনা" কবিতা লিখিতে বসিল।

শিখা কয়েকটি মেয়েকে কারখানার প্রাঙ্গণে আনিয়া জড় করিয়াছে। উহাদের নিকট তাহার কি একটা প্রস্তাব আছে। বিনায়ক একধারে চুপচাপ দাঁড়াইয়াছিল, তপন এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। শিখা কহিল,—আচ্ছা মিতা, দাদার যদি দেরী থাকে তো আমরা আরম্ভ করি।

—বেশ তো, করুন আরম্ভ—বিনায়ক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল। শিখা আরম্ভ করিল,—ভগ্নিগণ আমাদের অভাব এত বেশী, যে মেটাবার চেষ্টা করতেও ভয় হয়। কিন্তু ভয় ক'র্‌লে চলবে না। অভাব আমাদের যত

অভাব-বোধ তার চেয়ে তীব্র হ'য়ে উঠেছে। অতএব এই ঠিক সুযোগ, যখন আমরা অভাবের প্রতিকার করতে কায়মনে লাগতে পারবো।

আমার প্রস্তাব এই যে, আপনারা দিনকয়েক এই কারখানার খেলনাগুলো রং ক'রতে শিখুন, ছোট ছোট পার্টগুলোকে জোড়া দিতে শিখুন, যাঁর হাত নিপুণ তিনি আরো কিছু বেশী শিখুন তারপর সাজসরঞ্জাম নিয়ে আপনারা যাবেন অভাবগ্রস্থদের অন্তঃপুরে। সেখানে মেয়েদের এই কাজ শিখিয়ে দেবেন, তাঁদের কাঁচামাল সরবরাহ করবেন, তৈরী ক'রবেন এই সব খেলনা। তৈরী মাল বিক্রী করবার ভার আমাদের। মজুরী তাঁরাও পাবেন, আপনারাও পাবেন। অবসর সময়ে একাজ করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা যাবে বাড়ীতে বসে।

খেলনার সঙ্গে আমরা কার্ডবোর্ড বাক্স তৈরী শেখাবো আর শেখাবো আয়ুর্ব্বেদীয় নানা রকম ঔষধ আর টয়লেট তৈরী ক'র্‌তে, যার গুণ আপনাদের বিলিতী ঔষধ, এসেন্স-সাবান-স্নো-পাউডার থেকে অনেক বেশী। অথচ দাম হবে বিলাতীর অর্দ্ধেক। এসব কাজের জন্য যা-কিছু সরঞ্জাম দরকার সবই এখান থেকে দেওয়া হবে। আপনারা শুধু কাজ ক'রবেন। ছয়মাস করে দেখুন, না-পোষায় ছেড়ে দেবেন।

শুধু সৌখীন শিল্প, ঘর সাজাবার উপকরণ দিয়ে দেশের কিছু হবে না। ওগুলোর দরকার আছে তরকারী হিসাবে, কিন্তু ডালভাতের দরকার আগে। অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন না ক'রলে কিছুতেই সুসার হয় না।

এ কাজ যদি আমাদের সফল হয়; তা'হলে পরের কাজ হবে আমাদের আরো বড়—আরো ব্যাপক। সে কাজ দেশের মানুষ তৈরী করার কাজ। আমরা প্রত্যেকে শুধু দুটি-চারটি করে মানুষ গড়ে যাবো যারা নেতার আহ্বানে সাড়া দেবে,অকম্পিত হৃদয়ে মৃত্যুবরণ ক'রবে শ্রেয়ঃ লাভের জন্য। আমি আপনাদের নেত্রীত্ব চাইনে, আমিও আপনাদের মতন একজন কর্ম্মী থাকতে চাই এবং সমান কাজ ক'র্‌তে চাই।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

তপন আসিয়া পৌঁছিল এবং হাসিমুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। শিখা বলিয়া চলিল,—এই আমার দাদা, অন্তরাল থেকে উনি এবং ওঁর বন্ধু বিনায়কবাবু আমাদের সাহায্য করবেন—দেখবেন, ক্ষতি যাতে আমাদের না হয়। ওঁরা দু'জনে এই কারবারটা গড়ে তুলেছেন, অতএব মাড়োয়াড়ী-জনোচিত অভিজ্ঞতা যে ওঁদের আছে তা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। আর ওঁরা ব'লেছেন, ক্ষতি যদি হয় ওঁদের হবে, লাভ যদি হয় তো আমাদের ; আর ক্ষতিই বা হবে কেন ? আসুন, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ ক'রবো।

মেয়েগুলি সত্যই অভাবগ্রস্থ পরিবারের। কাজের প্ল্যান শুনিয়া ও সমস্ত দেখিয়া তাহাদের প্রত্যয় জন্মিল! অবসর সময়ে এ কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন হইতে পারে। তাহারা লাগিয়া গেল।

তপন শিখাকে ডাকিয়া বলিল,—বিয়ে-থা ক'রতে হবে না বুড়ি ? এই সব করবি নাকি তুই ?

—বিয়ের হয়তো দরকার আছে দাদা, দিও যখন ইচ্ছে কিন্তু এ সবেরও দরকার আছে। তোমার বোন তোমার মর্য্যাদা রাখতে চায়।

হাসিমুখে তপন বলিল,—বেশ কথা, তবে বিয়েটাও দেব, আর এই মাসেই।

—কেন ? বুড়িয়ে গেলুম নাকি দাদা ?

—সেটা দেখবার ভার আমাদের উপর—তুই এখন যা ক'রছিস, কর !

তপন অফিস-ঘরে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর বিনায়ক আসিয়া বিপন্ন মুখে কহিল,—শুনছেন মিতা আপনার দাদা বড্ড জ্বালাতন ক'রছে।

—আমার দাদা তো কাউকে জ্বালায় না—শিখা জবাব দিল।

বিনায়ক মাথা চুলকাইয়া বলিল,—কিন্তু আমায় ক'রছে জ্বালাতন।

—কেন ?

—আমি আর সব কাজ করতে পারি, লাউ-কুমড়ো কুট্‌তে পারিনে।

শিখা কলহাস্যে ঝংকারিয়া উঠিল,—দাদা পারে কিন্তু…।

আমি পারিনে যে—বিনায়কের মুখে অসহায়তার ছবি ফুটিয়া উঠিল!

শিখার নারী-হৃদয় স্নেহে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। বলিল,—তা আমায় বুঝি আপনার কাজটা ক'রে দিতে হবে? চলুন, যাচ্ছি।

শিখা আসিয়া একটা ইঁচড় কুটিতে বসিতেই তপন গম্ভীর মুখে বলিল, —ভাল হচ্চে না ভাই শিখা, ওর কাজ কেন তুই করবি? তোর সঙ্গে ওর সম্পর্ক—?

—"মিতা"—বলিয়া শিখা হাসিয়া উঠিল!

—ওঃ, তা হলে কিন্তু—তপন হাসিমুখেই থামিয়া গেল!

—কিন্তু কি দাদা?—শিখার চোখে প্রশ্নের আকুতি!

—কাঁঠালের আঠায় কুলবে না। ফুলের ফিতে দিয়ে বাঁধনটা পোক্ত ক'রে দিতে হবে।

—যাও! তুমি বড্ড ইয়ে—!

শিখা মুখ ফিরাইয়া তরকারি কুটিতে বসিল! তাহার লজ্জারক্ত মুখের পানে তাকাইয়া বিনায়ক বসিয়া ভাবিতে লাগিল, তপনের ইচ্ছা শিখার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে। শিখা বিনায়ককে গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু শিখাকে পাইবার যোগ্যতা কি বিনায়কের আছে! তপনের ইচ্ছায় চিরদিনই আত্মসমর্পন করিয়াছে, বিনায়ক আজও কিছুই বলিবে না।

সেদিন বৌদ্ধ-পূর্ণিমা।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তপন জাগিয়া উঠিল। দক্ষিণ দিকের চওড়া বারান্দা-সংলগ্ন পূর্ব্ব দিকের ঘরটায় তপন আর ঐ বারান্দারই পশ্চিম দিকের ঘরটায় থাকে তপতী। মাঝখানে বারান্দাটা যেন একটা দুস্তর নদী—

কোন দিন পার হওয়া যাইবে না। প্রভাতের সূর্য্য আসিয়া তপনের কক্ষে সূর্য্য-কিরণ ছড়াইয়া দেয়—অস্তগামী সূর্য্য তপতীর ঘরের পশ্চিমের জানালা-পথে উঁকি মারিয়া যায়। ইহারও মধ্যে হয়ত বিধাতার কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে।

মা বেশ শান্ত এবং নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছেন। উহাদের এই কয়দিনের সংবাদ তিনি আর বেশী রাখেন না। বেশ বুঝিয়াছেন, বারান্দা পার হইয়া উহাদের মিলন-গুঞ্জন ভালরূপেই চলিতেছে—ভাবিবার কিছু আবশ্যক নাই।

তপন বলিল,—কি ভাবছেন মা?

—কিছু না বাবা, খাও! তোমার মত ছেলে পেয়েছি ভাববার কি আছে?

তপনের অন্তর মূচড়াইয়া উঠিল। এই পরম স্নেহময়ী জননীকে সে প্রতারিত করিতেছে সজ্ঞানে! একবার তার ইচ্ছা হইল, মা'কে সব কথা বলিয়া জানায় যে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। ডিগ্রীহীন আর্য্যধর্ম্মভক্ত তপনকে তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবে না। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে! অনর্থক একটা উৎপাত, তপতীর উপর শাসন এবং আরো কিছু কেলেঙ্কারী। না, থাক, তপন কৌশলে জানিয়া লইবে তপতী কাহাকে চায়, তারপর তাহারই হাতে তপতীকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া সে নীরবে চলিয়া যাইবে। এই যে এখানে ইহাদের প্রচুর স্নেহমমতা সে পাইতেছে, ইহারও ঋণ তপন শেষ করিয়া যাইতে চায়—তাহা সময়সাপেক্ষ। তাহারও একটা উপায় তপন ভাবিয়া রাখিয়াছে।

অস্নাতা তপতী বাসী কাপড়েই আসিয়া ঘরের চৌকাঠ হইতে বলিল, —মা আমার লেক ক্লাবে সুইমিং কম্‌পিটিশন আছে। এখুনি যেতে হবে। নিজে গাড়ী চালিয়ে গেলে হাতের পরিশ্রম হবে মা, ড্রাইভারটা আসে নি —কি করি বলোতো!

মা হাসিমুখে বলিলেন—তপন যাক্-না গাড়ী চালিয়ে! যাওতো বাবা।
—আয় খুকী, খেয়ে নে!

—আচ্ছা মা, যাচ্ছি—বলিয়া তপন উঠিয়া চলিয়া গেল!

কিছুক্ষণ পরে তপতী আসিয়া গাড়ীর ভিতরের সীটে আসন গ্রহণ করিল। তপনের পাশে বসিল না। তপন নিরুদ্বেগে নির্ব্বিকার চিত্তে গাড়ী চালাইয়া দিল। ক্লাবের জুনিয়ার ও সিনিয়ার মেম্বারগণ একযোগে আসিয়া দাঁড়াইল গাড়ীর কাছে তপতীকে অভ্যর্থনা করিতে। সুন্দরী, সুবেশা, তরুণী তপতী! তাহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা কার না হয়!

—আসুন, আসুন, আপনার জন্যই অপেক্ষা, সময় হ'য়ে গেছে।—

তপতী নামিয়া গেল। গাড়ীটা ঘুরাইয়া ষ্টাণ্ডে লইয়া রাখিতে হইবে, তপন ঘুরাইতেছে, একজন ডাকিয়া কহিল, সুইমিং-কষ্টিউমটা দিয়ে যাও তো হে!

তপতী উহা লইতে ভুলিয়া গিয়াছে, না ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়া গিয়াছে কে জানে! তপন নির্ব্বিকার চিত্তে নামিয়া কষ্টিউমটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়া আসিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা তপন গাড়ীতে বসিয়া আছে। অকস্মাৎ দেখিল, অসংখ্য নারী-পুরুষ তপতীকে ঘিরিয়া ক্লাবঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তপতীর জলসিক্ত সুদীর্ঘ বেণী সর্পের মত দুলিতেছে! ভিজা কষ্টিউমটার উপরেই সে তাহার পাতলা শাড়ীটা জড়াইয়া লইতেছে,হাতে একটা রূপার কাপ, প্রাইজ পাইয়াছে বোধ হয়। তপন কোন দিন তপতীকে ভাল করিয়া দেখে নাই, আজও তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার হইল না। মুখ নামাইয়া সে গাড়ীটা লইয়া আসিল। তপতী ভিতরের সীটে বসিতেই তপন সবেগে গাড়ীটা চালাইয়া দিল!

তপতী ভিতরে বসিয়া ভাবিতেছে, ঐ নির্ব্বোধটা দেখুক, তপতীর সম্মান প্রতিপত্তি! তপতীকে লাভ করিবার যোগ্যতা যে উহার কিছুমাত্র নাই,

ইহা যেন সে অচিরে বুঝিতে পারে। কিন্তু তপন ফিরিয়াও তাকাইল না। তপতী ভাবিল, এসব ব্যাপারের মর্য্যাদা ঐ গ্রাম্য বর্ব্বর কি বুঝিবে! তিলক কাটিতেই যাহার দিন ফুরাইয়া যায় তাহাকে কাণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তপতীর মল্য কতখানি!

বাড়ী ফিরিয়া তপতী তাহার বিজয়ের নিদর্শন 'কাপ'টা অন্যান্য প্রাপ্ত পুরস্কারগুলির সহিত সাজাইয়া রাখিল!

সারাদিন তপতীর মনটা আত্মপ্রসাদের আনন্দে ভরপুর রহিয়াছে। সাঁতারে সে আজ প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কত উত্তেজক কথা তাহার স্নায়ু-কেন্দ্রগুলিকে দুর্দ্দান্ত আবেগে যেন ঝঙ্কৃত করিতেছিল! সন্ধ্যা হইতে বন্ধুদের লইয়া সে গানের মজলিশ বসাইয়াছে।

অন্যদিন তপন রাত্রি সাড়ে দশটার পূর্ব্বে ফিরে না, আজ কিন্তু নয়টার সময় ফিরিয়া আসিল। তপতীদের সঙ্গীত-চর্চ্চার ঘরটার পাশ দিয়াই দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। তপন নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, ঘরের কয়েকজন তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—এই যে মিষ্টার গোঁসাই, কোথায় গিয়েছিলেন?

তপন সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রশ্নটা তাহাকেই করা হইতেছে বুঝিয়া শান্তস্বরে বলিল,—বৌদ্ধ-বিহারে গিয়েছিলাম!

—ওরে বাপ্—বৌদ্ধ-বিহারের কি বোঝেন আপনি! সেখানে যান কেন?—বিদ্রূপটা স্পষ্ট।

তপন এক মিনিট স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর শান্ত স্বরেই জবাব দিল,—মেয়েদের কাছে এক কণা প্রসাদ ভিক্ষা করার চাইতে সেটা ভালো, কিছু না বুঝলেও ভালো!

তপন চলিয়া গেল। একটি মেয়ে তপনের কথাটা শুনিয়াছিল, বলিল,—ঠিক বলেছেন উনি, আপনারা তো মেয়েদের প্রসাদ ভিক্ষাই করেন!

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—করি, ভিক্ষা পাবার যোগ্যতা আছে বলে। ওকে কে ভিক্ষা দেবে শুনি?

মেয়েটি বলিল,—ভিক্ষা উনি করেন না, কোন দিন আসেন নি এখানে।

—আসেন নি কেন? আসবার কোন্ যোগ্যতাটা আছে? বৌদ্ধ-বিহারে যাওয়ার কথাটা একটা চাল্। ভাবলো, ঐ শুনে আমরা ওকে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভেবে নেব। ওসব আমরা ঢের বুঝি!

মিঃ অধিকারী কহিলেন,—হাঁ হাঁ, কর্‌বে কি আর, এখানে তো এসে মিশতে পারে না, তাই ঐ সব ভণ্ডামী দেখিয়ে পণ্ডিতি জাহির ক'র্‌তে চায়।

তপতী উঠিল; ভাল লাগিতেছে না তাহার। কি যেন কোথায় কাঁটার মত বিঁধিতেছে। তপন কি সত্যিই কোন নারীর কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করে না? সত্যিই কি বৌদ্ধ-বিহারে যায় সে!

শিখার কথাটা মনে পড়িয়া গেল—"আর্য্যনারী হ'য়ে তুই স্বামীকে গ্রহণ করলি নে"—তপতী উঠিয়া উপরে আসিল!

তপন তখনো খাইতে আসে নাই। রাত্রি মাত্র দশটা বাজিতেছে। অন্যদিন সে সাড়ে দশটার পূর্ব্বে ফিরে না। তপতী চাহিয়া দেখিল, মা খাবার-ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া কি একটা শেলাই করিতেছেন। ঘরে না ঢুকিয়া তপতী বাহিরের একটা সোফায় শুইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; কোটপ্যাণ্ট ছাড়িয়া ধুতি-ফতুয়া পরিহিত তপন খড়ম পায়ে দিয়া আসিয়া ঢুকিল খাবার-ঘরে, হাতে একটা শ্বেতপদ্ম। তপতী চাহিয়া দেখিল, মুখ তাহার পূর্ব্ববৎ ফিরানো রহিয়াছে। মুখ না দেখিয়া তপতী পায়ের দিকে চাহিল। সুন্দর সুগঠিত পা-দুখানি। খড়মের কালোর উপর কাঞ্চনবর্ণ বিকীর্ণ করিতেছে। রংটা এত সুন্দর নাকি!

—এসো বাবা, হাতে ও ফুলটি কিসের?—মা সাদর আহ্বান জানাইলেন। তপতী কাণ পাতিয়া রহিল তপনের উত্তর শুনিবার জন্য।

তপন বলিল,—আজ বুদ্ধদেবের জন্মতিথি মা, গিয়েছিলাম দেখতে, ফুলটি নির্ম্মাল্য সেখানকার।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোমাকে দেখলেই আমার বুদ্ধদেবের মুখ মনে পড়ে বাবা, তুমিই আমার বুদ্ধদেব!

তপন ত্বরিতকণ্ঠে বলিল,—না মা, ওকথা বলবেন না। তিনি মানব-দেবতা, আমি তাঁর দাসানুদাস হবার যোগ্য নই।

মা চকিত হইয়া বলিলেন,—বুদ্ধদেবকে তুমি তো খুব বেশী শ্রদ্ধা করো তপন!

—করা কি উচিৎ নয় মা? শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করার মধ্যে তো আমরা নিজেদেরকেই শ্রদ্ধাভাজন ক'রে তুলি—শ্রদ্ধা না ক'র্‌লে বুদ্ধদেবের কিছুই ক্ষতি হবে না মা, আমাদেরই মনুষ্যত্বের অপমান হবে।

মাতা মুগ্ধ হইয়া গেলেন, তপতী বিস্মিত-বিহ্বল হইয়া গেল। এই লোকটা ইডিয়ট! ইহার অপেক্ষা মানবতার অধিকতর গৌরব-বহনকারী মানুষ তপতী তাহার জীবনে দেখে নাই। চঞ্চল পদে সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

—আয়, খেয়ে নে খুকী—মা ডাকিলেন!

তপনের আনিত পদ্মটা লইয়া খোঁপায় গুঁজিতে গুঁজিতে তপতী কহিল, —আমি এখনো কাপড় ছাড়িনি মা।

—যা, ছেড়ে আয় চট্ করে।

তপতী তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আজ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার সন্ধ্যাবেশ-পরিহিত সুচারু তনিমার দিকে তপন একবার চহিয়া দেখুক। তপন কিন্তু মুখ তুলিল না। পাঁচ-সাত মিনিট অপেক্ষার পর নিরাশ হইয়া তপতী চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে একাকী শুইয়া তপতী ভাবিতেছিল, ঐ তো ওপাশের ঘরটায় সে ঘুমাইতেছে। ঐ নিরহঙ্কারী মানুষটি, কম খায়. কম কথা বলে,

নিজেকে জাহির করে অত্যন্ত কম। খুঁজিয়া ফিরিলেও উহার সাড়া প্রায় পাওয়া যায় না। যা-কিছু কথা উহার মা'র সঙ্গে। তপতী তো এতদিন উহার খবর লয় নাই, বরং নির্ম্মমভাবে উহাকে নির্য্যাতিত করিয়াছে; উহার প্রাপ্য সম্মান হইতে উহাকে সে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করিয়াছে। তথাপি সে রহিয়া গেল, নিঃশব্দে, নির্ব্বিকারে! ভাবিতে ভাবিতে তপতী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙিতেই দেখিল—বেলা হইয়া গিয়াছে; উঠিতে গিয়া শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ বোধ হইল, কিন্তু শরীরের গ্লানিকে মনের জোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে স্নানের ঘরে ঢুকিল। পরিপাটি করিয়া স্নান সারিয়া ফিকে নীল শাড়ী পরিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এক পিঠ খোলা চুল মেলিয়া। আশা জাগিতেছিল অন্তরে, তপনের সহিত যদি একবার দেখা হইয়া যায়। তপনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের পানে চাহিয়া দেখিল সে বাহির হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে খাবার ঘরের দরজায় আসিয়া শুনিল, মা বলিতেছেন,—দু'লাখ টাকা! অত টাকা ক'র্‌বে কি ও?

—কি জানি! যা খুসী করুকগে! টাকার তো তোমার অভাব নাই নীলা!

বাবা উঠিয়া যাইতেছিলেন, মা বলিলেন,—ভালই হ'য়েছে, ছেলেটার যা নিস্পৃহ মন? টাকাকড়ি নিলে বাঁচি!

পিতা হাসিয়া বলিলেন,—নেবে নেবে, ভাব্‌ছো কেন? শিলং-এ তাহ'লে পাঠাচ্ছ না!

—থাক্। ছেলে মানুষ দু'জনেই! কোথায় একলা পাঠাবো বাপু, তার চেয়ে আমার চোখের উপর দু'টিতে থাক্; পূজার সময় সবাই যাব শিলং।

কথাটা তপনের সম্বন্ধে। মুহূর্ত্তে তপতীর অন্তর স্তব্ধ হইয়া গেল। দুই লক্ষ টাকা সে বাবার কাছ হইতে লইয়াছে! অত টাকা দিয়া কি করিবে সে! তবে কি টাকার জন্যই সে তপতীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া

যায়। লোকটা তো আচ্ছা ধড়িবাজ। এইজন্যই বুঝি তপতীর ব্যবহারের কথা বাবা-মাকে একদিনও বলে নাই। দিব্য অভিনয় করিয়া চলিয়াছে তো!—আচ্ছা, দেখা যাইবে।

তপতী আসিয়া চা খাইতে বসিল। মা সস্নেহে বলিলেন,—রান্না-বান্না যে ছেড়ে দিলি খুকী, ভাল লাগে না?—মাতার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।

তপতী ক্রোধ দমন করিয়া কহিল,—নিরিমিষ রাঁধবার জন্য আমার হাত কামড়াচ্ছে না।

মা একটু বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন,—কি করবো বাছা, মাছ-মাংস খেতে ও ভালবাসে না—তবে একবারে যে খায় না, তা তো নয়। তুই বলিস না কেন খেতে?

—আমার দায় পড়েনি—যার যা খুসী খাবে, আমার কি?

তপতী চলিয়া গেল। মা বুঝিলেন, ইহা জামাতার উপর কন্যার অভিমান। মধুর হাসিতে তাঁহার মুখ ভরিয়া গেল। ভাবিলেন তপনকে মাংস খাইবার জন্য তিনি নিজেই অনুরোধ করিবেন। তপন তাঁহার কথা নিশ্চয় রাখিবে।

তপতী আপন ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া কত কি ভাবিল। বাবার কাছে টাকা আদায় করিবার বেশ চমৎকার ফন্দি আবিষ্কার করিয়াছে লোকটা। তা বেশ, নিক্ সে, টাকা লইয়াই যেন সরিয়া পড়ে। তপতী উহার মুখ দেখে নাই—দেখিবে না!

তপতীর অন্তরে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল! মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য মিঃ ঘোষালের মত সুপাত্রের সহিত তপতী বিবাহিত হয় নাই, আর তাহারই স্থান অধিকার করিয়া ঐ বর্ব্বর লোকটা দুই লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইল! টাকার উপর তপতীর কিছুমাত্র মায়ামমতা নাই, কিন্তু লোকটার ধূর্ত্তামী তপতীর অসহ্য বোধ হইতেছে। সে নিঃসংশয়ে বাবা আর মা'কে বুঝাইয়াছে যে তপতীর সহিত তাহার প্রেম নিবিড় হইয়া

উঠিয়াছে, অতএব দুই লক্ষ টাকা সে এখন পাইতে পারে। তপতীর নির্ব্বোধ স্নেহময় বাবা-মা নিশ্চিন্ত মনে উহার খোশ-খেয়াল মিটাইবার জন্য নগদ দুই লক্ষ টাকা উহার হাতে তুলিয়া দিলেন! আচ্ছা, তপতীও দেখিয়া লইবে, সে কত বড় ধূর্ত্ত।

কিন্তু লোকটা মোটেই মূর্খ নয়। লেখাপড়া ভালো না জানিলেও সে নিশ্চয় বুদ্ধিমান। যাত্রাদলে অভিনয় করিয়া কতকগুলি পাকাপাকা কথা শিখিয়া রাখিয়াছে, যথাস্থানে, যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহা সে প্রয়োগ করে। মা নিতান্তই মা, তাই উহার মা-ডাক শুনিয়া গলিয়া গিয়াছে। মা আবার বলে, বুদ্ধদেবের মত সুন্দর! সুন্দর নয় বলিয়াই মা হয়ত বাড়াবাড়ি করিয়া বলে ঐ সব। যাক্—সুন্দর হোক আর কুৎসিৎ হোক, তপতীর কিছুই আসে যায় না।

তপতী গিয়া গম্ভীরমুখে খাইতে বসিল।

শিখা কারুণ্য-কোমলকণ্ঠে ঘরে ঢুকিল—জানো না, অমন দাদা কারু হয় না মা। দাদা আশ্চর্য্য, দাদা অদ্ভুত। মানুষকে অমন করে ভালোবাস্‌তে আর কাউকে দেখিনি! কিন্তু মা, আমায় এখুনি হাঁসপাতাল-যেতে হবে।

—কেন? কার অসুখ?—মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন!

অসুখ একটা কেরাণীর; তার গায়ে রক্ত নাই, দাদা তাই তাকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচাবে। কারু কথা শুনলো না মা, আমরা এতো বারণ ক'র্লাম—ব'ললাম, অন্য একটা লোককে তো কিছু টাকা দিলেই সে রক্ত দিতে পারে। তা বল্লে, তার রক্তটাও তার বোন্‌দের কাছে এমনি দামী, বুঝেছিস্! কি বলবো আর!

মা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তপন কোন একটা অজ্ঞাত কেরাণীর

জন্য নিজের দেহের রক্ত দান করিবে! ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—না-না শিখা, ওকে বারণ কর তোরা।

—ও শুনবে না মা, কারু কথা শুনবে না। আর যুক্তি দিয়ে ওকে হারাতে পারবে না কেউ। ওর বন্ধু বিনুবাবু সকাল থেকে সে চেষ্টা ক'র্‌ছেন। আমায় খানিকটা গরম দুধ আর কিছু লেবুর রস করে দাও শীগ্‌গীর।

নিরুপায় মাতা লেবুর রস তৈরী করিতে করিতে বলিলেন,—ওর শ্বশুরবাড়ীর কেউ জানে না?

—না, ওঁদের জানাবে না—তুমি জানিয়ে দিও না যেন।

বেলা এগারটার সময় শিখা ও বিনায়ক তপনকে লইয়া ফিরিল। শিখা তাহার নিজের শয়নকক্ষে তপনকে শোয়াইয়া দিল; বিনায়ক তপতীর মা'কে 'ফোন' করিয়া জানাইয়া দিল, তপনবাবু আজ দুপুরে অন্যত্র খাইবেন—তাঁহারা যেন অপেক্ষা না করেন।

শিখার মা আসিয়া অনুযোগ করিলেন,—একি বাবা, নিজের রক্ত কেন তুমি দিতে গেলে?

—দিলাম তো কি হোল মা, আমি তো আপনার সুস্থ সবল ছেলে।

—কিন্তু বাবা, তোমার জীবন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

—সে লোকটির জীবন কিছু কম মূল্যবান নয় মা। তারও মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, সেই একমাত্র উপার্জ্জনকারী তাদের।

মা চুপ করিয়াই রহিলেন! তপন আর একটু দুধ খাইয়া বলিল, —কিছু ভয় নেই বোনটি, ওবেলাই সেরে উঠবো, ঘুমুই একটু! শিখা বসিয়া বসিয়া হাওয়া করিতেছিল। চোখ দু'টি জলে ছলছল করিতেছে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তপন বলিল,—কি হোলরে? কাঁদছিস্?

—ভালো লাগছে না দাদা, তুমি রক্ত দিয়ে দিয়ে বেড়াবে নাকি?

—একা আমার রক্তে কি হবে শিখা, তবে এই আত্মসুখসর্ব্বস্ব, ক্লীব পশুর জাতটাকে রক্ত দিয়ে বাঁচাতে হবে; নইলে আর্য্যগৌরব বুঝি-বা ডুবলো।

তপন পাশ ফিরিয়া শুইল। বিনায়ক ইসারায় শিখাকে নিষেধ করিল আর কথা বলিতে।

স্নেহের যে সামান্য সূত্রটুকু ধরিয়া তপনের অন্তরে তপতী প্রবেশ করিতে পারিত, তপতীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষক মনের উষ্ণ চিন্তাধারায় তাহা পুড়িয়া গেল। তপনকে সে একটা অর্থশোষণকারী পরভৃতিক ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিতেছে না। এক একবার মনে হইতেছে, হয়ত উহার মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যাহাতে তার মা-বাবা এতটা মুগ্ধ হইতেছেন, আবার মনে হইতেছে, ইহা ঐ সুচতুর লোকটির সু-অভিনয়ের গুণ। তপতী উহাকে কঠোর পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল!

সেদিন টক্‌টকে লাল শাড়ীখানা পরিয়া তপতী বাহির হইয়া আসিল, যেন অগ্নিশিখা। মা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেড়াতে যাবি নাকি!

—না, মিঃ অভিনব বোস ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছি চা'য়ে। কিন্তু মা, ফুল আনা হয়নি। দাওনা ফোন করে তোমার জামাইকে, ফুল কিনে আনবে।

মা তাঁহার খুকীর দুরভিসন্ধি কিছুমাত্র অবগত নহেন। হাসিয়া বলিলেন,—নিজে ব'লতে পার না? লাজুক মেয়ে!

—নিজের জন্য তো নয় মা, একজন অতিথির জন্য, তাই লজ্জা ক'র্‌ছে!

মা বিশেষ কিছু বুঝিলেন না, ফোন করিয়া দিলেন তপনকে।

বিজয়িনীর আনন্দে তপতী ভাবিতে লাগিল, বোকা মা কিছুই বুঝিলেন না যে তাঁহাকে দিয়াই তাঁহার স্নেহপাত্রকে কেমন করিয়া তপতী অপমান করিল। ফুলগুলি লইয়া যখন সে আসিবে, তখন তাহার সম্মুখেই মিঃ বোসকে তপতী তাহারই আনা ফুল উপহার দিবে। তপতী সাজিয়া-গুজিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ বোস আসিয়া পৌছিলেন অথচ ফুল এখনো আসিল না, তপতী অত্যন্ত চটিয়া বিরক্ত মুখে মিঃ বোসকে চা পরিবেশন করিতেছে দোতলার বারান্দায়। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় তপন কাগজে মোড়া একগোছা ফুল লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, দেখিয়া তপতী ত্বরিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল,—বড্ড দেরী হোল,—দিন,—সে হাত বাড়াইল ফুলগুলি লইবার জন্য। কাছেই একটা ছোট টিপয় ছিল, তপন নীরবে ফুলের গোছাটা সেই টিপয়ের উপর রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে, রাগে তপতীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, সরোষে গর্জ্জন করিয়া সে কহিল,—হাতে দিতে পারেন না!—একে তো আনলেন দেরী করে!

তপন ফিরেও তাকাইল না, ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, মিঃ বোস জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে লোকটি?

—আমার মা'র পুষ্যি—তপতী সক্রোধে জবাব দিল। তপন কথাটা শুনিল তথাপি মুখ ফিরাইল না, চলিয়া গেল। তপতীর সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেছে। ফুলের তোড়াটা খুলিয়া লইয়া সে কাগজটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সবেগে আসিয়া ঢুকিল খাইবার ঘরে, যেখানে মা তপনকে খাবার দিতেছেন!—তোমার জামাই ফুল কিনে এনেছে দেখো, কতকগুলো খুচরো ফুল, বাসি, পচা—একটা বোকে বাঁধিয়ে আনতে পারে নি!

মা তাকাইয়া দেখিলেন, সুন্দর ফুলগুলি তপতীর হাতের আছাড় খাইয়া ম্লান হইয়া যাইতেছে। রাগিয়া বলিলেন,—বোকে আনতে তো তুই বলিসনি খুকী, আর ফুল তো খুবই টাট্‌কা।

—তোমার মাথা—এই ফুল নাকি বিলেত ফেরত লোককে দেওয়া যায়! বলিয়া তপতী সরোষে প্রস্থান করিল।

মা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—মেয়েটা বড্ড রাগী বাবা, তুমি দুঃখ করো না কিছু! ফুলগুলো তোমার ঘরেই দিয়ে আসছি।

জলতরঙ্গের মত সুমিষ্ট হাসিতে ঘর ভরাইয়া দিয়া তপন বলিল,—ঐ ফুলগুলো আপনার পায়ে দিই মা, আমার বয়ে আনা সার্থক হবে।

মা কি বলে শুনিবার জন্য তপতী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, তপনের কাণ্ড দেখিয়া সে শুধু বিস্মিত নয়, বিমূঢ় হইয়া গেল। এতবড় অপমানটা ও গায়েই মাখিল না! উহারই সামনে অন্য একজন পুরুষকে অন্যত্র বসাইয়া তপতী পরম যত্নে খাওয়াইতেছে, মা যার জন্য কত বকিলেন —বিলাতফেরৎ লোকের টেবিলে তপন বসিবে না বলিয়া তপতী রক্ষা পাইয়াছে। সেই অন্য পুরুষের জন্য নির্ব্বিকার চিত্তে তপন ফুল আনিয়া দেয়, সে-ফুল না লইয়া অপমান করিলে সেই ফুল দিয়াই অপমান-কারীর মা'র পূজা করে! এতবড় বিস্ময় তপতীর জীবনে আর ঘটে নাই। লোকটা হয় সাংঘাতিক ধূর্ত্ত, নয়তো সর্ব্বসহিষ্ণু সন্ন্যাসী।

ঠাকুরদার কথাটা তপতীর অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, "তোর যে বর হবে দিদি—তার আর যোড়া মিলিবে না" সত্যই, উহার যোড়া মিলিবে না। কিন্তু টাকা তাহা হইলে সে লইয়াছে কেন? দুই লক্ষ টাকা লইয়া সে কি করিবে? গরীবের ছেলে, দু'লাখ টাকা কৌশলে আদায় করিয়া লইল, আরো কিছু আদায়ের ফন্দিতে আছে, তাই এমন করিয়া অপমান সহ্য করে। ইহার পর আমরা তাড়াইয়া দিলেও যাহাতে ও সুখে থাকিতে পারে তাহারই যোগাড়ে ফিরিতেছে।

তপতীর ক্রোধ কমিতে গিয়া পরবর্ত্তী চিন্তায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কত অপমান ও সহ্য করিতে পারে তপতী তাহা দেখিয়া লইবে, শেষ অবধি

'প্রহারেন ধনঞ্জয়' করিয়া ঐ বেহায়া ইতর লোকটাকে তপতী তাড়াইয়া দিবে—স্থির করিল।

মিঃ বোসের সহিত চা খাইয়া তপতী বেড়াইতে চলিয়া গেল মিঃ বোসের মোটরেই। তপন কোনদিনই তপতীর সাহিত বেড়াইতে যায় না, বৈকালিক জলযোগের পর সে আবার বাড়ী তৈরীর কাজ দেখিতে যায় বা একাই বেড়াইতে যায়। তপতী নিত্যই তাহার বন্ধুদের সহিত টেনিস খেলে কিম্বা বেড়াইতে যায়। কিন্তু মিঃ বোসের সহিত আজ একা বেড়াইতে যাওয়াটা মা পছন্দ করিলেন না : মিঃ বোস বা তপনের সাক্ষাতে তিনি কিছু না বলিলেও ঠিক করিয়া রাখিলেন, ফিরিলে তপতীকে তিনি ভৎ´সনা করিবেন এবং যাহাতে আর না যায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

মিঃ বোসের পাশে বসিয়া গাড়ীতে বায়ু সেবন করিতে করিতে তপতী ওদিকে ভাবিতেছে, ঐ লোকটাকে অপমান করিবার কত রকম ফন্দি বাহির করা যাইতে পারে।

মিঃ বোস বলিলেন,—কি ভাবছেন মিস্ চ্যাটার্জি ?

তপতী বলিল,—হুঁ !

—হুঁ কি ? এতো বেশী ভাব্ছেন যে কথাই শুনতে পাচ্ছেন না !

লজ্জিত হইয়া তপতী বলিল,—হাঁ ভাবছিলাম একটা কথা। চলুন, সিনেমায় যাওয়া যাক্ !

তৎক্ষণাৎ গাড়ী আসিয়া একটা বড় রকম সিনেমা-হাউসের গেটে ঢুকিল। উভয়ে নামিয়া টিকিট কিনিয়া ঢুকিল ভিতরে। অন্ধকার ঘরে বসিয়া ফন্দি আঁটিতে বেশ সুবিধা হইবে। তপতী নিঃশব্দে চেয়ারে বসিয়া আছে। মিঃ বোস কিন্তু সিনেমা দেখার চেয়ে তপতীর নয়নানন্দকর রূপ দেখার ও শ্রবণানন্দকর কথা শোনার বেশী পক্ষপাতী, কহিলেন, —সিনেমা বিস্তর দেখে এলাম। ছায়া, কায়া, দুই-ই, ছায়া আর দেখতে ইচ্ছা করে না।

—কায়াও তো বিস্তর দেখেছেন—সাদা, তুষার শুভ্র, তার প্রতি অরুচি জন্মালো না যে?

—জন্মেছে। তাই কাঞ্চনকান্তি দেখতে এলাম।

—এখানে তো সব তন্বীশ্যামা; কাঞ্চনকান্তি চান তো কান্যকুব্জে যান।

—সে আবার কোন্ দেশ? মিঃ বোস প্রশ্নের সঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

—জিওগ্রাফী দেখতে হবে, কারণ আমিও জানিনে।

—জেনে দরকার নেই—এখানেই পেয়েছি কাঞ্চনকান্তি!

—পাশেই বুঝি?

তপতী নিজের দিকেই ইঙ্গিত করিল! মিঃ বোসের স্বপ্ন কি তবে সত্য হইবে! তপতী, তপস্যার ধন তপতী! মিঃ বোস তপতীর একখানা হাত নিজের হাতে ধরিয়া বলিলেন,—রিয়েলি আই হ্যাড নো হোয়ার সিন সাচ্ এ বিউটিফুল গার্ল লাইক ইউ।

তপতী আপন ঠোঁটের সহিত ঠোঁট মিলাইয়া একটা মিষ্ট শব্দ করিয়া বলিল,—ও কথা অনেকের কাছেই শুনেছি!

—চির পুরাতনটাই চিরদিন সুন্দর মিস্ চ্যাটার্জি।

—তা নয়, চিরসুন্দরটাই চিরদিন পুরাতন। কারণ পুরাণো হ'লেও তা সুন্দর না হতে পারে কিন্তু সুন্দর হ'লেই তা আর পুরানো হয় না। যেমন এই পৃথিবী, ঐ আকাশ, ঐ সব গ্রহ-নক্ষত্র! ওরা পুরানো বলেই সুন্দর নয়, সুন্দর বলেই চির নূতন।

মিঃ বোস তাঁহার বিলাতি বিদ্যায় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন,—প্রেমের বাণী কি পুরানো নয়?

—প্রেমের বাণী সুন্দর বলেই পুরানো নয়—পুরানো হয় না।

—তা' হ'লে আমার কথাটাকে আপনি পুরানো ব'ললেন কেন?

—ওটা আপনার প্রেমের বাণী নাকি? ওতো রূপমুগ্ধ পুরুষচিত্তের একটা স্তাবকতা! প্রেমের বাণী অমন হয় না।

—কি রকম হয় তা'হলে ?

—তা জানিনে, আজো শুনিনি কারো কাছে।

সিনেমা শেষ হইয়া গিয়াছে। তপতী পুনরায় বলিল,—সময়টা গল্পেই কাটলো, কিছুই দেখলাম না।

—কাল আবার আসবেন ?

—দেখা যাবে—বলিয়া তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

বাড়ী ফিরিতেই মা তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্পমত তপতীকে বকিতে গিয়া দেখিলেন,—কাপড় না ছাড়িয়া তপতী বিছানায় বসিয়া আছে, দু'টি চোখে তাহার জল টলমল করিতেছে।

মা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হোল মা, খুকু ?

—"জানিনে—যাও"—বলিয়া তপতী শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিস্মিতা, বেদনাহতা মা অনেকক্ষণ তপতীর মাথায় হাত বুলাইয়া আবার ডাকিলেন,—কি হ'য়েছে মণি—আমায় ব'লতে তোর লজ্জা কি-রে ?

—কিছু না মা, ঠাকুরদার কথা মনে পড়ছিল। বুড়ো আমায় বড্ডো ঠকিয়ে গেছে !

—ছিঃ মণি, স্বর্গগত মহাপুরুষের নামে ও কথা বলতে নেই। কি হোল কি ?

তপতী খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছে। উঠিতে উঠিতে বলিল,—তোমার শ্বশুর তোমার কাছে মহাপুরুষ, আমার ঠাকুরদা, যা খুসী বলবো ওকে।

উঠিয়া তপতী কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল। মা বলিয়া আসিলেন—কাপড় ছেড়েই খেতে আয়, রাত হয়ে গেছে মা !

তপতী কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ভাবিতে লাগিল—ঠাকুরদা বলিতেন, তপতীর স্বামী হইবে অদ্বিতীয় প্রেমিক, অদ্বিতীয় মানুষ, যাহার জন্য তপতী

সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও আজো নিজেকে অনাঘ্রাতা রাখিয়াছে। সে কি ঐ ধূর্ত্ত অর্থলোভীটার জন্য! জ্যোতিষ কোনদিন সত্য হয় না!

মানুষের মন এমনভাবে গঠিত যে নিজের সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে সে ভয় পায়! মনের অজ্ঞাতসারে সে এড়াইয়া যায় তাহার দুষ্কর্মগুলির অপরাধ অথবা আপনার দুর্ব্বলতা দিয়া সে সমর্থন করে তার কৃতকর্মকে। তপতী যদি তপনের প্রতি তাহার কৃত ব্যবহারের কথা একবারও ভাবিত তাহা হইলেই হয়ত বুঝিতে পারিত, দোষটা সবই তপনের নয়। অত্যাধুনিক হইতে গিয়া সে তাহার পূর্ব্ব সংস্কৃতিকে তাহার চেতনা হইতে হারাইয়া ফেলিয়াছে, আর তাহার অবচেতন মনে জাগিয়া রহিয়াছে বংশ-পরম্পরায় লব্ধ সংস্কার। এই দুই পরস্পরবিরোধী সংস্কারের সংঘাতে তপতী নিজের অজ্ঞাতসারেই হইয়া উঠিল উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল। তপনের মধ্যেও যে কিছুমাত্র ভাল থাকিতে পারে, ইহা যেন সে ভাবিতেও চাহে না। ভাল কিছু না থাকিলেও সে যেন খুসী হয়। মা-বাবা উহাঁকে এত ভালবাসেন, তপতী যেন ঈর্ষায় জলিয়া যায়। উহাকে ভালোবাসিবার কোন কারণ নাই। বার কতক মা-মা বলিয়া ডাকিলে আর যাত্রাদলের মার্কা দেওয়া বাহবা-পাওয়া বুলি আওড়াইলেই কাহারও ভালবাসা পাইবার যোগ্যতা জন্মে না। উহার আলাপ করিবার সঙ্গী একমাত্র মা—তা, মার সহিত কিই বা কথা ও কয়? কথা কহিবার আছেই বা কি? যদি বা থাকে, বাড়ীতে তো সে সব মিলাইয়া আট ঘণ্টার বেশী থাকে না, এমন কি রবিবারেও না। তার মধ্যে ছয় ঘণ্টা ঘুম।

টাকাটা লইয়া কি যে করিল, কেহ জানিতে পর্য্যন্ত পারিল না। ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছে, আর কি! কাল বাবা মা'কে বলিলেন—'টাকা নিয়ে কি

ক'র্ছে জানতে চেও না, মদভাঙ ও খায় না'। মদভাঙ না-খাওয়া ছাড়া টাকা খরচ করিবার যেন আর পন্থা নাই? আর খরচই বা করিবে কেন? ভবিষ্যতের জন্য জমা করিতেছে। ও তো নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছে, তপতী উহাকে তাড়াইয়া দিবে। তাই যতদূর সম্ভব সাবধানে কাজ গুছাইতেছে।

তপতী ক্লান্তি অনুভব করিতেছে। এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি সে আর কতদিন ভোগ করিবে! উহাকে তাড়াইয়া দিলেই তো সব লেঠা চুকিয়া যায় কিন্তু তাড়াইবার উপায় বাহির করা সহজ নহে।

তপন খাইতে বসিয়াছে। কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য তপতীও গিয়া খাইতে বসিল। তপন মুখ নত করিয়া বসিয়াছে। মা জানেন, এখনো তপনের লজ্জা ভাঙে নাই, বলিলেন,—তুই একটু পরে খাবি খুকী!

—কেন! আমি তোমার ছেলের কেড়ে খেতে যাবো না। খিদে পেয়েছে আমার!

সন্তান ক্ষুধা পাইয়াছে বলিলে কোন মাতা আর স্থির থাকিতে পারেন না, তথাপি মা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তপতী চাপিয়া বসিল—না খাইয়া যাইবে না। অগত্যা মা তাহাকে খাবার দিলেন।

তপন খাইতে খাইতে বলিল,—ওবেলা জল খেতে আসবো না মা!

—কেন বাবা! কোথায় যাবে?—মা প্রশ্ন করিলেন।

—আমার সেই ছোট বোনটির বাড়ী—তাকে নিয়ে আজ সিনেমা যেতে হবে।

মা এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—খুকীকেও নিয়ে যাবে বাবা;—খুকী প্রতিবাদ না করিয়া বসিয়া রহিল।

তপন বলিল,—তা কি ক'রে হবে মা? আমার বোনের বাড়ী আপনার খুকী কি ক'রে যাবে! কুটুম্বের বাড়ী তো বিনা নিমন্ত্রণে যায় না কেউ।

মাতা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—হাঁ বাবা, ও কথা আমার মনেই হয় নি। কোন্ সিনেমায় যাবে? যাবার পথে হ'লে তুলে নিও ওকে!

—আমি ট্রামে যাবো মা, আর যাবো ওপাড়ার দিকে; এ পথে মোটেই পড়বে না।

তপন চলিয়া গেল। তপতী খাইয়া উঠিয়া খবরের কাগজ খুলিয়া দেখিল, জ্যোতি গোস্বামী নামক জনৈক লেখকের লেখা একখানা বই ওখানে আজই প্রথম আরম্ভ হইবে। সেও স্থির করিল, ঐ সিনেমায় যাইবে।

বিকালে তিন চারজন বন্ধু-বান্ধবী লইয়া তপতী আসিয়া দেখিল 'হাউসফুল'। টিকিট না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় মিঃ ব্যানার্জি চ্যাচাইয়া উঠিলেন,—তপনবাবু!

তপন মুখ তুলিয়া তাকাইল,—কিছু ব'লছেন?

তপতী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তপনের পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে। তপতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ঈর্ষায়, হয়তো বা ইতরতায়!

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—আমরা টিকিট পাচ্ছি না; আপনার কেনা হ'য়েছে?

তপন জিজ্ঞাসা করিল,—ক'জন আছেন আপনারা?

—পাঁচজন—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তপন বলিল, —এক মিনিট দাঁড়ান, দেখ্ছি।

সকলেই উঁহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তপন সেই মেয়েটির হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। মিনিট দুই পরে একজন সুদর্শন যুবক আসিয়া বলিল,—আসুন আপনারা।

—টিকিট পেয়েছেন?

—হাঁ।

তাহাদের সকলকে লইয়া গিয়া বক্সে বসাইয়া দিল বিনায়ক।

তপতীদের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তপন কেমন করিয়া টিকিট কিনিতে পারিল? বোধ হয় ঘুষ দিয়া তপতীর সম্মান রক্ষা করিয়া থাকিবে। টাকা তো তাহারই বাবার, কিন্তু সে নিজে বসিল কোথায়? নিজেদের টিকিটগুলিই উহাদিগকে দিয়াছে নাকি? চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অন্বেষণ করিয়াও তপন কিম্বা সেই মেয়েটির কোন সন্ধান মিলিল না। তপতীর ভয়ে মেয়েটাকে লইয়া পলাইয়া গেল নাকি!

মিঃ ব্যানার্জি তপতীকে বলিলেন,—তপনবাবুকে দেখছি না! পালিয়েছে নিশ্চয়!

তপতী শুধু বলিল,—হুঁ!

সিনেমা আরম্ভ হইল। একটি নারী-জীবনের বেদনার ইতিহাস। স্বামীবঞ্চিতা ঐ দুর্ভাগিনী নারী স্বামী আসিবে ভাবিয়া নিত্য ফুলশয্যা রচনা করে, অঙ্গনে আলিপনা দেয়, পথের দুর্ব্বাকে চুম্বন করিয়া বলে,—আমার প্রিয়তম যেদিন আসিবে তোমার কোমল বুকে চরণ ফেলিয়া, সেদিন, হে শ্যামল দূর্ব্বাদল, তোমায় আমি শত চুম্বন দান করিব। তথাপি তাহার প্রিয় আসিল না, আসিল তাহার বাণী :—"প্রিয়া, তোমার আমার মাঝখানে চোখের জলের নদীটী যুক্ত রইল। তোমার আমার মাথার একই আকাশ সেই জলে প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে, তুমি এসেছো, শুধু চোখের জলটুকুর ব্যবধান। ঐটুকু থাক—তোমায় পরিপূর্ণ ক'রে পেয়ে ফুরোতে চাইনে—তুমি থাকো না-পাওয়ার আলোকে অফুরন্ত আশা হ'য়ে আমার মনের গহন গভীরে।"

তপতী বিমুগ্ধ চিত্তে দেখিল। তাহার রসগ্রাহী মন স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—কে এই রূপদক্ষ কবি?

প্রশ্নটার কেহই উত্তর দিতে পারিল না, কারণ চিত্রলিপিতে লেখকের কোন পরিচয় নাই। কেন যে এই অদ্ভুত নাট্যকার নিজেকে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন করিলেন, তপতী ভাবিয়া পাইল না।

বাড়ী ফিরিয়াই সে তপনের ঘরের দিকে চাহিল, তপন তখনো ফেরে নাই। কোথায় গিয়াছে সেই মেয়েটাকে লইয়া? খাইতে খাইতে সে ভাবিতে লাগিল সিনেমার কথা।

তপন আসিয়া বাহির হইতে বলিল,—খেয়ে এসেছি মা, আর কিছু খাব না।

তপতীর রাগ আরো বাড়িয়া গেল। ওখানে রাত্রির খাওয়া পর্য্যন্ত খাওয়া হয়! তপন চলিয়া গেলে তপতী জিজ্ঞাসা করিল,—ওর কি রকম বোন মা, মা'র পেটের না পাতানো!

—না রে খুড়তুতো! মেয়েটা নাকি ছেলে বেলা থেকে ওর খুব নেওটা।

ওঃ! তপতী ঠোটের আগায় একটা বিদ্রূপধ্বনি তুলিয়া চলিয়া গেল আপনার ঘরে।

তপতীর জীবন যেরূপভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আধুনিক সমাজের কোন ছেলের পক্ষে তাহার মন জয় করা সহজ নয়, আবার প্রাচীন সমাজের পক্ষপাতী কাহারো পক্ষে তপতীকে মুগ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন। প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কারের সঞ্চয়ন হইয়াছে তাহার জীবনে, কিন্তু সমন্বয় হয় নাই। তাহার ঠাকুরদার শিক্ষাপদ্ধতি ছিল একদেশদর্শী, প্রাচীন—আবার তাহার পিতার শিক্ষাপদ্ধতি একান্তভাবে আধুনিক। দুইটি শিক্ষাকে একত্র মিলাইবার ক্ষীণ চেষ্টা করিতেছেন তপতীর মাতা কিন্তু প্রগতিবাদের উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে তাঁহার বাঁধ বাঁধাইবার দুর্ব্বল প্রচেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছে। যেটুকু তিনি করিয়াছেন; তাহার ফল হইয়াছে বাধা-প্রাপ্ত জলস্রোতের মত আরো উদ্দাম। চিন্তার সমুদ্রে তপতী আছাড় খাইয়াছে এ কয়দিন। তপনকে নানা ভাবে অপমান করিয়া তাড়াইয়া

দেবার কল্পনা করিয়াছে; আবার ভাবিয়াছে, তাড়াইয়া কাজ নাই, তপন তো তপতীর কোন ক্ষতি করে না।

কিন্তু সেদিন সিনেমায় একজন সুন্দরী নারীর সহিত তপনকে দেখার পর হইতে তপতীর মনে আগুনের জালা ধরিয়া গিয়াছে। ঐ মেয়েটা উহার আপন বোন নয়, হয়তো কেহই নয়, মিথ্যা করিয়া বোন বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। না হোক, তপতী তার জন্য ঈর্ষা করিবে না, ঈর্ষা করিবার কারণও নাই। তপন যে-চুলায় খুসী যাইতে পারে কিন্তু তপতী নিজের বাড়ীতে বসিয়া তাহার পিতার জনৈক অন্নদাসের নিকট এ অপমান সহ্য করিবে না। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য সে তপনকে সাংঘাতিক অপমান করিবার সংকল্প করিল।

কি মতলবে যে সে এখনো এখানে বাস করিতেছে তাহা বোঝা তপতীর বুদ্ধির বাহিরে, কিন্তু মতলব উহার যে একটা ভয়ানক কিছু রহিয়াছে তাহা তপতী বুঝিতে পারিতেছে। টাকা সে লইয়াছে, এবার তো অনায়াসে সরিয়া পড়িতে পারে! কিন্তু আরো টাকা আদায় করিবার জন্যই সে আছে নিশ্চয়, অথবা ধীরে ধীরে তপতীর মনকে জয় করিতে চায় সে? সে মতলব যদি উহার থাকে তবে তপতী যেমন করিয়াই হোক্ উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিবে। তপতীর সংকল্প স্থির হইয়া গেল। সে আসিয়া ফোন্ করিল মিঃ বোসকে। তাহার সহিত তপতী বেড়াইতে যাইবে আজ। মিঃ বোস কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসিলেন; সুসজ্জিত তপতী তাঁহাকে নীচের তলায় অভ্যর্থনা করিল; ইচ্ছাটা, তপন এখনি জলযোগের জন্য বাড়ী ফিরিয়া তপতীকে মিঃ বোসের সহিত একাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আর একবার অপমানিত হইবে। কিন্তু অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরও তপন আসিল না দেখিয়া তপতী ও মিঃ বোস বাহিরে চলিয়া গেল মিঃ বোসেরই গাড়ীতে।

রাত্রি প্রায় দশটায় তপতী স্বয়ং মিঃ বোসের গাড়ী চালাইয়া বাড়ী

ফিরিতেছে, মিঃ বোসও পাশে বসিয়া আছেন—তপতী দেখিল গেটের নিকট দারয়ানগুলোর সঙ্গে তপন কি কথা বলিতেছে। গাড়ীর হর্ণ না দিয়াই তপতী চলিয়া যাইবে কিন্তু তপন পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিতে পাইল না। মিঃ বোস তপনকে উদ্দেশ করিয়া ধমক দিলেন, —রাস্তায় দাঁড়ান্ কেন? 'ইডিয়ট'!

তপন বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিল এবং তৎক্ষণাৎ পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে এভাবে অপমানিত হইতে দেখিয়া দারোয়ানগুলো পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তপতী গাড়ীটা চালাইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল,—ইডিয়ট্ মানেই ও জানে না মিঃ বোস—অনর্থক গলা ফাটাচ্ছেন!

তপন নীরবে, নতমুখে প্রায় পাঁচ সাত মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল সেইখানেই স্থানুবৎ। চলৎশক্তি তাহার যেন থামিয়া গিয়াছে। তপতী মিঃ বোসকে এক কাপ কোকো পান করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভিতরে লইয়া গেল,—তপন তাহাও দেখিল, তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া উপরে উঠিল ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহভার বহন করিয়া।

তপতী মিঃ বোসকে কোকো খাওয়াইয়া বিদায় করিল। মা'র কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন,—তপন এখনো এলো না কেনরে, জানিস?

—এসেছে তো।—বলিয়া তপতী মার পানে চাহিল হাসি মুখে।

মা ভাবিলেন, হয়ত উহারা একসঙ্গেই বেড়াইতে গিয়াছিল। তিনি তপনের দরজায় আসিয়া ডাকিলেন,—এসো বাবা, খাবে এসো!

—আজ কিছু খাবো না মা—লক্ষ্মী মা, আপনি জেদ করবেন না, বড্ড ক্লান্তি লাগছে—শুয়ে পড়ছি!—তপন উত্তর দিল।

—সে কি বাবা? একটু দুধ মিষ্টি!—মা অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে কহিলেন।

—না মা, না—আজ কিছু না—আমায় শুতে দিন একটু ! তপনের স্বর এত করুণ যে মা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তপতীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঝগড়া-টগড়া কিছু করিছিস খুকী ?

—আমার অত দায় পড়েনি ! আমি খেয়ে এসেছি 'ফারপো'তে। আজ আর খাব না কিছু—বলিয়া তপতী চলিয়া গেল।

মা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলেন। শেষে তিনি নিজের মনকে বুঝাইলেন, হয়তো তপনও কিছু খাইয়া থাকিবে। আজ তাহার 'সাবিত্রী ব্রত' বলিয়া সারাদিন তপন উপবাসী আছে, রাত্রে, ফল মিষ্টি খাইবে ভাবিয়া মা সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু খুকী হয়তো দোকানেই কিছু ফল মিষ্টি খাওয়াইয়াছে—না হইলে খুকী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত !

তপতী এতক্ষণ ভাবিতেছিল—আজ সে তপনকে চরম অপমান করাইয়াছে। ইহার পরও যদি সে এ বাড়ী না ছাড়ে তবে তপতী আর কি করিতে পারে ! মিঃ বোস অবশ্য জানেন না যে তপনের সঙ্গে এ বাড়ীর সম্পর্ক কি ; তিনি উহাকে একজন পোষ্য মনে করিয়া এবং তপতী উহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না জানিয়া তপতীর প্রীত্যর্থেই উহাকে 'ইডিয়ট্' বলিয়াছেন। তপতী বেশ কৌশলেই মিঃ বোসকে দিয়া তপনকে অপমানটা করাইয়া লইল। অন্য কেহ, যাহারা তপনের সহিত এ বাড়ীর সম্বন্ধ অবগত আছে, তাহারা সাহস করিত না। তপন নিশ্চয়ই ইহার পর চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তপনের সহিত মা'র কথাগুলি তপতী শুনিয়াছে। লোকটা খাইল না কেন ! তপতীর এবং মিঃ বোসের কৃত অপমানের প্রতিকারের জন্য সে অনশন আরম্ভ করিল নাকি ! আশ্চর্য্য নয়। তপন যে আজ সমস্ত দিনই খায় নাই, তপতী সে-সংবাদ অবগত নয়। তপন অনশন আরম্ভ করিয়াছে, অন্ততঃ আজ রাত্রে কিছু না খাইয়া তপতীকে বুঝাইয়া

দিতে চায় যে সে অপমানিত হইয়াছে। ঐ ভণ্ড প্রবঞ্চক মনে করিয়াছে ; তপতী ইহাতে ভয় পাইয়া যাইবে। না, তপতী ভয় পাইবে না। কাল সকালে যদি সে মা-বাবার নিকট সব কথা প্রকাশ করে তাহাতেও তপতীর ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। বরং সে ভালই হইবে। মা ও বাবাকে তপতী উহার স্বরূপটা চিনাইয়া দিবে।

অনেক্ষণ ভাবিয়া তপতীর মনে হইল,—মিঃ বোস যখন জানিবেন, তপতীর সহিত ঐ লোকটির সম্বন্ধ কি, তখন তপতীকে তিনি কি মনে করিবেন? ভালই মনে করিবেন। একান্ত অনুপযুক্ত ভাবিয়া তপতী উহাকে অপমান করাইয়াছে। কিন্তু মা-বাবা যদি খুব বেশী চটিয়া যান! মা তো নিশ্চই চটিয়া যাইবেন। আজই যদি তপন বলিয়া দিত, কি কারণে সে খাইল না, তা হইলে মা হয়ত এখনি একটা অনর্থ ঘটাইতেন! কিন্তু কেন সে কিছুই বলিল না? এখনো কি এই বাড়ীতে থাকিবার ইচ্ছা সে পোষণ করে! নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে তপতীর ভাল নিদ্রা হইল না।

সমস্ত রাত্রি আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তপন সকালে স্নান করিয়া পূজায় বসিল। দারুণ অপমানে মনটা তাহার বিকল হইয়া গিয়াছে, ধ্যানে মনঃসংযোগ হইতেছিল না। অনেক—অনেকক্ষণ পরে পূজা শেষ করিয়া সে উঠিল এবং বাহিরে যাইবার বেশ না-পরিয়াই দরজা খুলিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল, তপতী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে স্নানসিক্ত চুল-গুলি পিঠে ছড়াইয়া। তপনের ঘরের এত কাছে তপতী কোনদিন আসে নাই। তপন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদি তপতী কিছু বলে। আশা এবং উদ্বেগে তাহার অন্তর আন্দোলিত হইতেছে।

—দেখুন মশাই—তপতী সরোষে কহিল,—এ বাড়ীতে থেকে ওসব 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ফাইক' করা চ'লবে না। ওসব ক'রতে হলে যেখানকার মানুষ, সেখানে যান।

তপন দুই মুহূর্ত্ত বিমূঢ় হইয়া রহিল, তারপর কিছু না বলিয়াই খাইবার জন্য মা'র কাছে চলিয়া গেল। তাহার কথাটাকে এভাবে অগ্রাহ্য করার জন্য তপতীর মন উত্তপ্ত লৌহের মত অগ্নিময় হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তপনকে খাইবার ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া সে ভাবিল, হয় সে সেখানে গিয়া মা'কে সব কথা বলিবে, না হয় নির্ব্বিবাদে খাইবে। কি করে, দেখিবার জন্য তপতীও তৎক্ষণাৎ খাইবার ঘরে আসিল। তপন মুখ নামাইয়া একটা চেয়ারে বসিতেই মা বলিলেন,—এসো বাবা, কাল সারাদিনরাত উপোস আছ।

—দিন মা, এবার খেতে দিন কিছু ফল মিষ্টি—তপন নির্লিপ্তের মত জবাব দিল!

মা তাঁহাকে ফল মিষ্টি আগাইয়া দিতে দিতে সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন,

—সাবিত্রী ব্রত তো মেয়েরা করে বাবা, তুমি কেন করছো?

—ব্রতটা আমার মা ক'রতেন. উদ্‌যাপনের আগেই তিনি স্বর্গে যান মা, তাই আমি শেষ করে দিচ্ছি। শাস্ত্রে এ রকম বিধান আছে!

—ও! আজো ভাত খাবে না বাবা?

—না মা—ফল জল খাবো—ভাত খাবো কাল!

তপতী বসিয়া চা খাইতেছিল। তপনের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। অপমানিত হইয়া সে তবে অনশন করে নাই, তাহার ব্রত পালনের জন্যই করিয়াছে! কিন্তু গত রাত্রে নিশ্চয় কিছু খাইবে বলিয়াছিল, না হইলে মা তাহাকে ডাকিতে যাইবে কেন? রাত্রের না-খাওয়াটা নিশ্চয় তপতী ও মিঃ বোসের উপর রাগ করিয়া। কিন্তু মা'কে তো কথাটা সে বলিয়া দিতে পারিত! না-বলার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যে গভীরতম

উদ্দেশ্য,—টাকা আদায় করিবার মতলব, তাহা হাসিল করিতে হইলে তপতীকে চটানো চলে না, এ বাড়ী ছাড়া চলে না, মা বাবাকে বলা চলে না যে তপতী তাহাকে গ্রহণ করিবে না! ভাল, তপতী নিজেই মা ও বাবাকে জানাইবে—ঐ অর্থলোভী মতলবাজ গণ্ডমূর্খটাকে তপতী কোন দিন স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

এখনি তপতী সে-কাজটা করিতে পারিত কিন্তু লোকটা কাল থেকে উপবাসী আছে, এখনি একটা হাঙ্গামা করিবার ইচ্ছা সে কষ্টেই দমন করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল!

—আচ্ছা দাদা, তুমি তো এবার নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রতে পারো!

—না, শিখা, নেতার কাজ অত সহজ নয়। মনে ক'রলেই নেতা হওয়া যায় না।

—তা হলে নেতার লক্ষণ কি দাদা, কি দেখে তাঁকে চিনবো?

—নেতার ডাক হবে দুর্ব্বার—ইরিজিষ্টিবিল্। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে ব্রজগোপীরা যেমন কুল-মান বিসর্জন দিয়ে ছুটে যেতো, নেতার ডাক হবে তেমনি।

—কোথায় সে নেতা পাবো দাদা?

—সেজন্য চিন্তা নেই বোনটি—যেদিন তোরা মানুষ হবি, সেদিন নেতাও আসবেন। মানুষের নীতিকে আজ যারা পদদলিত ক'রছে, স্বেচ্ছাচারিতায় আজ যারা বনের পশুকেও হারিয়ে দিচ্ছে, তাদের জন্য পাশব-শক্তির আবির্ভাব পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু বহু যুগ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেও পশ্বেতর প্রাণী এই মানব আজো পশুধর্ম্ম ছাড়তে পারলো না। এই পশুধর্ম্মকে যিনি জয় করতে পারবেন, তিনি হবেন সেই নেতা!

—পশুধর্ম্ম একেবারে কি করে ছাড়া যায় দাদা—মানুষ তো পশুও!

—না শিখা, বরং "প্রাণীও" বলতে পারিস। প্রাণধর্ম্ম তো তাকে বিসর্জন দিতে বলা হচ্ছে না। প্রাণকে মহান ক'রতে, বিশাল ক'রতে বলা হচ্ছে। শিখা, আমি কতকগুলো কঠোর নিয়ম পালন করি ; দেখে হয়তো তোরা ভাবিস—দাদা তোদের গোঁড়া। কিন্তু ভেবে দেখেছিস্ কি —পশুর কোন বাঁধা-ধরা নীতি নেই। উদর পালনের প্রয়োজনই তার নীতি। তা'ছাড়া অন্য নীতি যদি কেউ পালন করতে পারে তো সে মানুষ। "সত্য কথা নিশ্চয় বলবো," এই প্রতিজ্ঞা মানুষই করতে পারে। "হিংসা করবো না"—এ নীতি মানুষেরই পালনীয়। ঈশ্বর বলে কেউ থাকুন আর নাই থাকুন—প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি দিয়েছেন,—যে কল্যাণকরী বুদ্ধিটুকু দিয়েছেন, মানুষ কেন তাকে ব্যবহার করবে না, বলতে পারিস ?

শিখা অনেক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিনায়ক আসিয়া বলিল, --তোমাদের ভাই-বোনের গল্প তো আর শেষ হবে না, এদিকে রান্নাকরা খাদ্য সব ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে, আর পেটের ক্ষিদে গরম হ'য়ে উঠছে।

শিখার দুটি চোখ দরদে ভরিয়া উঠিল, বলিল,—ওঃ! এতো খিদে পেয়েছে আপনার ? তা ডাকলেই পারতেন আমাদের ! চলুন, চলুন !

তপন হাসিয়া বলিল,—না কহিতে ব্যথাটুকু পারো না বুঝিতে ?

—যাও—বলিয়া শিখা প্রায় ছুটিয়াই পলাইতেছে, তপন তাহার বেণীটা ধরিয়া আটকাইয়া ফেলিল, তারপর বলিল,—মিতা পাতিয়েছিস যে,—কি রকম মিতা তা'হলে ! খিদের সময় বুঝতে পারিস্ নে ?

—আমি দাদারই খিদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম, তা মিতা !

—তা হলে ওকে আর এক ডিগ্রি প্রমোশন দে ভাই শিখা ! ও খিদে মোটেই সইতে পারে না !

—মানে ? কোন্ ক্লাশে প্রমোশন ?

—মিতার উপরের ক্লাসে ?

শিখা হাসিতে গিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, বিনায়ক হাসি চাপিতে গিয়া অত্যধিক গম্ভীর হইয়া গেল এবং তপন ভাতের হাঁড়িটা লইয়া পাতায় ভাত পরিবেশন করিতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইলে শিখা বলিল,—তুমি দিল্লী কি জন্য যাবে দাদা? ক'দিন দেরী ক'রবে সেখানে?

—দিন দশ মাত্র। কি জন্য যাবো সেটা এখন নাই শুনলি ভাই?

—তুমি বড্ড কথা লুকিয়ে রাখ দাদা! শুনলাম তো কি হোল ক্ষতিটা!

—প্রকাশ করে ফেলতে পারিস্, সেটা আমি চাইনে। কাজে সিদ্ধিলাভ করে অন্যের মুখে সুযশ শোনা আমার শিক্ষা বোনটি! তবে জেনে রাখ—মিঃ আর মিসেস চ্যাটার্জির স্নেহঋণ শোধ করবার জন্যই যাচ্ছি!

শিখা আর অনুরোধ করিল না, কিন্তু মনটি তাহার অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিল। দেখিয়া তপন তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কহিল,—আমি নাই বা রইলাম রে, যার হাতে তোকে দিচ্ছি সে তোর অযোগ্য হবে না।

—কিন্তু সেদিনটিতে আমি তোমার আশীর্ব্বাদ পাবো না দাদা! আর কারো আশীর্ব্বাদে তৃপ্তি হবে না আমার।

—আশীর্ব্বাদ আজও করছি, আবার ফিরে এসেও ক'রবো, আর যতকাল বাঁচবো ক'রবো! তোদের কল্যাণ-কামনাই যে আমার জীবনের ব্রত শিখা! এই বিশাল পৃথিবীতে তুই, মীরা আর বিনায়ক ছাড়া আত্মীয় বলতে তো আমার আর কেউ···

তপন থামিয়া গেল। অসহনীয় ব্যথায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সংযমী তপন আত্মসংবরণ করিল, কিন্তু শিখার নারীহৃদয় এ বেদনা সহিতে পারিল না, দরদর ধারায় তরল মুক্তাবিন্দু তাহার দুই গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল। বিনায়ক নীরবেই এই শোকাবহ দৃশ্য অন্যদিন দেখিয়াছে, আজো দেখিল নীরবেই।

আত্মসম্বরণ করিয়া শিখা বলিল,—তপতীর আশা কি তুমি তবে ছেড়েই দিয়েছো দাদা ?

—প্রায় ; কারণ, সে অন্য কাউকে ভালবাসে কি না আমি জানিনে, তবে আমায় সে গ্রহণ ক'রবে না, এটা বহুবার বহুপ্রকারেই জানিয়ে দিয়েছে !

—কিন্তু দাদা, তুমি সেখানে যে ভাবে থাকো, যে ছদ্মবেশে সে তোমায় দেখছে, তাতে তার মত একজন শিক্ষিতা তরুণীর পক্ষে তোমাকে স্বামী স্বীকার করা কঠিন তো ?

—আমি তো বলছিনে শিখা যে সহজ ! কঠিন নিশ্চয়ই, তবে সেটাও সম্ভব, যদি সে আজো অনন্যপরায়ণা থাকে। আছে কি না, জানবার জন্য আমি এত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছি। এত অপমান সহ্য করছি। আমি যদি আজ আত্মপ্রকাশ করি, তা'হলে তো নিশ্চয়ই সে আমায় গ্রহণ করবে কিন্তু তাতে সে পূর্ব্বে আর কাউকে ভালবেসেছে কি না, তা আর আমার জানা হবে না।

—তা যদি বেসেই থাকে দাদা, তাহলে কি তুমি ওকে গ্রহণ করবে না ?

—নিশ্চয় না ! আমার জীবনে অন্যাসক্তা নারীর ঠাঁই নেই। শিখা, আমি কোনো মানবীকে আমার সহধর্ম্মিণীর আসন দিতে চাই, যে মানবী শুধু দেহধর্ম্মিণী নয়। এর জন্য যদি শত জন্মও আমার একক জীবন কাটাতে হয়, সেও ভালো !

শিখা নীরবে তপনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—মিঃ বোসকে দিয়ে তোমায় অপমান করালো, এর পর তোমার আর কিসের সন্দেহ দাদা—ছেড়ে দাও ও-বাড়ী থাকা।

—দেরী আছে ভাই। মিঃ বোসকে দিয়ে আমায় অপমান করানোর অন্য কারণও থাকতে পারে, এমন কি, সে যে আজো নির্ম্মল আছে, হয়তো ঐটাই তার একটা বড়ো প্রমাণ !

—তা হলে আর কি পরীক্ষা তাকে করবে ?

—আমি কিছুই করবো না শিখা, যা-কিছু করবার সেই করবে! আমি শুধু জানতে চাইছি, কাকে সে চায়। তা যদি নাই জানতে পারি তা'হলেও ওর মা-বাপের কাছে পাওয়া স্নেহের যৎকিঞ্চিৎ ঋণ আমি শোধ করে যাবো তারই জন্য দিল্লী যাচ্ছি!

তপন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—শিখা, এই দেশের মেয়েরাই স্বামীর নিন্দা শুনে মৃত্যু বরণ ক'রেছে, মৃত স্বামীর কঙ্কাল নিয়ে দেশে দেশে ফিরেছে, গলিত-কুষ্ঠ স্বামীকে কাঁধে করে বয়ে বেড়িয়েছে,—আধুনিকা তোরা, অতটা বাড়াবাড়ি না-হয় নাই করলি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কারো ভাগ্যে যদি নির্ব্বোধ মুর্খ স্বামীই জোটে তো তাকে কি স্নেহের স্বরে একটা কথাও বলবি নে? বন্ধু দিয়ে অপমান করে তাড়াবি! তার চেয়ে নিজেরই কি বলা উচিত নয়, 'তুমি চলে যাও, আমি তোমায় চাইনে।' তপতী যদি বলতো, সে অন্য কাউকে ভালোবাসে, তাহলে আমি সানন্দে তাকে তার প্রিয়তমের হাতে তুলে দিতাম। আজো তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছি আমি শিখা,—কিন্তু, তপতীর মনের খবর জানবার সুযোগ আমার খুবই কম। ওর মা-বাবাকে কথাটা জানালে তাঁরা অত্যন্ত আহত হবেন, তাই নিজেই সহ্য করছি। দুঃখ আমি বিস্তর সয়েছি বোনটি, এটাও সইতে পারবো—তোরা সুখে থাক।

তপন চলিয়া গেল, শিখা নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

তপতী নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়াছিল কার্ডখানার দিকে, শিখার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র! তপতী এবং তপন দুজনকেই এক পত্রে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তপতীর গাত্রদাহ হইতেছিল ঐ ইতর লোকটার সহিত তাহার নাম যুক্ত হইতে দেখিয়া কিন্তু নিরুপায় নিস্ফল গর্জন ছাড়া

তপতী আর কি করিবে! সৌভাগ্য এই যে তপতী সেদিন এখানে থাকিবে না, দিল্লীতে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য কালই তাহারা যাত্রা করিবে।

তপতী নীচে আসিয়া বসিল বন্ধুদের অপেক্ষায়; অনেক কিছু আয়োজন করিবার আছে তাহাদের। মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ অধিকারী, মিঃ সান্যাল, রেবা, সিকতা, শৈলজা ইত্যাদি আসিয়া পৌছিল।

রেবা বলিল,—বন্ধুর বে'তে থাকবি নে তুই ? কেমন ছেলে রে ? তুই জানিস্ ?

তপতী অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল,—জানার দরকার ? সে যখন আমায় ছাড়তে পেরেছে তখন আমিই-বা না পারবো কেন !

—ঠিক কথা। তবে বিয়েটা কার সঙ্গে হচ্ছে, জানতে ইচ্ছে করে !

—জেনে আয় গিয়ে! নাম তো দেখলাম বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তপতী একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের আজ্ঞাতেই মোচন করিল !

মিঃ ব্যানার্জি তাহার কথাটা ধরিয়া বলিলেন,—বিলেৎফেরৎ নাকি ; করে কি ?

—জানিনে—বলিয়া তপতী অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিজের দুর্ভাগ্য আজ তাহাকে অপরের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত করিতেছে। তপতী বুঝিতেছে, ইহা অন্যায়, কিন্তু মন তাহার আয়ত্তের বাহিরে। নিজের মনের এই শোচনীয় অধোগতি আজ তপতীকে ব্যাথা দিল না, বিষাক্ত করিয়া দিল। তাহার যত কিছু জ্বালা তপনের সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিতে পারিলে তপতী যেন কতকটা জুড়াইতে পারে।

মিঃ অধকারী বলিলেন,—লোকটা ব্রাহ্ম, না হিন্দু, না খৃষ্টান ? জানেন ?

—হিন্দুই হবে বোধ হয়—শিখা কি আর অন্য ধর্ম্মের কাউকে বিয়ে করবে! ওর যা হিন্দুয়ানী ’স্বভাব, ওর বাবা তার উপর যান ; আর মা যান তারো উপরে।

রেবার কথাকটি শুনিয়া সকলেই হাসিল, হাসিল না শুধু তপতী ; গম্ভীর মুখে খানিক বসিয়া থাকিয়া কহিল,—ভালই ! শিখা হচ্ছে আর্য্যনারী।

—কেন ? আমরাও তো আর্য্যনারী—আমরাই বা সতীর কম কি ? রেবা কহিল।

—বেফাঁস কথা কেন বলিস রেবা—সতীত্বের মানে বুঝিস্ ?

তপতীর উষ্ণ কথায় সবাই চুপ হইয়া গেল ! মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,

—আমরাও জানিনে সতীত্বের মানে ; আপনি যদি বলেন দয়া করে ? শুনে ধন্য হই।

—জানেন—কোন কালে কেউ সতী ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না।

—কেন ? সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা,—রেবা ত্বরিতে কথাটা বলিয়া তপতীর মুখের দিকে চাহিল।

কলহাস্যে তপতী ঘর ভরিয়া দিয়া বলিল,—থাম্ থাম্—সীতার মতন বোকা মেয়ে পৃথিবীতে আর জন্মায় নি ! আর সাবিত্রী তো এক নম্বর পলিটিসিয়ান, আর নির্লজ্জ বেহুলার কথা বলতেও ইচ্ছে করে না, একটা ফার্ষ্টক্লাস ককেট। নাচ্‌নী সেজে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে এল !

সবাই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। মিঃ ব্যানার্জি প্রশ্ন করিলেন,—সীতা বোকা, কিসে প্রমাণ হয় ?

—বরাবর ! প্রথম, রাবণের মত একটা পশুপ্রকৃতির লোককে অত রূপগুণ থাকা সত্ত্বেও সীতা খেলাতে পারেনি ; অশোক বনে পড়ে পড়ে মার খেলো। তারপর আগুনে পুড়ে পরীক্ষা দিয়ে নিজের আত্মার করলো অপমান। রাণী তুই না-হয় নাই হতিস বাপু, তা'হলে পরীক্ষা দিবি কিসের জন্য ! তিন নম্বর বোকামী তার পরের কথায় নিষ্ঠুর স্বামী তাকে দিল বনবাস আর সে দিব্যি বনে চলে গেল। কেন ? সেও তো একজন প্রজা, বিনাপরাধে তার শাস্তি সে কেন মেনে নিলো ?—কেন বিচার চাইল না ? তাতে সে স্বামীকেও স্বধর্ম্মের পথে চালনা ক'রতে পারতো ! সতী

হবার কাঙালপনায় ঐ মেয়েটা নারীত্বের চরম অপমান ঘটিয়েছে। চতুর্থ দফায় সে ক'রলো পাতাল-প্রবেশ! আত্মহত্যার আর ভালো উপায় তখনকার দিনে ছিল কিনা আমার জানা নেই—পটাশিয়াম সায়নাইট তখনো বার হয়নি, কিন্তু আত্মহত্যা ও করলো কেন? এই কাপুরুষত্ব, আই মিন্ কা-নারীত্ব—সবাই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, তপতী ধমক দিয়া কহিল,—থামুন, হাসি কেন অত? এই কা-নারীত্ব আমি কিছুতেই সমর্থন করিনে। সীতার যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকতো তাহলে সে রামের গড়া সোনার সীতাকে আগে ভেঙ্গে চুরমার করে বলতে পারতো, আমি পরীক্ষাও দেব না, আত্মহত্যাও করবো না; তুমি আমায় বিয়ে করেছ, বনে যদি যেতে হয়, চল দু'জনেই। তোমার বোকামীর জন্য আমার একা কেন শাস্তি হবে? তুমি গিয়েছিলে কেন সোনার হরিণ ধরতে? কেন তুমি রাবণের বাড়ী থাকার সময়েই আমায় আত্মহত্যা করতে বল নি? কেন তুমি অগ্নি-পরীক্ষাটা এখানেই এনে করলে না? কেনই-বা তুমি বিনা বিচারে আমায় বনে পাঠালে? নিজে যেমন তুমি নির্ব্বুদ্ধিতা করে একটা বুড়ো স্ত্রৈণ লোকের কথা রাখবার জন্য বনে গিয়েছিলে, তেমনি কি সবাই বোকা নাকি? কিন্তু সীতা এত বোকা ছিল আর ছিল সতীত্বের নামে কাঙাল যে এ-সব কথা ওর মাথায় একদম ঢোকেনি!

আলোচনাটা অত্যন্ত সরস এবং উপভোগ্য হইতেছে ভাবিয়া মিঃ অধিকারী কহিলেন,—আচ্ছা, সাবিত্রী সম্বন্ধে কি আপনার বক্তব্য?

—সি ওয়াজ এ গ্রেট পলিটিশিয়ান। সাবিত্রী সতী কি না, বলতে পারি না, তবে সীতার চেয়ে-সে হাজারগুণ বুদ্ধিমতী। যম রাজার মত ঘড়িয়াল লোককে সে সাতঘাটের জল খাইয়ে দিল। নারীত্বের সম্মান সে কিছুটা রেখেছে, এইজন্য ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। দেখুন না, রাজার মেয়ে তো, চেহারাটা নিশ্চয় ভাল ছিল, যম রাজাও এসে গেছে, আর সাবিত্রী

আরম্ভ করেছে নানারকম কথার প্যাঁচ। পুরুষমানুষের মাথা ঘুলিয়ে দিতে কতক্ষণ! শেষ যখন বললো, তার একশ' ছেলে চাই, তখন যম ভাবলো, আহা বেচারা, এই বয়সে সেক্স-আকাঙ্ক্ষাটা মিটোবার বায়না ধরেছে, অস্বাভাবিক তো কিছু নয়! দিয়ে দিলো বর। সাবিত্রী যে পলিশি করে ওর প্রার্থনার মধ্যে "সত্যবানের দ্বারা" কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, রূপমুগ্ধ যমের তখন আর সেদিকে খেয়ালই নেই! কেমন কৌশলে বর নিল বলুন তো? একশ' ছেলে, বছরে একটা হলেও স্বামী তার অন্ততঃ একশ' বছর বাঁচবে। ছেলের তার কিছু দরকার ছিল বলে তো মনে হয় না, দরকার যা' ছিল তা সে ঠিক আদায় করে নিয়েছে। এমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে যদি সতী বলা চলে, তাহলে অবশ্য সাবিত্রী সতী'ই!

মিঃ সান্যাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—বেহুলার কথাটাও বলুন একটু।

—ও আর বলে কাজ নেই। ও যখন দেখলো যে দেবতারা তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে পারে তখন সেখানে গিয়ে নাচ গান যাকিছু করা দরকার, করে স্বামীর জীবনটিকে ফিরিয়ে নিল। আধুনিক যেসব মেয়েকে চাঁদা আদায় করতে পাঠানো হয়, বেহুলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচুদরের কক্বেট্।

তপতীর প্রত্যেক কথা হাস্যোদ্রেক করিলেও তাহার চিন্তাশীলতার গভীরতা অন্যান্য সকলকে অভিভূত করিতেছিল; হাসিতে গিয়াও তাহারা ভাবিতেছিল, তপতীর চিন্তাধারা ভিন্ন খাত্ বহিয়া চলে। আর তপতী ভাবিতেছিল, ভারতের চিরবরেণ্যা কয়জন মহামানবীর চরিত্রের যে সমালোচনা সে আজ করিতেছে, তাহা শুনিলে তাহার ঠাকুরদা হয়তো মূর্চ্ছা যাইতেন। তপতীর মনে বেশ একটা তীব্র সুরার আনন্দ অনুভূত হইতেছে। ঠাকুরদার মৃত আত্মা যদি কোথাও থাকেন তো শুনুন, তাঁহার নাতনী ঠাকুরদার চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

মিঃ সান্যাল এবার বেশ জোরে হাসিয়া কহিলেন,—আপনার অভিধানে তাহলে "সতী" কথাটা নেই, কেমন?

—থাকবে না কেন? 'সৎ' কথাটার স্ত্রীলিঙ্গ সতী। কিন্তু সৎ কাকে বলে তা বুঝতে হলে আবার অভিধান দরকার। ঠাকুরদা বলতেন, সৎ চিরস্থায়ী আর অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু এরকম কোনকিছু আমি তো খুঁজে পাইনে। ভগবান যদি বা থাকেন তো তিনি দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে পরিবর্ত্তিত হন, অর্থাৎ তিনি নেই, আছে মানুষের কল্পনা, যার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

—ভগবান না থাকাই ভালো, অনেক হাঙ্গামা চুকে যায়। আর থেকেই-বা উনি কি করছেন আমাদের?—কথাটা বলিয়াই মিঃ ব্যানার্জি টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

—তাঁর থাকার ভয়ানক দরকার, নইলে মানুষ তার হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তিগুলো দেবে কাকে? চৈতন্যের মতন খোল বাজিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি কেবল ঐ নির্ব্বিকার ভগবানই সইতে পারেন। ঐ তাণ্ডব কোন মানুষের উপর চালালে সেও যে নির্ব্বিকার পাথর বনে যাবে?—তপতীর কথায় আবার সকলে হাসিয়া উঠিল!

অকস্মাৎ তপতীর ঠাকুরদার হাতে-গড়া মন চীৎকার করিয়া উঠিল, এ সত্য নয় তপতী আত্মবঞ্চনা করিতেছে। নিজেকে সংশোধন করিবার জন্যই যেন সে বলিয়া উঠিল,—ঐ নির্ব্বিকার ভগবান আছে, ও থাক—ওকে মানুষের বড় দরকার। যে কথা নিজের কাছেও বলতে মানুষ কুণ্ঠিত হয়, সে-কথাও ওর কাছে বলে খানিকটা হাল্কা হওয়া যায়। জীবনে এমন দুঃসময় আসে, যখন একটা অচেতন কিছুকে চেতন ভেবে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলতে ভালো লাগে, ভালো লাগে নিজের আরোপিত স্নেহকেই তার কাছ থেকে ফিরে পেতে। নিজের ক্ষুদ্রতাকে মানুষ নিজেরই কল্পনার বিশালতার মধ্যে অনুভব করতে চায়! তপতী কথাগুলো বলিয়া যেন দম লইতেছে।

—তা হলে ভগবানকে মেনে নিলেন আপনি?—মিঃ ব্যানার্জি পুনঃ প্রশ্ন করিলেন!

—মানা না-মানায় ওঁর কিছু এসে যায় না, ওঁকে দরকার হলে ডাকবো, না-হলে ডাকবার দরকার নেই, এমন সুবিধার জিনিষ না ত্যাগ করাই বুদ্ধির কাজ। চলুন, এখন সব গোছগাছ করে নিতে হবে।

তপতী উঠিল এবং বাধ্য হইয়া অন্য সকলেও উঠিল!

পরদিন বিকালের ট্রেণে তপতীদের দল, মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যথাসময়ে হাওড়ায় পৌছিয়া রিজার্ভ ফাষ্ট ক্লাশের দুইটি কক্ষে স্থান গ্রহণ করিল। ট্রেণ প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় তপন একজন কুলীর মাথায় সুটকেশ ও বেডিং লইয়া তপতীদের কামরার সুমুখ দিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—তপনবাবুও যাচ্ছে নাকি?

তপতী লক্ষ্য করে নাই, মিঃ ব্যানার্জির কথায় চাহিয়া দেখিল, তপন যে গাড়ীতে উঠিতেছে, তাহার দরজাটায় একটা বড় অক্ষরের তিন নম্বর।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—কি রকম! থার্ড ক্লাসে যাচ্ছে যে?

তপতী চুপ করিয়া রহিল। বিস্ময় ও লজ্জায় তাহার মাথা নীচু হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যালকে কহিল,—ও যে আমাদের কেউ, একথা যেন এখানে আর কেউ না শোনে, বুঝলেন? লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন,—আমরা অত নির্ব্বোধ নই, মিস্ চ্যাটার্জি? কিন্তু লোকটা কী ধড়িবাজ। আপনার বাবার কাছে নিশ্চয় ফাষ্ট ক্লাসের ভাড়া ও আদায় করেছে,—টাকাটা জমিয়ে নিল!

ইহা ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে! বাবা নিশ্চয় জামাইকে থার্ড ক্লাসে পাঠাইবেন না। কোটীপতি লোকের জামাই তপন থার্ড ক্লাসে যাইতেছে, শুনিলে লোকে কী ভাবিবে! রাগে দুঃখে তপতীর কান্না পাইতে লাগিল। স্থির করিল, ফিরিয়া আসিয়া বাবাকে বলিয়া ইহার প্রতিকার সে করিবেই। তখনকার মত তপতী বিষয়ান্তরে

মনঃসংযোগের চেষ্টা করিল, কিন্তু মনের ভিতর যেন একটা আগ্নেয়গিরি ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার ধূমায়িত শিখায় তপতীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। ঐ লোকটার সীমাহীন অর্থলোলুপতা তপতীর পিতাকে পর্য্যন্ত অপদস্ত করিতেছে। ধনীর দুলালী, আভিজাত্য গৌরবে গরবিনী তপতী ভাবিতেই পারে না, থার্ড ক্লাসে যাইতেছে তাহার স্বামী—তাহারই পিতার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির মালিক!

নির্ব্বাক তপতীর মনের ভাব বুঝিয়া মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,

—আর দেরী করায় লাভ কি মিস্ চ্যাটার্জি? আপনার বাবাকে বলে ওকে তাড়িয়ে দিন বাড়ী থেকে!

—হুঁ—

—আপনার মত মেয়েকে পাওয়া যে-কোন উচ্চ শিক্ষিত যুবকের অহঙ্কারের বিষয়।

—হুঁ—

—অবশ্য বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলটা রেজেষ্টারী করিয়ে নিতে হবে তার আগে। তপতী এবারও একটা হুঁ দিয়া অন্য দিকে সরিয়া জানালায় মুখ বাড়াইল।

নিখিল-ভারত-সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল গানে প্রথম পুরুস্কার পাওয়ার আনন্দ লাভ করিতে গিয়া তপতীর মন বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল। এই গান তাহার শুনিবে কে? কা'র জন্য তপতীর এই সাধনা! সে কি ঐ নিতান্ত অপদার্থ একটা গণ্ডমূর্খের জন্য? তপতীর বিষবাষ্প যেন তপনকে এই মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া দিতে চায়।

মিঃ ব্যানার্জি এবং মিঃ সান্যাল তপতীর মনের গতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতেছেন।

তাঁহাদের কাজ হাসিল করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সুযোগ! তপতীর নিকট আসিয়া কহিলেন,

—চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—হুমায়ুনের কবর দেখে আসি গে!

তপতী আপত্তি করিল না। একটু বাহিরে গিয়া আপনার চিত্তবেগ প্রশমিত করিতে তাহারও ইচ্ছা জাগিতেছিল। ট্যাক্সি চড়িয়া সকলে যাত্রা করিল। পৃথ্বীরাজ রোডের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। দুই পাশে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি, তাহার উপর বাব্‌লা বন;—যেন সুদূর অতীতের পথ ধরিয়া চলিয়াছে তাহারা পৃথ্বীরাজেরই রাজত্বে!

তপতী হঠাৎ কহিল,—সংযুক্তার কথা মনে পড়ছে। যোগ্য স্বামীকে পাবার জন্য বাপ-মাকে ছাড়তে সে দ্বিধা করেনি—অদ্ভুত মেয়ে।

মিঃ ব্যানার্জি তাহাকে উস্কাইবার জন্য কহিলেন,—আপনার মনের শক্তিও কিছু কম নয়। আজ দীর্ঘ সাতমাস আপনি মা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন।

তপতী একটা নিশ্বাস ছাড়িল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—যুদ্ধ এখনো করিনি মিঃ ব্যানার্জি, এ কেবল সমরায়োজন চলছে। কিন্তু সংযুক্তার মতো ভাগ্য তো আমার নয়, আমার পৃথ্বীরাজ এখনো আসেন নি!

মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল চকিত হইয়া উঠিলেন। তপতীর মনটাকে তাঁহারা আজো আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তবে! কে তবে উহাকে লাভ করিবে! এখনি সেটা জানিয়া লওয়া দরকার। বলিলেন, —আপনার পৃথ্বীরাজ কি-ভাবে আসবেন, বলতে পারেন মিস্ চ্যাটার্জি?

না! যেদিন আসবেন সেদিন বলতে পারবো। আজ শুধু জানি, যাঁরা এতদিন ধরে আসছেন তাঁরা কেউ-ই পৃথ্বীরাজ নন! তাঁদের মধ্যে অনেক ঘোরী আছেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজ নেই।

তপতীর ইঙ্গিত ব্যঙ্গের কাছ ঘেঁষিয়া মিঃ ব্যানার্জিদের পীড়িত করিতেছে। মিঃ ব্যানার্জি আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন, কহিলেন,

—ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ঘটেছিল, বীরত্ব তার কম ছিল না মিস্ চ্যাটার্জি ?

—দুর্ভাগ্য সংযুক্তার—বাবা তার জয়চন্দ্র, আর সৌভাগ্য সংযুক্তার, স্বামী তার মৃত্যুঞ্জয়ী ! ঘোরীর বীরত্ব দেশজয় করতে সক্ষম, নারী-হৃদয় নয় ; কারণ নারী নিজে ছলনাময়ী বলে ছলনা কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। নারী নিশ্চিন্ত-নির্ভরতায় তাকেই আত্মদান করবে যে তাকে ছলনা দিয়ে ভুলায় না। অত্যন্ত সহজে এসে সেই তার বুকের পদ্মটিতে গন্ধ হয়ে ফোটে যে-পুরুষ আপন পৌরুষ-মহিমায় মৃত্যু-পথকে উজ্জ্বল করে তুলবে ; চালাকিতে নয়, ছলনায় নয়, কপটতায় নয়। নারী নিজে সাংঘাতিক কপট তাই, অন্যের কপটতা সহজে বুঝতে পারে।

—আপনি কি বলতে চান যে আমরা আপনার সঙ্গে কপটতা করি ?

—হাঁ, তাই। তার প্রমাণ আপনার এই প্রশ্নটি। আপনি যদি অকপট হতেন তাহলে এ প্রশ্ন আপনার মনে আসতো না। আমি তো কোন ব্যক্তিগত কথার আলোচনা করিনি ! আপনি নিজেই ধরা পড়লেন !—তপতী হাসির বিদ্যুৎ হানিল !

মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল মুষড়াইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মিঃ সান্যাল কানে কানে মিঃ ব্যানার্জিকে বলিলেন,—"আধুনিক সাইকোলজি বলে, মেয়েরা যাকে ভালবাসে তাকেই ঐ রকম আক্রমণ করে ; অতএব ভাবনার কিছু নাই।"

কথাটা শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জি প্রীত হইয়া কহিলেন,—কপটকে কপটতা দিয়েই তো জয় করা যায়।

তপতী মধুর হাসিল, একটু থামিয়া বলিল,—জয়ীর লক্ষণ হচ্ছে বিজিতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা—পারবেন তো ?

—নিশ্চয় ! বলুন কি আকাঙ্ক্ষা ? মিঃ ব্যানার্জি সাগ্রহে চাহিলেন তপতীর দিকে !

—উপস্থিত যৎসামান্য! ঐ যে লোকটা বসে আছে, পিছনের চুলগুলো ঠিক তপনবাবুর মত, দেখে আসুন তো, ও সেই কি না। আপনাকে আশা করি চিনতে পারবে না!

—সম্ভব নয়—বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন। হুমায়ুনের কবরের নিকট এক-টুকরা ঘাসে ভরা জমির উপর তপন নিশ্চল-ভাবে বসিয়াছিল। মিঃ ব্যানার্জি গিয়া দেখিলেন এবং নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি বাঙালী দেখছি!

—হাঁ—বলিয়া তপন তাহার মুখের পানে তাকাইল। মিঃ ব্যানার্জিদের সহিত তাহার পরিচয় নাই। ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেড়াতে এসেছেন বুঝি? ক'দিন থাকবেন? উত্তরে তপন জানাইল, তাহার কাজ শেষ হইয়াছে।—কাল সে আগ্রা যাইবে এবং পরশু বৃন্দাবনধাম দর্শন করিয়া পরদিন কলিকাতা ফিরিবে! মিঃ ব্যানার্জি হয়তো আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু তপন উঠিয়া নমস্কার করিয়া অদূরে দণ্ডায়মান টোঙ্গায় চড়িয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্যানার্জি ফিরিয়া তপতীকে সব কথা জানাইয়া শেষে কহিলেন,—ভদ্রলোক দেখলেই ও ভয় পায়!

—পায় হয়তো! চলুন, কাল আমরাও আগ্রা যাই!

এভাবে কেন তপনের পিছনে ঘুরিয়া মরিবে, জিজ্ঞাসার উত্তরে তপতী জানাইল, উহার পিছনে একটু গোয়েন্দাগিরি করা দরকার, নতুবা বাবা-মা'কে কি বলিয়া সে বুঝাইবে যে তপনকে বাড়ীতে রাখা যায় না। আগ্রায় এবং বৃন্দাবনে সে কি করে জানিতে হইবে। ঐ সঙ্গে আগ্রা সহরটাও দেখা হইয়া যাইবে আর একবার।

পরদিন নিউ দিল্লী ষ্টেশনে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আসিয়া উঠিল তপতীদের দল। তপনকে তাহারা অনেক খুঁজিয়াও দেখিতে

পাইল না। তপতী সেই দীর্ঘ পথ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—হয়ত তপন এ গাড়ীতে আসে নাই, কিম্বা কোন থার্ড ক্লাশের ভিড়ে লুকাইয়া গিয়াছে! যদি না আসে তবে তপতীদের পরিশ্রম বৃথা হইবে। তপতী জানিতে চায়, এত দূরে আসিয়া ঐ অদ্ভুত লোকটা কী করিতেছে।

বেলা বারটায় গাড়ী আসিয়া আগ্রায় থামিল। জিনিষপত্র গুছাইয়া সিসিল হোটেলের লোকদের সহিত গাড়ীতে উঠিতে গিয়া মিঃ ব্যানার্জি দেখাইলেন, একটা টোঙ্গায় স্যুটকেশ ও বেডিং হাতে তপন উঠিয়া চলিয়া গেল! হয়তো আট আনা দামের কোন হোটেলে উঠিবে। এই ভাবে পয়সা বাচাইতে গিয়া তপন যে তাহার সম্মানিত পিতার কতখানি অপমান করিতেছে তাহা ঐ ইডিয়ট বোঝে না। তপতীর সর্ব্বাঙ্গ জলিতে লাগিল।

হোটেলে আসিয়া স্নানাহার সারিয়া সকলেই বলিল, ফতেপুর সিক্রী, আগ্রা ফোর্ট, ইৎমাৎ-উদ্দৌলা ইত্যাদি দেখিতে যাইবে। তপতীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া হোটেলেই পড়িয়া রহিল! আগ্রা সে পূর্ব্বে দুইবার দেখিয়াছে। অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইবার পর তপতী ভাবিতে বসিল তাহার জীবনের অপরিসীম ব্যর্থতার ইতিহাস। তপনকে ভালবাসিবার আকাঙ্খা সে তাহার মনের অলিগলিতে ঘুরিয়াও কুড়াইয়া পাইল না। ঐ লোকটার উপর বিতৃষ্ণাই কেবল জাগিয়া উঠে এবং বিতৃষ্ণার কথা ভাবিতে গিয়া ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়। উহার হাত হইতে উদ্ধার লাভের কি কোন উপায় নাই! সারাদিন চিন্তার পর ক্লান্ত তপতীর মনে হইল, প্রেমের শ্রেষ্ঠ তীর্থ তাজমহলটা একবার দেখিয়া আসিবে। হোটেলের গাড়ী আনাইয়া তপতী উঠিয়া বসিল।

আশ্চর্য্য! তাজমহলের সম্মুখে ঝাউ-বীথিবেষ্টিত প্রকাণ্ড চত্বরে বসিয়া আছে তপন, দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত; তাজের শুভ্র মর্ম্মর মূর্তিকে যেন সে

ধ্যান করিতেছে। তপনের পিছন দিকটা তপতী ভালভাবেই চিনিত, ঘাড়ের পাশের সেই কালো তিলটি, লম্বা গভীর কালো কোঁকড়ানো চুল লতাইয়া পড়িয়াছে যেখানে। সামনে গেলে পাছে তপতীকে দেখিয়া তপন চলিয়া যায় এই ভয়ে তপতী পশ্চাতেই অপেক্ষা করিতে লাগিল! সন্ধ্যা হইতেছে। আষাঢ় পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিরহী সম্রাটের প্রেমদ্যুতি যেন ভাষা লাভ করিতেছে।

তপন উঠিয়া তাজমহলের মধ্যে আসিল। তপতী তাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। জনতার মধ্যে কে কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলিতেছে তপন লক্ষ্য মাত্র করিল না। সম্রাট-সাম্রাজ্ঞীর সমাধিপার্শে আসিয়া সে হাতের ফুলগুলি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া আবৃত্তি করিল,—

"হে সম্রাট কবি, এই তব জীবনের ছবি
এই তব নব মেঘদূত, অপূর্ব্ব—অদ্ভুত
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া—
ভুলি নাই—ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া!"

তপতীর বিস্ময় সীমাতিক্রম করিয়া গিয়াছে! এই তপন? সত্যই এ তপন তো? কিম্বা তপতী অন্য কাহাকেও তপন ভাবিয়াছে। না, তপতীর ভুল হয় নাই। ও যে তপন তাহার পরিচয় রহিয়াছে উহার পোষাকে। ঐ পোষাক সে দিল্লীতেও পরিয়াছিল, ঐ রং, ঐ রকম কোট।

তপন প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল। তপতী পিছনে পিছনে আসিতেছে বরাবর। তাজমহলের সুবিস্তৃত আঙ্গিনা পার হইয়া তপন বাহিরের গাড়ী থামিবার জায়গায় আসিল। তাহার টোঙ্গা-ওয়ালা কহিল,—আইয়ে!

তপতী ত্বরিতে তপনের নিকট আসিয়া বলিল,

—আমায় একটু পৌঁছে দেবেন?

তপন এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,

—একা এসেছেন ? চলুন, কোথায় যাবেন ?

—সিসিল হোটেল—বলিয়া তপতী চাহিল জ্যোৎস্নালোকদীপ্ত তপনের মুখের পানে। ভাল দেখা যায় না, তথাপি তপতীর মনে হইল, এমন সুন্দর সে আর দেখে নাই। টোঙ্গার সামনেকার আসনে তপতী উঠিয়া বসিল, তপন বসিল পিছনে।

—এদিকে আসুন,—তপতী অনুরোধ করিল তপনকে তাহার পাশে বসিতে।

—থাক্—আমি বেশ আছি—বলিয়া তপন আদেশ করিল গাড়ী চালাইতে।

—কেন ? এখানে আসবেন না ? তপতীর কণ্ঠে অজস্র বিস্ময় !

—মাফ করবেন, আমি অনাত্মীয়া মেয়েদের পাশে বসিনে—তপনের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

—অনাত্মীয়া ? আমি আঁপনার অনাত্মীয়া নাকি ? এই, রোখো !—তপতী কঠোর আদেশ করিল চালককে।

রাগে তপতীর আপাদমস্তক ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিয়াছে। লাফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া সে সক্রোধে কহিল,—আমিও অনাত্মীয় পুরুষের গাড়ীতে চড়ি না—বলিয়াই অপেক্ষামাত্র না করিয়া তপতী হোটেলের গাড়ীতে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

ব্যাপারটা কি ঘটিল, কেন উনি এভাবে চলিয়া গেলেন, তপন কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বিব্রতভাবে চাহিল। কোন নারীর মুখের পানে সে পারতপক্ষে তাকায় না। ইহাকেও চাহিয়া দেখে নাই; একক কোন মহিলা পৌঁছাইয়া দিতে বলিতেছেন, তপনের অন্তরের কাছে ইহাই যথেষ্ট আবেদন। সমস্ত ব্যাপারটা তপনের দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে।

গাড়ীতে উঠিয়া উত্তেজনার আতিশয্যে তপতী কয়েক মুহূর্ত্ত প্রায় কোন চিন্তাই করিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, তপন তাহাকে

এত বেশী অসম্মান করিয়াছে যাহা পৃথিবীর কোন মেয়েকে কোন পুরুষ কখনো করে নাই। কিন্তু সন্ধ্যার শীতল বায়ুর স্পর্শে এবং তপনের সুন্দর মুখের মোহমদিরার যাদু-মহিমায় তপতী যেন কিছুটা কোমল হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল—তপতী যে এখানে আসিয়াছে ইহা তপন তো জানে না। অনাত্মীয়া মনে করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ দীর্ঘ সাত মাস তপন একই বাড়ীতে তপতীর সহিত বাস করিতেছে, এত কালেও কি সে তাহাকে দেখে নাই? নিজে তপন মুখ ফিরাইয়া থাকে, চোখে ঠুলি পরে, তথাপি তপতীর তাহাকে চিনিতে ভুল হইল না, আর তপন তাহাকে অত কাছে দেখিয়াও চিনিল না! তপন নিশ্চয়ই তাহাকে ঠকাইয়াছে। এইভাবে তপতীকে অপমানিত করিয়া সে তপতীর অপমানের শোধ লইল। কিন্তু তাহার ব্যবহারে তো সেরূপ মনে হইল না।

এই মুহূর্ত্তে তপতীর মনে প্রশ্ন জাগিল, তপন তাহাকে 'অনাত্মীয়া' বলায় সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিম্বা অপমানিত বোধ করিতেছে! তপতীর পিতার অন্নদাস, একটা দরিদ্র ভিক্ষুক, তপতীর আত্মীয়তাকে অস্বীকার করিবার শক্তি তপন পাইবে কোথায়? কোন সাহসে? বিবাহের বন্ধন গ্রন্থী আধুনিক কালে এমন কিছুই জটিল নয়, যাহা খুলিতে তপতীর খুব বেশী আটকাইতে পারে। কিন্তু কেন তবে লোকটা তপতীকে অপমান করিল? সে কি সত্যই তবে তপতীকে চেনে নাই? না-চেনাই সম্ভব। এমন অস্থিরভাবে গাড়ী হইতে না নামিয়া আসিলেই ভাল হইত। বলিল যে অনাত্মীয়া মেয়ের পাশে সে বসে না, আচ্ছা, পরীক্ষা করিতে হইবে, অনাত্মীয়া মেয়ে বসিতে আহ্বান করিলেও বসিবে না, এমন স্বদুঃসহ গোঁড়ামীর মূল কোথায় তপতী তাহা দেখিয়া লইবে।

হোটেলে আসিয়াই তপতী আবদার ধরিল, কাল বৃন্দাবন যাইবে। তপতীর অনুরোধ আদেশেরই নামান্তর। সকালে হোটেলের দুইখানা 'কার' লইয়া সকলে বৃন্দাবন যাত্রা করিল। সেই বৃন্দাবন, যেখানে বংশীরবে যমুনা

বহিত উজান; বাঁধনহারা ব্রজগোপিগণ ছুটিয়া আসিত কোন্ অনন্ত প্রেম-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে; কালো কৃষ্ণ যেখানে কালাতীত হইয়াছেন প্রেমের আলোয়। সারাদিন শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ দর্শনে কাটিল। গৌরাঙ্গ কোন পুরুষ দেখিলেই তপতীর মনে হয়, ঐ বুঝি তপন, কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙিয়া যায়। তপনকে কোথাও দেখা যাইতেছে না! তবে কি সে আসে নাই? তপতীকে অপমান করিয়া ফিরিয়া গেল নাকি? তপতী চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে। মিঃ ব্যানার্জি এবং মিঃ সান্যালও তপনকে খুঁজিতেছেন। তাঁহাদের মনে একটা আশা জাগিতেছে, তপনকে কোন একটা বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে দেখাইয়া দিতে পারিলেই তপতীর অন্তর হইতে তাহাকে চিরনির্বাসিত করা যাইবে। কোন একটা ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে যদি তপনকে দেখা যায়, তবে এখনই প্রমাণ হইয়া যায় যে তপন শুধু অর্থলোভীই নয়, অসচ্চরিত্রও। তপনকে না তাড়াইতে পারিলে তাহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বহুস্থান ঘুরিয়া সকলেই প্রায় ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফিরিতেছে, একটা স্থানে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছে দেখিয়া তপতীর দল গাড়ী থামাইল। এক বাঙালী ভদ্রলোক একটি পাখী কিনিতে চান, তিনি কহিলেন,—আমি দু'টাকা দেব। তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে যে উত্তর দিল, সবিস্ময়ে চাহিয়া তপতীর দল দেখিল, সে তপন;—বলিল, আমি চার টাকা দিচ্ছি। তপনের পরিহিত পোষাক ধূলিমলিন, গায়ে এত ধূলা লাগিয়াছে যে প্রায় চেনা যায় না। সারাদিন রোদে ঘুরিয়া তাহার মুখকান্তি মলিন এবং অসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি তপতীর আজ মনে হইল, সারাটা দিন ঘোরার পরিশ্রম যেন তাহার সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। ঐ ক্লান্ত বিষণ্ন মুখশ্রীকে তাহার অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছিল। তপন বলিল,—দাও পাখীটা—সে চারটা টাকা দিয়া পাখীওয়ালার নিকট হইতে পাখীটা লইল। একটু বয়স্ক হইলেও ভারী সুন্দর রং পাখীটার।

ধরা পড়িয়া মুক্তির জন্য পাখীটা করুণভাবে কাঁদিতেছে আর ডানা ঝাপটাইতেছে। তপতীর ইচ্ছা করিতেছিল, তপনের হাত হইতে সে এখনি উহা লইয়া আসে, কিন্তু সঙ্গীদের মধ্যে মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যাল ছাড়া কেহই তপনকে চেনে না, তাহারা কি ভাবিবে! তারপর ঐ নিতান্ত কদর্য্য পোষাক-পরিহিত দরিদ্র মূর্ত্তিকে তপতী স্বামী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে না। সে থামিয়া গেল!

প্রথমে যে ভদ্রলোক পাখীটা কিনিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি শুষ্কমুখে কহিলেন,—অত বড় বুড়ো পাখী, পোষ মানবে না মনে হচ্ছে!

—ঠিক মানবে, এই দেখুন না—বলিয়া তপন পাখীটাকে মুক্ত আকাশে উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া কহিল,—মুক্তির মধ্যেই প্রেমের বন্ধন দৃঢ়তর হয়।

—করলেন কি মশাই!—বলিয়া একজন চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—ওকে ভালোবাসি কিনা, তাই মুক্তি দিলাম—বলিয়াই তপন চলিয়া গেল।

চোখের জল লুকাইবার জন্য তপতী তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছে। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—আমাদের দেখে কী-রকম অভিনয়টা করলো!

জলভরা চোখে তপতীর রোষবহ্নি গর্জিয়া উঠিল,—থামুন। যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য কথার ব্যবহারের যোগ্যতা পৃথিবীতে কম অভিনেতারই থাকে। ও যদি অভিনেতা হয় তো আমি নিশ্চয় বলতে পারি—ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা!

গাড়ীস্থ সকলেই এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল তপতীর কথা শুনিয়া।

তপতীর সারা অন্তরখানি স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ছাইয়া গেছে। গাড়ীতে সারা পথ সে বিশেষ কিছু কথা বলে নাই, সর্ব্বক্ষণ তপনের কথা ভাবিয়াছে, আর বিস্মিত হইয়াছে। যে মানুষ অর্থ বাঁচাইবার জন্য থার্ড ক্লাসে দূর পথের যাত্রী হয়, মুটে খরচের ভয়ে স্বয়ং বাক্স-বিছানা বহন করে, পোষাকের কদর্য্যতায় পর্য্যন্ত যাহার কৃপণতা পরিস্ফুট, সেই কি-না দুই টাকার পাখী চার টাকা দিয়া কিনিয়া আকাশে উড়াইয়া দেয়, আবার বলে, 'ওকে ভালোবাসি, তাই উড়াইয়া দিলাম।' ইহা অপেক্ষা মানবতার প্রকৃষ্টতম পরিচয় আর কি হইতে পারে? মিঃ ব্যানার্জি বলেন, উহা তপনের অভিনয়। হউক উহা অভিনয়, তথাপি আজ প্রেমের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমের যে নবনীতম বাণী তপনের মুখে শুনিয়াছে, তাহা তপতীর জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে। আর অভিনয়ইবা হইবে কেন? তপন তো জানিত না, তাহারা ওখানে দাঁড়াইয়া আছে। তপতী স্থির করিল, তপনকে লইয়া সে একবার অভিনয়ই করিবে,—প্রেমের অভিনয়।

পরদিন বিকালে হাওড়ায় গাড়ী থামিলে তপতী নিজের গাড়ীতে চড়িয়া বাড়ী ফিরিল! মা তাহাকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেন,

—তপন নামে নি খুকী? ওরও তো নামবার কথা এই ট্রেণে!

—নেমেছে। আমি দেখা না ক'রে চলে এসেছি। ও আসছে ঘোড়ার গাড়ীতে। আমার যাওয়ার কথা ওকে বলো না মা,—তুমি বরং ওকে জিজ্ঞাসা করো, থার্ড ক্লাশে কেন ও যায়।

তপতী স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নানাদি শেষে সে আবার আসিয়া বসিল এমন স্থানে যেখান হইতে মা'র সহিত তপনের কথা শুনা যাইতে পারে!

তপন ফিরিয়া আসিল একটা ফিটনে। 'মা' বলিয়া ডাকিতেই মা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তপনের মূর্ত্তি দেখিয়া দুঃখে তাঁহার অন্তর

ফাটিয়া যাইতেছে। আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—কী চেহারাই করেছ বাবা, মাথায় এত ধূলো যেন ধান চাষ করা চলে!

সুমিষ্ট হাসিতে ঘরখানা পূর্ণ হইয়া গেল। তপনের হাসির আওয়াজ যে এত মিষ্ট তপতী তাহা কোনদিন জানে না। তপন কহিল,—মাথাটা তা'হলে ধান চাষের যোগ্য হ'য়েছে মা! ধানের জমি সব থেকে দামী।

মা আরও ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—রাখো বাবা, তোমার হাসি দেখে আমার রাগ বাড়ছে। থাডক্লাশে কেন তুমি যাবে, বলো তো?

কোট্‌টা খুলিয়া কামিজের বোতাম খুলিতে খুলিতে তপন জবাব দিল—কেন মা, থার্ডক্লাশে তো মানুষই যায়—গরু-ছাগল তো যায় না!

মা এবার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাশেও যায় মানুষ!

—সে বড় মানুষ। আপনার ছেলে তো বড় মানুষ নয় মা, গরীব ছেলে আপনার।

—না-বাবা-না, ওরকম করো না তুমি। মা'র মনে দুঃখ দিতে নাই জান তো!

—দুঃখ কেন পাবেন মা? আপনার সক্ষম ছেলে যে-কোন অবস্থায় নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে, এ তো আপনার সুখেরই কারণ হওয়া উচিৎ?

—কিন্তু আমাদের ক্ষমতা যখন আছে, বাবা, তখন ফার্ষ্ট ক্লাশেই…

বাধা দিয়া তপন বলিল,—ক্ষমতার সংযত ব্যবহারটাই মানুষের শিক্ষনীয় বিষয় মা, এতেই তার মহিমা বাড়ে; মানুষের অক্ষমতাকে ভেংচিয়ে ক্ষমতার জাহির নাই-বা করলাম?

তপন স্নানাগারে ঢুকিল। মা তপনের কথা কয়টি আপনার মনে পুনরাবৃত্তি করিয়া বাহিরে আসিলেন। তপতী বিহ্বল দৃষ্টিতে মাঠের পানে তাকাইয়া আছে। সস্নেহে মা ডাকিলেন,—আয় খুকী, খেয়ে নে কিছু।

—আসছি বলিয়া তপতী আপনার ঘরে চলিয়া গেল। তপনের কথা বলার আশ্চর্য্য ভঙ্গিটি আজ তপতীকে যেন ভাঙিয়া গড়িতেছে। এই সুকুমার দর্শন যুবকটি মূর্খ, উহাকে তপতী উৎপীড়িত করিয়াছে, অপমানিত করিয়াছে, অতিষ্ঠ করিয়াছে, তথাপি সে যায় নাই! কিন্তু কেন যায় নাই, সে-কথা ভাবিতে গিয়াই তপতী আর একবার শিহরিয়া উঠিল। সত্যই কি তপন অর্থলোভী! সত্যই কি সে তপতীর জন্য এত অত্যাচার সহ্য করে নাই, তুচ্ছ অর্থের জন্যই করিয়াছে? ভাবিতে ভাবিতে তপতীর অন্তর ব্যথায় টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। হে ঈশ্বর, যদি তপতী কখনো তোমায় ডাকিয়া থাকে, তবে বলিয়া দাও তপতীর জন্যই তপন এত অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছে। এইটাই যেন সত্য হয়। তপতী তাহার জীবনে আর কিছুই তোমার নিকট চাহিবে না।

মায়ের দ্বিতীয় ডাকে ক্লান্ত তপতী যখন খাইতে আসিল, তখনো তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া রহিয়াছে। মা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—কি হোল রে মা, কাঁদছিস?

—অনেক তীর্থ ঘুরে এলাম মা, ঠাকুরদার সঙ্গে সেই গিয়েছিলাম; আজ তিনি নাই—বলিতে বলিতে তপতী অজস্র ধারায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। বি-এ, পড়া শিক্ষিতা মেয়ের এরূপ অসাধারণ দুর্ব্বলতা দেখিয়া মা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু আনন্দিত হইলেন ততোধিক। তপতী আবার তাঁহার পূর্ব্বের তপতীর মতোই হইয়া উঠিতেছে। চোখের জলে মানুষের মনের ময়লা ধুইয়া যায়—তপতী আবার সুন্দর হইয়া উঠুক, তাহার তপতী নাম সার্থক হোক! মায়ের কল্যাণাশীষের স্পর্শে তপতীর অন্তর সেদিন জুড়াইয়া গেল।

পরদিন সকালে ইতপতী আয়োজন করিল বন্ধুদিগকে ভোজ দিবার। বি-এ পরীক্ষায় সে পাশ করিয়াছে, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি যাহা সে লাভ করিয়াছে তাহা তপনের সঠিক পরিচয়। এমন দিনে সে খাওয়াইবে না তো কবে খাওয়াইবে! তপতী টেলিফোনে সকলকে নিমন্ত্রণ করিল এবং মা'কে বলিল,—ওকে বলে দিও মা, সবার সঙ্গে বসে যেন আজ খায়!

মা হাসিয়া কহিলেন,—নিজে বল্‌তে পারিস্ নে খুকী? কি লাজুক মেয়ে তুই?

—না মা, ও ছুঁতো করে এড়িয়ে যায়—জানো তো, কি রকম দুষ্টু!

তপতী চলিয়া গেল। মা'র কাছে তপনের সম্বন্ধে দুষ্টামির আরোপ তাহাকে লজ্জিতই করিয়াছে। তাহার নারী-হৃদয় ঐ কথাটুকু বলিয়াই যে এত তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, তপতী তাহা কখনো ভাবে নাই। হউক লজ্জা, তথাপি তপতীর আনন্দ যেন মাত্রা ছাড়াইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলেই আসিল—আসিল না শুধু তপন। তপতীর প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন,—সাড়ে পাঁচটার আগে সে তো ফেরে না—ঠিক সময়েই ফিরবে।

নিরুপায় তপতী অন্যান্য সকলকে খাইতে দিল। সাড়ে পাঁচটায় তপন আসিতেই মা তাহাকে সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিলেন। তপতী স্বহস্তে পরিবেশন করিল চপ, কাটলেট, ওম্‌লেট ইত্যাদি।

নিরুপায়ভাবে কিছুক্ষণ খাদ্যগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়া তপন কহিল, —মাংস খেতে আমি ভালবাসিনে—আমায় একটু রুটি-মাখন দিলে ভাল হয়!

মা বলিলেন,—একটু খাও বাবা, রুটি-মাখন আজ নাই-বা খেলে। তুমি তো বৌদ্ধ নও যে অহিংস হচ্ছ!

তপন হাসিয়া বলিল,—মাংস না খেলেই অহিংস হয় না মা, মাংস তো খাদ্যই। ও খাওয়ায় হিংসাও হয় না—তবে আমার প্রয়োজনাভাব।

মিঃ ব্যানার্জ্জি তপনকে আক্রমণের জন্য যেন ওৎ পাতিয়া ছিলেন, কহিলেন,—চপ-কাটলেট্-ডিম খাওয়া, কাঁটা-চামচেতে খাওয়া আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ একটা! তপন চুপ করিয়া রহিল। উত্তর না পাইলে মিঃ ব্যানার্জি অপমান বোধ করিবেন ভাবিয়া মা বলিলেন,—ওর কথাটির জবাব দাও তো বাবা!

হাসিয়া তপন বলিল,—'সভ্যতা' কথাটা আপেক্ষিক মা! বিলাতের লোক আমাদের অসভ্য বলে, আমরা আবার আমাদের থেকে অসভ্য বাছাই করে নিজের সভ্যতা প্রমাণ করতে চাই। দেশ আর পাত্র এবং রুচি ভেদে ওর পরিবর্ত্তন হয়।

তপতী এতক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—মানুষকে যুগোপযোগী হতে হবে।

তপন নির্লিপ্তের মত বলিল,—এটাও আপেক্ষিক শব্দ! আমার সমাজে এই যুগেই আমি বেশ উপযোগী আছি, আবার সাঁওতালরা তাদের সমাজে এই বিংশ শতাব্দিতেই বেশ উপযোগী রয়েছে।

—কিন্তু আপনি তো এসে পড়েছেন আমাদের সমাজে! মিঃ অধিকারী ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন।

—আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আজই প্রথম, এর মধ্যে আপনাদের সমাজেই এসে পড়লুম কেমন ক'রে, বুঝলুম না তো?—তপন প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে চাহিল।

—তপতীকে বিয়ে করে!—রেবা উত্তর দিল হাসির মাধুর্য্য দিয়া। তপন কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া কহিল,—আমার ধারণা ছিল, বিয়ে ক'রে মানুষ তার নিজের সমাজেই স্ত্রীকে নিয়ে যায়—আপনাদের বুঝি উল্টটা হয়? জানতুম না তো!

এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি তপতীকে স্পর্শ করিল গভীর ভাবে। জেলিমাখা রুটিটা তপনের দিকে আগাইয়া দিতে দিতে সে কহিল—সব স্ত্রী যদি সে সমাজে না মিশতে পারে? না সইতে পারে সে সমাজকে?

তপন নিঃশেষে বাটির চা-টুকু পান করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল,—সে তবে স্ত্রী নয়, সহধর্ম্মিণী নয়,—সে শুধু বিলাস-সঙ্গিনী। সব স্বামীরও তাকে সইবার ক্ষমতা না থাকতে পারে।

তপন চলিয়া গেল সকলকে নমস্কার জানাইয়া। চির-অসহিষ্ণু তপতী শান্ত স্নিগ্ধ ঔদার্য্যে চাহিয়া রহিল তপনের গমনপথের পানে—দৃষ্টিতে তাহার কোন্ সুদূর অতীত যুগের উজ্জ্বলতা ছড়ানো।

অতিথীদের সকলেই চলিয়া যাইবার পরেও রহিল রেবা, মিঃ ব্যানার্জ্জি মিঃ অধিকারী, মিঃ সান্যাল। তপতী উঠি উঠি করিতেছে, ভদ্রতার খাতিরে পারিতেছে না। মিঃ ব্যানার্জি এবং অন্যরা, যাহারা এতদিন তপনকে পাড়াগেঁয়ে গণ্ডমূর্খ, বর্ব্বর ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিলেন তাঁহারা আজ নিঃসংশয়ে বুঝিলেন, তপন মূর্খ তো নহেই, উপরন্তু উহার কথা বলার কায়দা অসাধারণ। উহারা বেশ বুঝিলেন—তপতী মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। 'কর্ণের' শেষ অস্ত্র ত্যাগের মত মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিয়া উঠিলেন,—পাঁচালি-ছড়া পড়লেও অনেক কিছু শেখা যায়, দেখছি।

মিঃ অধিকারী তাঁহাকে সমর্থন করিয়া কহিলেন,—গোঁড়ামী দিয়েও আধুনিকাদের বশ করা যায়, দেখা যাচ্ছে!

রেবা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল—সুযোগ বুঝিয়া খিলখিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—বশ কাকে হতে দেখলেন আপনারা? কথাটার নূতনত্ব আমাদিগকে একটু চম্‌কে দিয়েছে মাত্র! ভেবে দেখতে গেলে, তপনবাবু সেই প্রাচীন কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরটাই তপতীর ঘাড়ে বসাতে চান—বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ উনি চান, তপতী তার সমাজ, সংস্কার,

শিক্ষা, দীক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়ে ওর সঙ্গে সেই ঘোম্‌টা-টানা বৌ হয়ে থাক। যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড লোকটার!

মিঃ সান্যাল কহিলেন,—নিশ্চয় তাই, নইলে ঐ সহধর্ম্মিনী হওয়ার কথাটা তুলবে কেন? সহধর্ম্মিনীর যুগ আর নেই বাপু, এখন সখীত্বের যুগ চলেছে।

উহারা যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তপতী কোনকথাই বলিল না, যদিও রেবার কথাগুলি তাহার বুকে গভীর আলোড়ন তুলিয়াছে। সকলে চলিয়া যাওয়ার পরেও তপতী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—সমাজ-সংস্কার ছাড়িলে তো তাহার চলিবে না। তপনকে লইয়া কি সে বনে গিয়া বাস করিবে? তপন যদি তাহাদের সমাজে না মিশিতে পারে তবে তো তপতীর পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদের কথা! তপতী প্ল্যান আঁটিয়া রাখিল, আগামী পরশু তাহার সহপাঠিনী টুকুর বিবাহে তপনকে সঙ্গে লইয়া সে বরাহনগর যাইবে। তপনকে তাহাদের সমাজের যোগ্য করিয়া লইতেই হইবে—নতুবা তপতীর উপায় নাই।

নির্দ্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলা তপন খাইতে আসিতেই মা বলিলেন,—আজ খুকীর এক বন্ধুর বিয়ে বাবা, ওর সঙ্গে তোমায় যেতে হবে সন্ধ্যাবেলা—বুঝলে?

তপন ভাতের গ্রাসটা গিলিয়া কহিল,—আমি নাই-বা গেলাম মা! আমার যে অন্যত্র কাজ রয়েছে! আগে বললে সময় করে রাখতাম আমি।

—সে কাজ পরে ক'রো বাবা—মা সস্নেহে আদেশ করিলেন!

—তা হয় না মা, আমি কথা দিয়েছি—আমার কথা আমি রাখবোই। একটা উপহার আমি এনে দেব, আপনার খুকীর সেটা নিয়ে গেলেই হবে, আমার না যাওয়ায় ক্ষতি হবে না।

তপতী আড়ালেই ছিল,—তপন যাওয়াটা এড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া

সম্মুখে আসিয়া বলিল,—'যেতে ভয় করে' বললেই সত্যি বলা হয়। না যাবার হেতু?

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, তপতীর কথাটার জবাবমাত্র না দিয়া সে আঁচাইবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। রুদ্ধ অপমানে তপতীর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া গেল। একে তো আজ যাচিয়া তপনের সহিত যাইতে চাহিয়াছে,—তার উপর মা'কে দিয়া সে'ই অনুরোধ করাইয়াছে, আবার নিজে আসিয়া প্রস্তাব করিল, আর ঐ ইতর কিনা ভদ্রভাবে একটা জবাব পর্য্যন্ত দিল না! তপতীর প্রশ্নটাও যে ভদ্রজনোচিত হয় নাই—ইহা তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। তপনের পিছনে গিয়া সে আদেশের স্বরে কহিল,—যেতেই হবে—বুঝেছেন?

মুখ ধুইয়া মশলা কয়টা মুখে ফেলিবার পূর্ব্বে তপন অতি ধীর শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—যেতে পারবো না—মাফ চাইছি।

উত্তর দিয়াই তপন চলিয়া গিয়াছে। তপতী যখন বুঝিল তখন যুগপৎ ক্রোধ এবং অপমান তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তপন একটি ভেলভেটের কেশে একটি মূল্যবান ব্রোচ কিনিয়া মা'র হাতে দিয়া বলিল.—এইটা নিয়ে গেলেই আমার না যাওয়ার অসৌজন্য হবে না মা; মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আমার না-যাওয়াই ভালো।

—হাঁ, ভালোই—তপতীও তাহা সমর্থন করিল এবং তপনের বদলে তাহার প্রদত্ত উপহারটা লইয়াই বিবাহ-বাড়ী চলিয়া গেল! সেখানে বহু লোকের উপহৃত দ্রব্যের মধ্যে তপনের দেওয়া ব্রোচটা তুলিয়া দেখা গেল, লেখা আছে, "আপনাদের জীবন বসন্তের বনফুলের মত বিকশিত হোক, বর্ষার জলোচ্ছ্বাসের মত পরিপুর্ণ হোক্—শরতের শস্যের মত সুন্দর আর সার্থক হোক।"

তপনের আশীর্ব্বাণী যিনি পড়িলেন, তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। কহিলেন,

—বেশ আশীর্ব্বাদটি, বৎসরের শ্রেষ্ঠ তিনটি ঋতুর আশীষ যেন ঐ কথা কটিতে ভরে দিয়েছে—চমৎকার লাগলো !

তপন না আসার জন্য অনেকেই ক্ষুণ্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাহার আশীর্ব্বাদের প্রশংসা করিল সকলেই। দু'চার জন কিন্তু বলিতে ছাড়িল না—জামাই মূর্খ, তাই তপতী সঙ্গে আনে না; ও আশীষ কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে।

কথাটা তপতী শুনিল, লজ্জায় সে রাঙা হইয়া উঠিতেছে কিন্তু বলিবার মত কথা আজ তাহার জুটিতেছে না। যত শীঘ্র সম্ভব সে পলাইয়া আসিল।

সমস্ত রাত্রি তপতীর ভাল নিদ্রা হইল না। গত সন্ধ্যায় বিবাহ বাড়ীতে সে রীতিমত অপমানিত হইয়াছে। তপন কেন তাহার সঙ্গে গেল না ? ভাল ইংরাজি জানে না সে, নাই বা জানিল ? তপতী সামলাইয়া লইত। মাছ-মাংস খায় না বলিলেই কাঁটা-চামচের হাঙ্গামা ঘটিত না। তপনের না-যাইবার কি কারণ থাকিতে পারে ? কোনদিনই সে কোথাও যায় নাই—অবশ্য তপতীও ডাকে নাই, কিন্তু ডাকিলেও যাইবে না, এমন কি গুরুতর কাজ তাহার থাকিতে পারে ? বিদ্যা তো অতি সামান্য। সারাদিন-রাত্রি কী এতো তাহার কাজ? না-যাইবার অছিলায় সে ঐভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়—কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহে না। তপতী আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল—কতকগুলি পাকা পাকা কথা তপন বলিতে পারে, ভদ্রতা বা অভদ্রতা, অপমান বা সম্মান সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। তাহাকে এই বাড়ীতে থাকিতে হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই। সে বুঝিয়াছে তপতীকে সে পাইবে না, এখন টাকাই তাহার লক্ষ্য !

কিন্তু কাল তো তপতী তাহাকে আত্মদান করিতে প্রস্তুতই ছিল, তথাপি তপন কেন গেল না? তপতীর আন্তরিকতার অভাব সে কোথায় দেখিল!

ভোরে উঠিয়াই তপতী স্নান করিয়া এলোচুল ছড়াইয়া বসিল খাইবার ঘরে। তাহার অঙ্গের স্নিগ্ধ সুরভি ঘরের বাতাসকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। পূজা করিয়া তপন চা খাইতে আসিল! মা দুজনকে খাবার দিয়া বসিয়া আছেন। তপতী যেন আপন মনেই বলিল,—আজ বিকেলে আমি সিনেমায় যাবো, নিয়ে যেতে হবে আমায়।

মা হাসিয়া কহিলেন,—শুনছো বাবা, ওকে আজ যেন নিয়ে যেও!

তপন মৃদুস্বরে কহিল,—আজ থাক মা—আমার ছোট বোনটিকে আজ একটু দেখতে যাব—যদি বলেন তো কাল সিনেমায় যেতে পারি!

রাগে তপতীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তাহার অসংযত মন বিদ্রোহের সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—থাক্, কাল আর যেতে হবে না। বোনকে নিয়েই থাকুন গে—বোনের বাড়ী থাকলেই পারতেন!

মা ধমক দিয়া উঠিলেন,—কী সব বল্‌ছিস খুকী? চুপ কর!

—থামো তুমি মা—কাজিনের উপর অত দরদের অর্থ তুমি বুঝবে না। তুমি থামো!

তপন চায়ের কাপটায় চুমুক দিতে যাইতেছিল—নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—উঠলে যে বাবা, খাও, বসো!

তপন বাহিরে যাইতে যাইতে শুধু বলিল,—আপনার খুকীকে বলে দেবেন মা, আমি আধুনিক যুগের তরুণ নই—আমার বোন বোনই!—তপন সিড়ি দিয়া নীচে নামিবার পথ ধরিল। মা বিপন্না বোধ করিয়া কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

তপতী রুখিয়া নীচে নামিতে নামিতে পিছন হইতে তপনকে বলিল,—যান, চলে যান, আসবেন না আর।

তপন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমি চলে যাই এই কি চান আপনি ?

—হ্যাঁ, চাই—চাই—চাই, আজই চলে যান্, এক্ষুনি চলে যান !

তপনের দুই চোখে সীমাহারা বেদনা ঘনাইয়া উঠিল, নির্ব্বাক স্তব্ধভাবে সে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যঙ্গ করিয়া তপতী বলিল,—দু'লাখ তো নিয়েছেন, আরো কিছু যদি পারেন তো দেখছেন—কেমন ?

বিস্মিত তপনের কথা ফুটিল, কহিল,—শ্যামসুন্দর চাটুজ্যের নাত্নী সামান্য দু'লাখ টাকার সন্ধানও রাখেন দেখছি ?

ক্রোধে আত্মহারা তপতীর আভিজাত্যে আঘাত লাগিল। সক্রোধে সে জবাব দিল,—শ্যামসুন্দরের নাত্নীর বাবাকে কোন জোচ্চোর ঠকিয়ে দু'লাখ টাকা নিয়ে যাবে, এ সে সইবে না, মনে রাখবেন। যাবার আগে টাকাটার হিসেব্ দিয়ে যাবেন যেন ?

উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া তপতী চলিয়া আসিল। মা ভাবিয়াছিলেন, তপতী তপনকে ডাকিতে যাইতেছে, কিন্তু তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া ব্যগ্র ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন,—তপন কৈ খুকী ?

—জানিনে—চুলোয় গ্যাছে ! বলিয়া তপতী আপন ঘরে চলিয়া গেল।

বিপন্না মাতা উহাদের কলহের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। খুকীর ঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কি বলে গেলরে, না খেয়েই গেল যে !

তপতীর রাগ তখনো পড়ে নাই, তথাপি সংযত কণ্ঠেই উত্তর দিল, —আসবে এক্ষুনি—ভাবছো কেন তুমি !

—কি সব বলিস বাপু তুই—রাগের মাথায় ও রকম বিশ্রী কথা কেন তুই বললি খুকী ?

তপতী এবার আর রাগ দমন করিতে না পারিয়া কহিল,—বেশ করেছি, বলেছি ! কী এমন বললাম যে না খেয়ে গেলেন—ভারী তো !

মা ভাবিলেন দম্পতীর কলহ; চিরশান্ত তপন নিশ্চয়ই রাগ করিয়া যায় নাই। কিন্তু ভয় তাঁহার জাগিয়াই রহিল মনের মধ্যে।

বেলা প্রায় বারোটার সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই উৎকণ্ঠিতা তপতী ছুটিয়া গিয়া ফোন ধরিল। মা-ও তখনি আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। তপতী শুনিল, পুরুষকণ্ঠে কে বলিতেছেন—তপনবাবু আজ বাড়ী ফিরিবেন না, কাল সকালে ফিরিবেন।

—কেন? কোথায় থাকবেন? তপতী প্রশ্ন করিল।

কিন্তু উত্তরদাতা ফোন ছাড়িয়া দিয়াছে।

মা ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন,—কে ফোন ক'রছে রে? তপন?

—হ্যাঁ, আজ আসবে না, বোনের বাড়ী থাকবে,—বলিয়া তপতী চলিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ফিরিয়া কহিল,—রাগ করেনি মা, কাল ঠিক আসবে, আমায় বললে; ভেবো না তুমি!

মা নিশ্চিন্ত হইলেন কিনা বোঝা গেল না কিন্তু তপতী ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল, কোথায় আর যাইবে, যাইবার জায়গা তো ঐ ফুটপাত, আর তপতীরই বাপের দুই লক্ষ টাকা—টাকার হিসাব দিতে হইলেই চক্ষু চড়কগাছ হইয়া যাইবে। ও ভাবিয়াছে, 'যাইবে', বলিলেই তপতী ভয়ে কাঁদিয়া পড়িবে পায়ে! তপতীর অদৃষ্টে তাহা কখনো লেখে নাই, কিছুতেই না! তপতীর হাসি পাইল। তাহার পিতামহের গোঁড়ামী কম ছিল না—কিন্তু তাহার পিছনে ছিল যুক্তি,—তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। আর তপন কতকগুলি বাছা বাছা বুলি কপচাইয়া ভাবিয়াছে, তপতীর অন্তর জিনিয়া লইল! অত সহজ নয়—তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না!

বিকালে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া তপতী মিঃ ব্যানার্জি ও মিঃ সান্যেলের সহিত বেড়াইতে বাহির হইল যথারীতি!

পরদিন সকালেই তপন ফিরিয়া আসিল ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখশ্রী লইয়া।

তপতীর সহিত তাহার কি কথা হইয়াছিল, মা কিছুই জানিতেন না, তিনি তপনকে স্বাগত সম্ভাষণে সস্নেহে বলিলেন,—শরীর ভালো তো বাবা—বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে ?

—হাঁ, মা, শরীর ভালই আছে—খেতে দিন কিছু—বলিয়া তপন খাইতে বসিল।

তপতী আপন ঘরে বসিয়া দেখিল, তপন ফিরিয়াছে এবং নির্লজ্জের মত খাইতেছে। অদ্ভুত এই লোকটা! এতবড় অপমান করার পরেও সে নির্ব্বিকার? কোন্ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এইরূপ অপমান সহিতেছে, তপতীর আর তাহা অজানা নাই। ভাল, উহার ভণ্ডামীর শেষ কোথায় দেখা যাক্।

দিন দুই তপনের আর কোন খোঁজ না-লইবার ভান করিল তপতী। সে দেখিতে চাহিতেছে, তপনের দিক্ হইতে কোন আবেদন আসে কি না। কিন্তু তপন পূর্ব্বের মতই নির্ব্বিকার, আসে, খায়, চলিয়া যায়। তৃতীয় দিনে তপতী ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এমন করিয়া সে আর পারে না। তপন আসে, খায়, মার সহিত পূর্ব্বে দুই একটা কথা যাহা কহিত তাহাও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দুইদিন তপতী সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে, সুবিধা হয় নাই। তপন যেন আপনাকে একেবারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—অথচ নির্লজ্জের মত খাওয়া আর থাকাটা তো তেমনই রহিল। এতই যদি উহার সম্মান-জ্ঞান তবে চলিয়া গেল না কেন? তপতী নিশ্চয় জানে যে-কোন লোক—নিতান্ত অপদার্থও, এই অপমানের পর চলিয়া যাইত। তপনের না-যাওয়ার কারণটা এতদিনে বেশ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তপতী সেদিন আগুনের খেলা খেলিয়া বসিল।

মিঃ ব্যানার্জিকে লইয়া সিড়ির পাশের ঘরে একটা সোফায় তপতী বসিয়া

বেহালা বাজাইতেছে—তপন এখনি আসিবে, তাহাকে দেখানো দরকার যে, তপনের থাকা-না-থাকায় বা রাগ-অভিমানে তপতীর কিছুই আসে যায় না।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় তপন প্রবেশ করিল। মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন, —ভাল আছেন? টিকিই দেখা যায় না যে!

—টিকি নেই, ধন্যবাদ—বলিয়াই তপন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, তপতী বেহালার ছড়িটা দিয়া তপনকে খোঁচাইয়া কহিল, —ভদ্রভাবে জবাব দিতে পার না, উল্লুক!

—আঃ! করেন কি মিস্ চ্যাটার্জি! বলিয়া মিঃ ব্যানার্জি তাহার হাতটা ধরিলেন!

তপন চোখের কোনে দৃষ্টিপাতও করিল না, ধীরে ধীরে সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে—শুনিতে পাইল, তপতী বলিতেছে—ওকে লাথি মারলেও যাবে না, জুতো মারলেও যাবে না—সত্যি কি না, মেরে দেখুন!

তপনের হৃদ্‌পিণ্ডে কে যেন একসঙ্গে লক্ষ হুল ফুটাইয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে সিড়ির কয়েকটা ধাপ নামিয়া আসিয়া তপন পূর্ণ দৃষ্টিতে তপতীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনি কি আমার কাছে মুক্তিই চাইছেন?

তপতী নিজের মাথাটা মিঃ ব্যানার্জির কাঁধে রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, —চাইছি, দাও তো! দেখি তোমার কত ঔদার্য্য!

—সত্যি চাইছেন?—তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল।

মিঃ ব্যানার্জির একখানা হাত নিজের মসৃণ ললাটে ঘসিতে ঘসিতে তপতী ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—হাঁ—হাঁ—হাঁ—চাইছি—দাও আমায় মুক্তি! পারবে দিতে?

—দিলাম! আজ থেকে আপনি মুক্ত, আপনি স্বতন্ত্র, আপনি স্বাধীন।

তপন সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তপতীর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল—ঐ অদ্ভুত লোক, যে দুই টাকার পাখী চার টাকায় কিনিয়া আকাশে

উড়াইয়া দেয়, সে তাহাকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া গেল। তপতীর সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। না—না—না, তাহা কি হইতে পারে? তপতীকে সে বিবাহ করিয়াছে! এত সহজে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। ওটা একটা কথার কথা। ও তো এখনি আবার বাহিরে যাইবে, তখন জিজ্ঞাসা করিবে তপতী, দুই লক্ষের উপর আরো কত টাকা সে গুছাইয়াছে।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—লোকটার ধাপ্পা দেবার শক্তি অসাধারণ!

তপতী এতক্ষণে আবিষ্কার করিল, সে এখনো মিঃ ব্যানার্জির কোলে পড়িয়া আছে। এখনি কেহ দেখিয়া ফেলিবে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাজনাটা লইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ অতীত হইল, তপন নামিতেছে না কেন? আজ আর বাহিরে যাইবে না না-কি? আগ্রহান্বিতা তপতী একটি ছুতা করিয়া উপরে গিয়া দাঁড়াইল তপনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের জানালা-পার্শ্বে। দেখিল পরম বিস্ময়ের সহিত, তপন,—ভণ্ড, অর্থলোভী তপন উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে তাহার পূজার বেদীমূলে! উহার হইল কি? ও কি এমনি ভাবে কাঁদিয়াই তপতীকে হার মানাইবে? এখনি মা দেখিবেন, বাবা জানিতে পারিবেন, একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়া যাইবে! তপতীর ভয় করিতে লাগিল। এত অপমানেও যাহার এতটুকু বিমর্ষতা তপতী দেখে নাই, আজ অতি সামান্য কারণেই সে কেন কাঁদিতেছে! ওঃ! তপতী মিঃ ব্যানার্জির কোলে শুইয়াছিল বলিয়া উহার 'জেলাসি' জাগিয়াছে! নিশ্চয়ই। হাসিতে তপতীর দম আটকাইয়া যাইবার যো হইল। মিঃ ব্যানার্জি! যাহাকে তপতী জুতার ডগায় মাড়াইয়া চলে! নীচে না গিয়া আপন ঘরে আসিয়া তপতী খুব খানিক হাসিল—ঐ লোকটাও তবে 'জেলাস' হইতে পারে! আশ্চর্য্য! উহার-ও এ বোধ আছে না কি। থাকিবে না কেন! ও তো নির্ব্বোধ নয়। আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপমান

সহ্য করিতেছে! তপতীকে ও নাকি স্বেচ্ছায় মুক্তি দিবে! তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। ভালই হইয়াছে; ঈর্ষায় উহার অন্তরটাকে তপতী ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবে। দেখিবে তপতী—কত সহ্য শক্তি উহার আছে।

তপতী মা'র কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তপন এখনো ফিরছে না কেন রে—জানিস কিছু?

মা জানেন না—তপন ফিরিয়াছে। নিঃশব্দে আসিয়া তপনের দরজায় তপতী একটা জোর ধাক্কা দিল। তপন সম্বিত লাভ করিয়া যখন চোখ-মুখ মুছিয়া বাহিরে আসিল তখন তপতী সরিয়া গিয়াছে। মা'র সহিত কি কথা হয় শুনিতে হইবে, তপতী আড়ালে দাঁড়াইল। মা তপনের মুখ দেখিয়া বলিলেন,—কী হোল বাবা! মুখ তোমার·········

—বিশেষ কিছু না মা, দিন খেতে দিন।

খাবার দিতে দিতে মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যি বলো বাবা, কি তোমার হয়েছে—বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়!

—এক জায়গায় একটু আঘাত পেয়েছি মা—তা প্রায় সামলে নিলাম।

—কী আঘাত বাবা, কোথায় আঘাত লাগলো? মা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

—শারীরিক না মা—মানসিক; শারীরিক আঘাত আমি সবই প্রায় সইতে পারি মা মানসিক সব আঘাত এখনো সইতে পারি না, তবু সয়ে যাবো মা! আমার অন্তর—"নহে তা পাষাণ মত, তা'হলে ফাটিয়া যেতো···"

বুকের গভীর দীর্ঘশ্বাসটা তপন কিছুতেই চাপিতে পারিল না।

এত কি হইয়াছে! তপতী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মা প্রায় কান্নায় ভরা কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—হাঁ বাবা, খুকী কিছু ব'লেছে?

—থাক্ মা—সব কথা মা'দের বলা যায় না—দিন চা আর একটু!

মা নিশ্চিত বুঝিলেন, খুকী তাঁহার কিছু বলিয়াছে। নতুবা তপন তো কোন দিন এমন বিহ্বল হয় নাই। আশ্চর্য্য চরিত্র ঐ ছেলেটির। তপন

চলিয়া গেলে মা তপতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কী তুই বলেছিস বল খুকী, আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে !

—ভাবনার কিছুই নাই। তোমার অপদার্থ জোচ্চোর জামাইকে ঠেঙালেও তোমার বাড়ী ছেড়ে যাবে না—ভয় নেই তোমার—!

—খুকী !—মা ধম্‌কাইয়া উঠিলেন !

একটা সামান্য ব্যাপারকে এতখানা বাড়াইয়া তোলার জন্য তপনের উপর তপতী তিক্তই হইয়াছিল। মা'র ধমক খাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উত্তর দিল,—ওকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি—শুন্‌লে !

তপতী চলিয়া গেল। নিঃসহায় মাতা বি-এ পাশ মেয়ের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত বিস্ময়ে বসিয়া রহিলেন।

শরাহত বিহঙ্গীর ন্যায় ব্যথিত-হৃদয়ে শিখা ও মীরা শুনিল তপনের মুখে তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কাহিনী। মীরা উদাস দৃষ্টিতে দাদার মুখের পানে চাহিয়া আছে, আর শিখার দুই গণ্ড বহিয়া নামিয়াছে অশ্রুর বন্যা ! শিখাই কথা কহিল,

—তা হ'লে তোমার জীবনটা একেবারে পঙ্গু হ'য়ে গেল দাদা ?

—না ভাই, এই-ই ভালো হ'য়েছে। আজ ঈশ্বরকে বলতে ইচ্ছে ক'রছে—,

"এই করেছো ভালো······
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো ;
আমার এ ধূপ না পোড়ালে······ "

শিখা তপনের ব্যথা-করুণ গান সহিতে পারিল না, মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল থামো দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, থামো ! তামার ঈশ্বর তোমার থাক—আমাদের তাঁকে দরকার নেই। যে নিষ্ঠুর বিধাতা পবিত্র

জীবনকে এমন করে নষ্ট—শিখা আর বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মীরা কহিল,—চুপ কর শিখা—মানুষের কান্নায় ভগবান অবিচল। তাঁর কাজ তিনি করবেনই!

বিনায়ক দূরে বসিয়া উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল আগাইয়া আসিয়া বলিল,—তাহলে কবে যাচ্ছিস্? একুশেই যাবি তো?

—হাঁ ভাই। আমি না ফেরা পর্য্যন্ত তোদের কাজ যেন ঠিক চলতে থাকে!

মীরা জিজ্ঞাসা করিল,—সেখানে তোমার কত দেরী হবে দাদা?—খুব বেশী?

—তা জানিনে বোন্‌টি। এখন আমার কাজ সহজ হ'য়ে গেছে। আর তো কোন বন্ধন নেই। মুক্তি সে স্বেচ্ছায় চেয়ে নিল—তোরা সুখে আছিস—আমি এবার সেখানে যতদিন থাকি না—খবর দেবো তোদের—ভাবনা কেন?

মীরা চুপ করিয়া রহিল। শিখা পুনরায় প্রশ্ন করিল ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে,—তুমি কি তবে দেশান্তরী হয়ে যাবে দাদা?

—না বোন্‌টি! আমার মাতৃভূমি বাংলা ছেড়ে যাবো কোথায়! আমি একনিষ্ঠা পত্নী চেয়েছিলাম—নিজে হয়তো একনিষ্ঠ হ'তে পারিনি—তাই বঞ্চিত হলাম। এবার যোগ্য হ'তে হবে।

—তুমি কি তা'হলে তপতীকে এখনও ভালবাসো দাদা?

—বাসি—আত্মবঞ্চনায় কোন লাভ নেই। ভালবাসি বলেই তাকে অত সহজে মুক্তি দিতে পারলুম। তার বুকের বোঝা হ'য়ে আর থাকতে ইচ্ছে করলো না। আমার মনের আসনে ওর স্মৃতি আমি বহন করবো শিখা, আমার চোখের জলে নিত্য ধুইয়ে দেবো সেই আসন।···

—ও যদি আবার তোমায় ফিরে চায় দাদা?—মীরা প্রশ্ন করিল তপনকে!

—সে আর হয় না বোনটি। আমার সত্য চিরদিন অবিচল। কিছুর জন্য সে ভাঙে না। কিন্তু তোরা এমনি বসে থাকলে কি করে চলবে রে! চল্ সব, কাগজপত্রগুলো ঠিক করে ফেলি। বিনায়ক—তুই তোর কারখানা চালা ভাই, আমি আমার কাজের মধ্যে আত্মবিসর্জন করবো এবার!

বিনায়ক নত মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল।

শিখা বলিল,—তোমার কাজটা কি দাদা?

—মানুষ গড়ার কাজ বোনটি—তোদেরও সাহায্য চাই। পৃথিবী থেকে মানবতার সাধারণ সূত্রটি লোপ পেতে ব'সেছে। আমি শুধু দেখিয়ে দিতে চাই, পশু থেকে মানুষ কোথায় ভিন্ন! পাশবত্ব আর মানবত্বের মাঝখানে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান রেখা র'য়েছে তাকেই স্পষ্টতর করা হবে আমার কাজ!

—তোমার 'জ্যোতির্গময়' বইখানা হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে পুরস্কার পেল, আর বাংলাদেশ মোটে বুঝলোই না—এদেশের মানুষকে কি দিয়ে তুমি গড়বে দাদা?

—বিদেশ থেকেই গড়া আরম্ভ করবো! যে-কোন বিষয়কে অশ্রদ্ধার চোখে দেখা বাঙালীর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এ স্বভাব সহজে যাবার নয়। কিন্তু আয় তোরা। তপন সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল।

বিনায়ক মৃদুস্বরে কহিল,—আমিও সঙ্গে গেলে হোত না তপু? একা যাবি অতদূর?

—হাঁ, একাই যাবো—সঙ্গী যার হবার কথা ছিল সে যখন সরে গেল···!

শিখা আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার নারীচিত্ত তপনের বেদনার গভীরতাকে মাপিতে পারিতেছে না। শান্ত শুদ্ধ তপন বারম্বার বিচলিত হইয়া উঠিতেছে কোন্ অসহনীয় যন্ত্রণায়, শিখা যেন তাহা নিজের বুকেই অনুভব করিতেছে।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে সে কহিল,—লক্ষ্মী দাদা আমার, আজন্ম ব্রহ্মচারী তুমি—আমাদের ভগ্নীস্নেহ নিয়েই কি তুমি চালাতে পারবে না?

—ঠিক চলে যাবো দিদি, কিছু না থাকলেও চলতো; নিরবধি কাল কোথাও আটকায় না!

—কিন্তু তুমি বড্ড ব্যাথা পেয়েছ দাদা?

—নিজের জন্য নয় বোনটি—ওরই জন্য। ও কেমন করে এত বড় জীবনটা কাটাবে!

—ও আবার বিয়ে করবে!

—আহা, তাই করুক—ও বিয়ে করে সুখী হোক শিখা, আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করছি।

—কিন্তু দাদা, তুমি এবার আত্মপ্রকাশ করো—ও বুঝুক, কি ধন হারালো!

—ছিঃ বোনটি! ওর উপর কি আমার প্রতিহিংসা নেবার কথা? ও যে আমার—এ কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি।

—তা'হলে তুমি মুক্তি দিলে কেন দাদা? তোমাকেই-বা ও চিনলো না কেন?

—ওর শিক্ষা ওকে বিকৃত করেছে শিখা, মুক্তি না দিলে ও কোনদিনও আমায় চিনবে না। অনেক দিন তো অপেক্ষা ক'রে দেখলাম। ওকে ওর মা-বাবা যে ভাবে গড়েছেন, তেমনিই তো সে চলবে। তবে সে যদি আমার হয় তা'হলে আমি তাকে পাবোই একটা জন্ম কেন, তার জন্য লক্ষ জন্ম আমি অপেক্ষা করতে পারবো।

—তুমি তা'হলে আত্মপ্রকাশ করবে না?

—না—তাহলে তো এখুনি ও আমায় চাইবে। আর সে চাওয়া হবে আমাকে নয়, আমার মর্য্যাদাকে! তেমন করে ওকে পেতে আমি

চাইনে। আমি দরিদ্র তপন, মূর্খ তপন, ভণ্ড এবং অর্থলোভী তপন, এই তার ধারণা। এ ধারণাটা বদলাবার চেষ্টাও সে করলো না ; কারণ, সে সর্ব্বান্তকরণে আমাকে অমনি ভেবে ত্যাগ করতে চায়।

—বিয়ে যদি না করে ? শ্যামসুন্দর চাটুজ্যের নাত্নীর দ্বিতীয় বিবাহ সহজ হবে না !

—আমি তার কি করবো শিখা ! আর কঠিনই-বা কেন হবে ? ওর বাবার একমাত্র মেয়ের সুখের জন্য নিশ্চয় তা করবেন। তবে তপতী যদি নিজেই বিয়ে না করে তো অন্য কথা।

—তা' হলে কি ক'রবে তুমি ?

—কিছু না শিখা—আমার সঙ্গে তার এ জন্মের সম্বন্ধ চুকে গেছে। আমি কায়েন-মনসা কথা বলি···ছলনা করে মুক্তি দেবার ভণ্ডামী আমি করি না। প্রয়োজন হলেই রেজিষ্টারী করে দেব।

সকলে অফিস ঘরে আসিল।

স্নেহাস্পদ জামাতাকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলায় মা যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হইয়াছেন, তপতীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তপন তো সত্যই চলিয়া যাইতেছে না ! আশ্চর্য্য, এত বড় অপমানটা সে সহিয়া গেল ! যাইলেই বরং তপতী বাঁচিয়া যাইত। বিদেশে থাকিলে লোকের কাছে তবু বলা যায়, বাড়ীতে নাই। ঘরে থাকিয়াও পার্টিতে যোগ না দিলে লোকে যে কথা বলে ! পার্টিতে যোগ দিবার যোগ্যতা যে উহার নাই, লোকে তো তাহা বুঝে না।

তপতী স্থির করিল, তপনকে অপমান সে আর করিবে না, যাহা খুসী করুক, তপতীর অদৃষ্টে স্বামী সুখ নাই—কি আর করা যাইবে ! তপনকে লইয়া ঘর করা তাহার অসাধ্য !

তপতী তিন চার দিন একবারও এদিকে আসে নাই। তপন নিয়মিত সময়ে আসে, খায়, এবং চলিয়া যায়—ইহার সংবাদ তপতী রাখিয়াছে। ঐ নির্লজ্জ লোকটা আবার মুক্তি দিবার ছলে তাহাকে শাসাইতে আসে, বলে,—তুমি মুক্ত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র। লজ্জা বলিয়া কোন বস্তু কি উহার অভিধানে একেবারে লেখে না! কিন্তু সেদিন অত কাঁদিল কেন? তপতী উহার কোনই কিনারা করিতে পারিল না ভাবিয়া।

পঞ্চম দিন সকালে সে আসিয়া মা'কে বলিল,—আমি তাহ'লে আজই ভর্ত্তি হচ্ছি গিয়ে মা এম-এ ক্লাসে।

তপন খাইতেছিল! মা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কি বল বাবা তপন?

তপন উত্তর দিল,—আমার মতের কি মূল্য মা! ওঁর যা ইচ্ছে ক'রবেন। তবে অর্থাভাবে আমি পড়তে পারিনি, অর্থ থাকতেও কেউ না পড়লে আমার দুঃখ হয়।

—না বাবা, পড়ুক—বলিয়া মা তপতীকেও খাইতে দিলেন।

তপতী ভাবিতে লাগিল, সে পড়িবে শুনিয়া তপন খুসীই তো হইল! পড়াশুনার দিকে উহার আগ্রহ বেশই আছে। মা'কে বলিল,—আমার ক'খান বই কিনিতে হবে মা—দোকানে একা যেতে চাইনে!

—বেশ তো, তপন সঙ্গে যাক্—যাও তো বাবা ওর সঙ্গে একটু। গাড়ী বার কর।

—আচ্ছা মা যাচ্ছি—বলিয়া তপন উঠিল! গ্যারেজ হইতে গাড়ী আনিয়া দাঁড় করাইল। বেশ-বাস করিয়া তপতী আসিয়া উঠিল তপনের পাশেই। তপন নীরবে গাড়ী চালাইতেছে। মুখে তো কথা নাই-ই, এমন কি মুখখানা যথা সম্ভব নীচু করিয়া এবং ঘাড় ফিরাইয়া রহিয়াছে। তপতী নির্ণিমেষ নেত্রে তাহার লতানো চুলগুলার পানে চাহিয়া রহিল। নাঃ, তপন মুখ তুলিল না। গাড়ী গিয়া দাঁড়াইল পুস্তকের দোকানের

সামনে, তপতী নামিয়া দোকানে ঢুকিল, তপন বসিয়া রহিল গাড়ীতেই। বই কিনিয়া তপতী ফিরিয়া আসিল! গাড়ীতে বসিয়াই বলিল,

—একটু মার্কেটে দরকার ছিল।—কথাটা বাতাসকে বলা হইলেও তপন মার্কেটের সম্মুখে গাড়ী থামাইল। নামিয়া তপতী পিছন পানে চাহিল, ইচ্ছা, তপনও আসুক। কিন্তু ডাকিতে তাহার লজ্জা করিতেছে। এত কাণ্ডের পর তপনকে ডাকা সম্ভব হয় কেমন করিয়া। দোকানে ঢুকিয়া সে একটা কর্ম্মচারীকে বলিল তপনকে ডাকিয়া আনিতে। তপন গাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তপতী সাহস করিয়া কহিল একটা কর্ম্মচারীকে—কোন্ সেণ্ট্‌টা নেবো ওঁকে দেখান তো?

তপন নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল,—ও সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

আচ্ছা লোককেই তপতী সেণ্ট বাছাই করিতে বলিতেছে। তপতীরই বোকামী! একটা 'লিলি' লইয়া সে ফুলের দোকানে আসিল, পিছনে তপন। বিক্রেতা তপতীকে চেনে, বলিল,—আসুন আসুন, কী ফুল দেবো? একটা ভাল গোড়ে দিই 'যুঁই'এর?

—দিন, ভাল ফুল তো? বাসি হবে না নিশ্চয়ই?

—আপনাকে দেবো বাসি ফুল! সেদিনকার মালাটা কি বাসি ছিল?

তপতী লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেই যে সে এখানে মালা কিনিয়াছে, তপন তাহা বুঝিতে পারিল। বেশী কথা না বাড়াইয়া সে মালা চাহিল এবং আড় চোখে তপনের দিকেই চাহিল। তপন নির্ব্বিকার নিশ্চল দাঁড়াইয়া, মুখের ভাব তেমনি, চোখে ঠুলি। মালাটা তপনের হাতে দিতে বলিয়া তপতী আগাইয়া গেল গাড়ীর দিকে। কাগজ দিয়া মালাখানি জড়াইয়া দিলে তপন তাহা আনিয়া তপতী ও তাহার মধ্যেকার স্থানে রাখিয়া গাড়ী চালাইল। তাহার মুখের ভাবের

কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই—কপালে এতটুকু কুঞ্চন রেখা পড়ে নাই। গতিশীল গাড়ীটাকে নিরাপদে লইয়া যাইবার জন্যই যেন তাহার সব মনটাই সংযুক্ত। তপতী আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এতক্ষণ তপতী পাশে বসিয়া আছে, তপন একবার চাহিল না পর্য্যন্ত! এতটা ঔদাসিন্যের হেতু কি? কিম্বা উহার স্বভাবই এমনি! তপতীকে একবার দেখিলে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। এ খবর তপতীর অজানা নাই; কিন্তু এই লোকটার কি তপতীকে দেখিতেও কিছুমাত্র আগ্রহ জাগে না! কিম্বা সেদিনকার ব্যাপারটায় এখনো সে রাগ করিয়া আছে।

গাড়ী আসিয়া পৌছিল। তপতী নামিয়া যাইতেই তপন দারোয়ানকে কহিল—"আমি একটা নাগাদ ফিরবো, মাকে বলো।" সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল পায়ে হাঁটিয়া; ট্রামে চড়িবে হয়ত। তপতীর হাতের মালাটা তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। কি করিবে সে উহা লইয়া আর! তপনকে দিবার জন্য সে উহা কেনে নাই, কিন্তু গাড়ীতে আসিবার সময় ইচ্ছা হইয়াছিল—মালাটা উহাকেই দিবে এবং ফেরৎ পাইবে, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। মালা লইয়া আজ আর করিবে কি সে? এখনি কলেজে যাইতে হইবে।

ওবেলা দেখা যাইবে ভাবিয়া তপতী মালাটা রাখিয়া আহারান্তে কলেজে চলিয়া গেল। তপন তাহার দেওয়া মালার কদর কি বুঝিবে ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু বারম্বার মনে হইতেছে—না বুঝিবার কারণ নাই। তপন অশিক্ষিত নয়—বরং অনেকের চেয়ে বেশী শিক্ষিত।

এই কয়েক মাসের ঘটনাগুলা আলোচনা করিতে গিয়া তপতীর ভয় করিতে লাগিল। কী দুঃসহ অপমানই না তপতী করিয়াছে তপনকে! ও যদি একটু রাগিয়াই থাকে, তাহাতে অন্যায় কিছু হইবে না। কিন্তু রাগিয়াছে কি না তাহারই বা প্রমাণ কৈ?

বৈকাল বেলা তপতী মা'র কাছে আসিয়া খাবার তৈরী করিতে বসিল। বহুদিন আসে নাই—মা যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, তপনকে খাওয়াইবার জন্যই খুকী তাঁহার রান্নাঘরে আসিয়াছে। মা তাহাকে নিরামিষ চপ্-কাটলেট তৈরীর মশলা যোগাইয়া দিলেন। তপনের জন্য রান্না করিতে তপতীর লজ্জা করিতেছিল, তাই বলিল, —মিঃ বোসকে আসতে বলেছি মা, একটু আমিষও রাঁধবো!

মা বিষাদিতা হইয়া উঠিলেন। খুকী আজো তপনের জন্য কিছু করে না। কিন্তু তাঁহার কি-ই বা বলিবার আছে। তপতী রান্না চড়াইয়া লুকাইয়া মিঃ বোসকে ফোন করিল চা খাইতে আসিবার জন্য!

মিঃ বোস আসিবার পূর্ব্বেই আসিল তপন। মা বলিলেন,—বোস সাহেব তো এখনো এলো না খুকী, তপনকে খেতে দে।

—এখনি এসে পড়বে মা—একটু বসতে বল—তপতী আব্দার ধরিল। তপন কিছুই বলিল না। নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মিঃ বোস আসিতেই সুসজ্জিত তপতী সকালের মালাটা বাঁ-হাতে জড়াইয়া বাহিরে আসিল নমস্কার করিতে। মিঃ বোস নমস্কার করিয়া বলিলেন হাসিমুখে,—সুন্দর! আপনাকে এমন চমৎকার মানিয়েছে আজ!

—বসুন, বসুন। ওসব বাজে কথা কইতে হবে না—বলিয়া তপতী একটা কৃত্রিম ধমক দিয়া খাবারের প্লেট আগাইয়া দিল দুজনকেই! তপন নীরবে নত মুখে একটুকরা ভাঙ্গিয়া যেন চুষিতে লাগিল। মা চলিয়া গিয়াছিলেন—তপতী নিজেই যখন খাওয়াইতেছে, তখন তাঁহার আর থাকার কি দরকার! তপতী লক্ষ্য করিল তপনের না-খাওয়া। মিঃ বোস নানা কথা বলিতেছেন. হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাঙ্গিল, এমন ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—ওঃ নমস্কার! সেদিনকার ব্যবহারটার জন্য আমি লজ্জিত—মাফ্ করুন।

বিস্মিত তপন বলিল,—মাফ্ চাওয়ার কি কারণ ঘটলো, বুঝলাম না তো!

—সেদিন না-জেনে আপনাকে একটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছিলাম!

—ওঃ, সেই 'ইডিয়ট্'! তাতে কি হ'য়েছে! আমি কিছু মনে করিনি। নমস্কার।

তপন উঠিয়া পড়িল; তপতী ভাবিতে লাগিল, তপনের জন্য খাবার করিতে আসিয়া সে তপনের অসম্মানকারীকেই তাহার সঙ্গে খাইতে বসাইয়াছে; কথাটা তপতীর আদৌ মনে ছিল না। মিঃ বোসকে না ডাকিলেই হইত। তপন হয়ত সেই জন্যই খাইল না।

মা আসিয়া দেখিলেন, তপন চলিয়া গিয়াছে। বলিলেন,—কিছুই যে খায়নি রে! ওসব ভালবাসে না তপন। রুটি-জেলি দিলিনে কেন?

তপতীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মিঃ বোস বলিলেন,—খেতে শেখান মাসিমা—মেয়েকে যে জলে ফেলে দিয়েছেন!

রাগে মা'র সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে তিনি শুধু চুপ করিয়া রহিলেন।

তপতী কিন্তু কহিল—থাক্—আপনাদের তুলতে ডাকা হবে না!

নিজে তপতী ভাবিতেছে, তাহাকে জলেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অন্যের মুখে সে-কথা তপতী আর শুনিতে চাহে না।

মিঃ বোস শোধরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন,—কথাটা আমি খারাপ ভেবে বলিনি—আহার-বিহার, আচার-আচরণ না শিখলে সমাজে মিশবেন কি করে? তার জন্যই বলছিলাম।

মিঃ বোস অতিথি, তাই তপতী চুপ করিয়াই রহিল, কিন্তু আজ তাহার মনে হইতেছে, পরের মুখে তপনের নিন্দা শুনিতে তাহার আর ভাল লাগে না।

অসুস্থতার ছুতা করিয়া তপতী মিঃ বোসের সহিত সেদিন আর বেড়াইতে গেল না।

তপনের মনের গঠন হয়ত কিছু অদ্ভুত। সে কোনদিন কাহাকেও আঘাত করে না—এমন কি, আঘাতের প্রতিঘাতও করে না। ইচ্ছা করিলে তপতীকে সে আঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু, কাহাকেও আঘাত দিয়া কিম্বা জোর করিয়া ভালোবাসা আদায় করিবার লোক তপন নহে। সে আপনাকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে বিকশিত করিতে চায়—ইহাই তাহার সাধনা। তাহার বিষয়-বৈরাগী মন শুধু চাহিয়াছিল একজন সাথী, যাহাকে সে জীবনের পথে দোসর ভাবিতে পারে। কিন্তু অদৃষ্ট তাহার অন্যরূপ। দুঃখ সে পাইয়াছে কিন্তু সে-দুঃখ সহিবার শক্তিও তাহার আছে।

আজ রিক্তসর্ব্বস্ব হইয়া তপনের মন প্রসারিত হইয়া পড়িল জনকল্যাণের বিপুলায়তনে। মুক্তির মধ্যে সে খুঁজিয়া পাইল বন্ধনের ইঙ্গিত। সকালে খাইতে বসিয়াই তপন কহিল,—আমি একুশে শ্রাবণ একটু মাদ্রাজের ওদিকে যাব মা, কন্যাকুমারিকা তীর্থের দিকেও যেতে হবে।

—মাদ্রাজ? অতদূরে কি তোমার কাজ বাবা? মা ম্লান মুখে প্রশ্ন করিলেন!

তপন হাসিয়া বলিল,—দূর আর কোথায় মা?—তারপর একটু থামিয়াই বলিল,—'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,

রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি!'

তপতীও চা খাইতেছিল। কথাটা শুনিয়া সে কিছু উন্মনা হইয়া পড়িল।

—কতদিন দেরী করবে বাবা? মা সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন।

—দেরী একটু হবে বৈকি মা—কাজটা শেষ করবো তবে তো!

আর কোন কথা না বলিয়া তপন চা পান শেষ করিল এবং উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

তপতী একটু ইতস্ততঃ করিয়া মা'কে জিজ্ঞাসা করিল,—ও মুখ্যু মানুষ, মাদ্রাজ গিয়ে কি করবে মা? আমাদের অফিসের কাজ কিছু?

—কি করে জানবো বাছা, তুই তো জিজ্ঞেস করলেই পারিস। আর মুখ্যু ও মোটেই নয়, এটা এতদিনেও বুঝতে পারলিনে তুই! তোর বাবা ওর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তপতী চুপ করিয়া রহিল। মা বিরক্ত হইয়াছেন। আর কোন কথা না বলাই উচিত। তপন যে মূর্খ নয়, ইহা তপতীও জানে, আর জানে, মাদ্রাজ যাওয়ার অছিলায় আরো কিছু টাকা তপন বাগাইবে। তা নিক, টাকা তাহার বাবার যথেষ্ট আছে, তপন তো সকলেরই মালিক হইবে একদিন। কিম্বা হয়ত সত্যই কোন কাজ আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তপতী কহিল,—আমায় আজ একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে বোলো মা। আমি বললে ও এড়িয়ে যায়।

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা বলে দেবো কিন্তু এড়িয়ে যেতে দিস্ কেন তুই?

উত্তর না দিয়া তপতী চলিয়া আসিল আপন ঘরে। বিকালে সে আজ তপনকে লইয়া বেড়াইতে যাইবে। দেখিবে তাহার অন্তরে তপতীর স্থান কোথায়। বৈকালিক জলযোগের জন্য তপন আসিবার পূর্ব্বেই তপতী রক্তাম্বরা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তপন আসিতেই মা তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলেন,—খুকী বললে তুমি নাকি এড়িয়ে যাও বাবা—তাই আমায় দিয়ে বলাচ্ছে।

—আচ্ছা মা, যাচ্ছি। আমার কাজ থাকে, দু'একদিন আগে বললে সময় করে রাখি!

তপন গিয়া গাড়ীতে বসিল—তপতী আসিয়া বসিল পাশে। গাড়ী চলিতেছে। নির্ব্বাক তপন চোখের ঠুলিটার মধ্য দিয়া সোজা সামনের রাস্তায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—বামে যে একটা সুসজ্জিতা নারী অপেক্ষা করিতেছে, তাহার অস্তিত্বও যেন তপন ভুলিয়া গিয়াছে। তপতী উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। সোজা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার বাধিতেছে, কথাই বা কহিবে কিরূপে! যাহাকে সে অপমানে, আঘাতে বিদলিত করিয়া দিয়াছে, তাহার সহিত এভাবে বেড়াইতে আসাই তো চরম নির্লজ্জতা! কিন্তু তপন তো আসিল, এতটুকু অসম্মতি জানাইল না। অন্যদিনও যে আসিবে তাহারও স্বীকৃতি ছিল—অথচ কোন কথা বলে না কেন! বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তপতী আপনার ডান হাতটা তপনের দুই হাতের ফাঁকে চালাইয়া দিয়া ষ্টিয়ারিংটা ঘুরাইয়া দিতে দিতে বলিল,—এই দিকে যাবো!

অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত গাড়ীটার ঝোঁক সামলাইয়া লইয়া তপতীর নির্দ্দেশমত পথেই তপন গাড়ী চালাইল। একটু দূরে কয়েকজন কলেজের মেয়ে বেড়াইতেছে, স্থানটা বেশ ফাঁকা।

তপতী বলিল,—এখানেই নামা যাক্‌ একটু—কেমন?

তপন গাড়ী থামাইল। নিজে নামিয়া তপতী ভাবিল, তপনও নিশ্চয় নামিবে, কিন্তু তপন গাড়ীতেই বসিয়া আছে মাথা নীচু করিয়া। তপতীর কেমন লজ্জা করিতে লাগিল তপনকে সঙ্গে আসিতে বলিতে। সে খানিকটা চলিয়া গেল কিন্তু কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—একা যাবো নাকি?

তপন নিঃশব্দে নামিয়া তাহার অনুগমন করিতেছে। তপতী যাহোক একটা কিছু বলিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল,—ঐগুলো বুঝি গাংচিল—নয়?

—হ্যাঁ—বলিয়াই তপন নীরব হইল।

এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তপতীর অসহ্য বোধ হইতেছে। তাহার কলকাকলির স্রোত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে যেন। তপনকে কথা কহিবার অধিকার দেওয়ার পরও তাহার এতটা নীরবতার হেতু কি! তপতী আবার বলিল,—ঐ নৌকাটা কোথায় যাচ্ছে?

—তা তো জানিনে।

তপন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা একটীও বলিবে না? নৌকাটা কোথায় কোন্ চুলোয় যাইতেছে, কে তাহা জানিতে চায়! তপন কেন বোঝে না?—মানুষের যাত্রা-পথও এমনি—কোথায় যাবে জানে না—তপতী পুনর্ব্বার হাসিমুখেই বলিল।

তপন কোনই উত্তর দিল না! নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগিল। তপতী ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কথাই যদি না বলে তো উহার সঙ্গে বেড়াইবে কিরূপে! কিন্তু হয়তো তপন এখনো রাগিয়া আছে। অপমানটা তো কম হয় নাই! তপতী কথার মোড় ঘুরাইবার জন্য সোজা প্রশ্ন করিল,—মাদ্রাজে ক'দিন দেরী হবে?

—ঠিক বলতে পারিনে—মাস দুই তো নিশ্চয়ই।

দু'মাস! এতদিন কি করবে সে? কিন্তু প্রশ্ন করিলে যদি তপন ভাবে, তাহার কর্ম্মের অযোগ্যতা লইয়া তপতী ব্যঙ্গ করিতেছে। তপতী আর প্রশ্ন করিল না! কিন্তু তপনের রাগ করার প্রমাণ সে পাইতেছে না। কী কথা আরম্ভ করিবে তপতী! কিছুক্ষণ ভাবিয়া প্রশ্ন করিল,—জামা কাপড়গুলো তো আর একটু ভাল করলেই হয়!

তপন মৃদুস্বরেই উত্তর দিল,—জীবনে অনেক-কিছু না পেয়ে প্রাপ্ত বস্তুর উপরও আর শ্রদ্ধা নেই।

তপতী রাগিয়া উঠিল, ভণ্ডামীর আর জায়গা নেই যেন। কিন্তু রাগ চাপিয়াই হাসিয়া বলিল,—"ওঃ বুদ্ধদেব! ত্যাগ শেখা হচ্ছে?"—তপতীর কণ্ঠে সুস্পষ্ট ব্যঙ্গের স্বর ধ্বনিয়া উঠিল।

বিস্ময়ের সুরে তপন কহিল,—বুদ্ধদেব তো কিছু ত্যাগ করেন নি! তিনি তাঁর পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য ছেড়ে অগণ্য মানবের হৃদয়-সিংহাসনে রাজ্য বিস্তার করেছেন! ত্যাগ কোথায়?

বিমূঢ়া তপতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল তপনের দিকে, তারপর বলিল,—ত্যাগ তবে কাকে বলে?

—ত্যাগ ব'লে কোন বস্তু তো নেই! আমরা যাকে ত্যাগ বলি, সেটার মানে এড়িয়ে যাওয়া। আর সত্যকার ত্যাগ মানে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি অর্থাৎ বিস্তার, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, লঘিষ্ঠ থেকে গরীয়ানে!

তপতীর বিস্ময় বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রতি কথায় তপনের মুখ হইতে এ কি বাণী ঝঙ্কারিয়া উঠে! তপতী এতটা পড়িয়াছে—এমন করিয়া তো ভাবে নাই। এই লোক কি মূর্খ হইতে পারে? অশিক্ষিত হইতে পারে? তপতী আরো কি কথা বলিবে ভাবিতেছে।

কয়েকটী কলেজের মেয়ে আসিয়া তপতীকে নমস্কার জানাইয়া বলিল, —ভালতো মিস চ্যাটার্জি।"

তপনের সম্মুখে যে তাহাকে "মিস্" বলিয়া সম্বোধন করায় তপতীর লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু আরো কিছু অঘটন ঘটিবার আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি—ভালই আছি—বলিয়া দূরে চলিয়া যাইতে চায়।

একটি মেয়ে তপনকে লক্ষ্য করিয়া, হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—আপনার সঙ্গীর পরিচয়টা!

তপতীকে কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তপন কহিল, —আমি সামান্য ব্যক্তি, নাম তপনজ্যোতি!

মেয়েটি হাসিয়া বলিল,—তপন মানে সূর্য্য—উনি কিন্তু বরাবর বড়লোক; কখনো সামান্য নন।

—আমি বড়লোক? কিসে বুঝলেন?

—ঠিক বুঝেছি! যে প্রকাণ্ড গাড়ীখানা!

—গাড়ী দেখেই বুঝি আপনারা বড়লোক ঠাওরান? আমরা, ছেলেরাও তাই শাড়ী দেখে বড়লোক ভাবি?

—ছেলেরা কিন্তু ভুল করে। কারণ বাড়ী আর গাড়ীতে পয়সা লাগে—আর শাড়ীর দাম গোটা পাঁচেক টাকা মাত্র।

—ছেলেরা মেয়েদের সম্বন্ধে বরাবর ভুলই করে থাকে—কথাটা বলিয়া তপন নিঃশব্দে হাসিল।

—কেন? আপনি কিছু ভুল করেছেন নাকি? মেয়েটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে কথাটা বলিল!

—না—আমি মেয়েদের এড়িয়ে চলি—যথাসম্ভব!

—ভয় করে বুঝি?

—আগে করতো! এখন টিকা নিয়ে ফেলেছি—বসন্ত আর হবে না।

—মেয়েরা বুঝি আপনার কাছে বসন্ত?

—মারীভয়! তাকে কে ভয় না করে বলুন? প্রমাণ তো ইতিহাসে যথেষ্ট রয়েছে, ট্রয়ের ধ্বংস, লঙ্কার দাহন।

—কিন্তু ভালোও তো বাসেন দেখছি!

—বাসি। মানুষ যাকে ভয় করে তাকে ভালোও বাসে। প্রমাণ ভুত। ভূতকে ভয় করি বলেই তার গল্প অবধি শুনতে ভালবাসি আমরা; কিন্তু ভূতকে এড়িয়ে যেতে চাই।

—আপনার যুক্তি কাট্‌তে না পারলেও কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারছিনে।

—আমি নিরুপায়—বলিয়া তপন নমস্কার জানাইল।

অতি সাধারণ কথাতেও তপন যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইতে পারে! তপতী আজই প্রথম তপনকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছে। দেখিল, সুশিক্ষিতা কলেজের মেয়েদের সহিত আলাপে তপনের কোথাও জড়তা নাই। কেন তপতী এতদিন উহাকে লইয়া বেড়াইতে আসে নাই? তপনকে লইয়া তো তাহাকে অপদস্ত হইতে হইত না।

মোটরে গিয়া তপতী চালকের আসনে বসিল। সন্ধ্যার ক্লান্ত পাখীদল কুলায় ফিরিতেছে। তপন সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন জীবনের কথা ভাবিতেছে—আর তপতী ভাবিতেছে, উহার সহিত ভাব করিবার কি কৌশল আবিষ্কার করা যায়। হঠাৎ তপতী ব্রেক কবিয়া গাড়ী থামাইয়া দিল। নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথের দুধারে ফুটিয়া আছে অজস্র বন্য কুসুম! তপতী নামিয়া তাহাই কতকগুলি তুলিয়া লইল আঁচলে। একটা পুষ্পিত শাখা ছিঁড়িয়া তপনের গায়ে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—আপনি চালান, আমি ফুল পরবো। তপতী উঠিতেই তপন নিঃশব্দে চালকের আসনে সরিয়া গিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল!

এই নিতান্ত নির্লিপ্ততা তপতীর অন্তরকে জাগ্রত করিতেছে। তাহার আধুনিক মন ভাবিয়াছিল, ফুলগুলি তপন স্বহস্তে তাহাকে পরাইয়া দিবে, কিন্তু ও তপতীর সহিত অসহযোগ আরম্ভ করিল নাকি? তপতী বার বার চাহিয়া দেখিল—তপন অনড়—দৃষ্টি সম্মুখের দিক হইতে এক চুল নড়ে নাই। আপনার সুদীর্ঘ বেণীতে পুষ্পগুচ্ছ গুঁজিয়া তপতী বেণীটাকে এমন ভাবে ফেলিয়া দিল যাহাতে তপনের বাম বাহুতে উহা পড়িতে পারে। তপন নির্ব্বিকার। তপতী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। এই কঠিন পাষাণ মূর্ত্তিকে লইয়া সে করিবে কি? রাগই যদি তপনের হইয়া থাকে, তবে না হয় দু'চার কথা শুনইয়া দিক—তপতী সহ্য করিবে। কিন্তু এই নীরবতা একান্ত অসহ্য। তপতী ঝাঁজিয়া বলিয়া উঠিল,—কথা তো ভালই বলতে পারেন—চুপ করে কেন আছেন এখন?

—কথা না বলেও তো অনেক কথা বলা যায়—যেমন কথা বলে ঐ পুষ্পিত শাখা!

—কিন্তু আমি শাখা নই, আমি মানুষ, কথা বলবার জন্য আমার ভাষা আছে! আর ভাষাকে সুন্দর করবার জন্য আমি অনেক তপস্যা করেছি!

—আমার মৌনতাকে আমি সুন্দর করতে চাই—তাই হোক আমার তপস্যা!

—অর্থাৎ আমি যা চাই, তার উল্টোটা, কেমন? চমৎকার!

তপন চুপ করিয়া রহিল। দিকে দিকে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সুষমা গান গাহিয়া উঠিতেছে মৌন মহিমায়। মৌনতার এই সুগভীর সৌন্দর্য্য একান্ত প্রিয়জনের সান্নিধ্যেই যেন অনুভব করা যায়! তপতী অনেক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—কাল আবার আসতে হবে বেড়াতে, বুঝলেন? পালাবেন না যেন।

—কাল আমার বোনের বাড়ী যাবো, আসতে পারবো না।

তপতী বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল। ঐ বোনটাই তপতীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। কোনরূপে ক্রোধ দমন করিয়া সে কহিল,—আমিও যাবো—নিয়ে যাবেন আমায়! আমি দেখতে চাই, তার সঙ্গে আপনার সত্যিকার সম্পর্কটা কি!

তপন সজোরে গাড়ীটার ব্রেক কষিয়া থামাইয়া দিল। তপতী লাফাইয়া উঠিল স্প্রিংএর গদিতে। তপন ধীর শান্ত স্বরে কহিল,—তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যাই হোক মিস চ্যাটার্জি, আপনার তাতে কিছুই যাবে আসবে না। অনর্থক আঘাত করায় কি আপনার লাভ হচ্ছে? আমার সঙ্গে সব সম্পর্কই তো আপনি ছিন্ন করেছেন! আজ আবার বলছি,—আপনি মুক্ত, আপনি স্বতন্ত্র, আপনি স্বাধীন। আপনার উপর কোন দাবী আমি আর রাখিনে। আশা করি—আপনিও আমার উপর রাখবেন না।

তপন তীরবেগে গাড়ীটা চালাইয়া দিল। তপতী বসিয়া রহিল বাক্যহারা ব্রততীর মত!

বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া তপতী হঠাৎ বলিল,—সত্যি তাহলে আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন?

—হাঁ! আমি আপনার জীবন থেকে অস্ত গিয়েছি।

—অস্ত-সূর্য্যটি কিন্তু প্রতি সকালে উদিত হন—তপতীর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

—তার জন্য থাকে রাত্রির সুদীর্ঘ সাধনা—ধীরে উত্তর দিল তপন।

—ভালো—রাত্রি সাধনাই করবে!—তপতী আবার বিদ্রূপ করিল।

—আমি কিন্তু সূর্য্য নই। আমি দূর নীহারিকাপুঞ্জের এক নগণ্য নক্ষত্র, অস্ত গেলে বহু শতাব্দীর পরেও পুনরুদয়ের সম্ভাবনা কম থাকে।

গাড়ী বাড়ী পৌঁছিল। তপন দরজা খুলিয়া তপতীর নামিবার পথ করিয়া দিল এবং সে নামিয়া গেলে নিজেও ধীরে ধীরে আপনার ঘরে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত্রিটাই দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল তপতীর। চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ যেন আছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার মনের উপকূলে। তপনের সহিত তাহার এই কয় মাসের ব্যবহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া তপতী কুড়াইয়া ফিরিতেছে কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায়, যাহা কিছু দেখে, সর্ব্বত্রই তপন নির্ব্বিকার। নির্দ্দোষ সে না হইতে পারে কিন্তু নির্লিপ্ততা সে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তপতীর বারম্বার অসম্মানের আঘাতেও তপন অবিচল রহিয়া গিয়াছে—আর আজ সেই আঘাতগুলিই তপতীর অপরিসীম লজ্জার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

তপন তাহাকে মুক্তি দিয়াছে? সত্যই কি সে আজ তপনের সহিত বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত? বেশ—ভালো কথাই তো। কিন্তু কেন যেন আনন্দ আসিতেছে না। এতদিন যে লোকটিকে কেন্দ্র করিয়া তপতী তাহার দুঃখের বিলাসকুঞ্জ রচনা করিতেছিল আজ যেন সে কুঞ্জ সমূলে

ধ্বসিয়া গিয়াছে। অবাধ অসীম বিস্তারের মধ্যে আজ তপতী যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারে—তপন আর কিছুই বলিবে না। সে বলিয়াছে—তপতীর উপর তাহার আর কোন দাবী নাই। নিতান্ত নিস্পৃহের ন্যায় সহজ স্বরেই তপন আজ কথা কয়টা বলিয়াছে। সত্যই কি তাহাকে মুক্তি দিয়াছে তপন? হাঁ দিয়াছে। তপতী মুক্তি চাহিয়াছিল, শুধু চাহিয়া ছিলই নয়, মিঃ ব্যানার্জির কাধে মাথা রাখিয়া তপনকে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে সে চাহে না—তাহাকে সে গ্রাহ্য করে না। এত দিনের এত আঘাতেও যে-তপন এতটুকু বিচলিত হয় নাই, সেদিন সেই-তপন শরাহত মৃগশিশুর মত কাঁদিয়াছে,—অজস্র উদ্বেলিত অশ্রুধারায় প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছে তাহার পূজার বেদীমূল। আর তপতী নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতায় সে কান্না দেখিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, বিরক্ত হইয়াছে।

তপনকে আজ বলিবার মত তপতীর আর কি থাকিতে পারে? হয়ত ক্ষমা চাহিবার অধিকারটুকুও তাহার লুপ্ত হইয়া গেছে। হাঁ, তপতী আজ সত্যই মুক্ত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র। কিন্তু তপন আজো রহিয়াছে কেন? সুদীর্ঘকাল বারম্বার অপমান সহ্য করিয়াও যে-লোক এ গৃহ ত্যাগ করে নাই, সে নিশ্চয়ই এত সহজে তপতীকে ত্যাগ করিবে না। না—না—না—তপতী বৃথাই ভাবিয়া মরিতেছে।

আশ্বস্ত হইয়া তপতী খানিকটা ঝিমাইয়া লইল। তপনের চলিয়া যাওয়টা তাহার পক্ষে কত বড় ক্ষতি ইহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু তাহার থাকায় যে কিছু লাভ আছে, ইহা যেন তপতীর আজ বারব[illegible] মনে হইতেছে। মা-বাবা উহাকে স্নেহ করেন, সে নিশ্চয় এই বাড়ীতেই থাকিবে। আপততঃ তপতীকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছে—মুক্তি দিলাম। মুক্তি অত সহজ কিনা? এ তো আর চার টাকায় কেনা পাখী নয়! আর যদিই বা মুক্তি দেয় তো ক্ষতিটা কি? তপতী

উহার জন্য কাঁদিয়া মরিয়া যাইবে না। বাড়ীতে আছে, থাক—আরো কিছু টাকা লইতে চায় লউক। তপতী উহাকে আর বিরক্ত করিবে না! দুজনেই তাহারা আজ হইতে স্বাধীন ভাবে চলিবে।

তপতী হাসিয়া ফেলিল। তপন তো তাহার স্বাধীনতায় কোন দিন হস্তক্ষেপ করে নাই। তপতী চিরদিনই স্বাধীনা আছে এবং থাকিবে।

ভোর হইয়া গিয়াছে। বীতবর্ষণ আকাশের কোমল আলোক তপতীর চোখে বড় সুন্দর লাগিতেছিল। উঠিয়া সে স্নান করিয়া ফেলিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল বারান্দায়; তপনের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল; দরজা খোলা। ত্রস্ত তপতী ত্বরিতে আসিয়া দেখিল তপন পূজায় বসিয়াছে। তপনের পিছন দিকটা তপতী বহুবার দেখিয়াছে কিন্তু মুখ ভাল করিয়া দেখে নাই। আত্মবিস্মৃতা তপতী ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, জীবনের এই প্রথম। প্রেমাভিসারের এই ক্ষুদ্র আয়োজনটুকুতেই হয়ত তার অনেক সময় ব্যয় হইয়া যাইত, কিন্তু আজ একান্ত অকস্মাৎ তাহা ঘটিয়া গেল।

তপনের দুই আঁখি ধ্যানস্তিমিত। শ্মশ্রু-গুম্ফ মুণ্ডিত সুন্দর মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে যে শান্ত, সৌম্য শ্রী, তাহাকে তপতী বুদ্ধদেব ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারে না। তপতী দাঁড়াইয়া রহিল। তপনের স্নানসিক্ত চুল হইতে তখনো জল ঝরিতেছে। তপতীর ইচ্ছা করিতেছে, আপনার বুকের অঞ্চল দিয়া তপনের মাথাটি মুছিয়া দেয়।

তপন চক্ষু মেলিয়াই বিস্মিত হইল। অত্যন্ত সহজ সুরেই প্রশ্ন করিল, —কিছু বলতে চান?

—না—কিছু না—বলিয়া বিমূঢ়া তপতী দাঁড়াইয়া রহিল; প্রণাম শেষ করিয়া তপন চলিয়া গেল খাইবার জন্য মা'র কাছে এবং খাইয়া বাহিরে।

সমস্ত দিনই তপন ঘরে ফিরিল না। সেই সকালে গিয়াছে—তপতী অত্যন্ত উস্‌খুস্‌ করিতেছে। মা'কে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার লজ্জা করিতেছিল। বিকালে নিশ্চয় জল খাইতে আসিবে। কিন্তু বিকাল হইয়া গেল, ছয়টা বাজিল, তপন আসিল না। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কাল তপন বলিয়াছিল, বোনের বাড়ী যাইবে! তবে কি আজ আর মোটেই আসিবে না? মিঃ ব্যানার্জি প্রভৃতি বন্ধুগণ তপতীকে বহুক্ষণ হইতে ডাকিতেছেন—নিরাশ হইয়া তপতী নীচে নামিল।

মিঃ ব্যানার্জি কহিলেন,—কি ব্যাপার? যক্ষ-বধূর মত চেহারা যে মিস্ চ্যাটার্জি?

—আমি মিসেস গোস্বামী—আজ থেকে মনে রাখবেন—বলিয়া তপতী ওধারের ফুল-বীথিকায় চলিয়া গেল।

মিঃ অধিকারী ডাকিয়া কহিলেন,—খেলবেন না একটু?

—না—তপতীর কণ্ঠস্বর এত দৃঢ় শুনাইল যে সকলেই থামিয়া গেল!

রাত্রি সাড়ে নয়টায় ফিরিয়া আসিল তপন। মা প্রশ্ন করিলেন,—কি-কি খেলে বাবা বোনের বাড়ীতে?

—এই, পাটিসাপ্‌টা, সরুচাকলী, পানিফলের কি সব—আরো কত কি খেলাম মা।

তপতী আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছে। মা কহিলেন,—বেশ বাবা, বোনের বাড়ী তো বেশ খাও—আর এখানে খেতে দিলেই বলবে, 'ভালবাসিনে মা!'

বিস্ময়ের সুরে তপন বলিল,—কেন মা, আপনি যেদিন যা দিয়েছেন খেয়েছি তো! তবে আমি পরিমাণে কম খাই।

মা পুনরায় কহিলেন,—কিন্তু বাবা, খুকী সেদিন যা-কিছু রান্না করলে, তুমি খেলে না!

তপন অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। বাহিরে তপতী সাগ্রহে কাণ খাড়া করিয়া আছে, তপন কি বলে শুনিবার জন্য! তপন ধীরে বলিল, —কথাটার জবাব দিতে চাইনে মা, ব্যথা পাবেন আপনি।

বিস্মিতা মাতা ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—তা হোক বাবা, তুমি বলো,—বলো কি জন্যে তুমি খাওনি? বলো, শুনতে চাই আমি···

—মা'র মনে ব্যথা দেওয়া উচিৎ নয় মা—তাই বলতে চাইছি নে।

—না বাবা, তোমায় বলতেই হবে।—মা'র নির্বন্ধাতিশয্য বাড়িয়া গেল।

নিরুপায় তপন কোমল কণ্ঠেই কহিল,—আপনার খুকী তো আমার জন্য কিছু কোন দিন রান্না করেনি মা—যেদিন যা-কিছু করেছে, সবই তার বন্ধুদের জন্য। আর আমার বোন আমার জন্য পাটিসাপ্টা তৈরী করে আঁচল ঢেকে ব'সে থাকে—যেতে দু' মিনিট দেরী হলে চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়!—তার সঙ্গে আপনার খুকীর তুলনা করবেন না মা—সে তো প্রগতিশীলা তরুণী নয়, ভাইএর বোন সে।

মা একেবারে মূক হইয়া গেলেন। বাহিরে তপতীর অন্তর বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এত বেশী সেন্টীমেণ্টাল ও! এতো তীক্ষ্ণ লক্ষ্য উহার!

কিছুক্ষণ সামলাইয়া লইয়া মা কহিলেন—খুকী বড্ড ছেলেমানুষ বাবা, —বোঝে না!

কলহাস্যে ঘরের বিষাক্ত হাওয়াটা উড়াইয়া দিয়া তপন অতি সহজকণ্ঠে কহিল,—আমি কি বলেছি মা, সে বুড়ো মানুষ! আপনি তো বেশ উল্টো চার্জে ফেলেন!—খাওয়া হইয়া গিয়াছে। তপন উঠিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে আসিয়াই তপন করুন কণ্ঠে কহিল,—কাল আপনাকে কথাগুলো বলে মনে বড় কষ্ট পেয়েছি মা—সত্যি বলুন, আপনি দুঃখ পাননি?

—তুমি আমার বড় উপকার করেছ তপন, দুঃখ পাবার আমার দরকার ছিল।

—খুব বড় কথা বললেন মা—দুঃখ পাবার মানুষের দরকার থাকে! এই পৃথিবীতে দুঃখের চাকায় আমাদের মন-মাটি মানুষের মূর্ত্তিতে গড়ে ওঠে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:—

'বজ্রে তোল আগুন করে আমার যত কালো'

তপন খাইতে আরম্ভ করিল। মা দেখিতে পাইলেন, দরজার আড়ালে তপতীর অঞ্চলপ্রান্ত দুলিতেছে। ডাকিলেন,—আয় খুকী—খাবি আয়!

তপতী আসিতে আজ সঙ্কুচিত হইতেছে। মা বলিলেন,—লজ্জা দেখো মেয়ের! আয়। ও কাল কি বললো জানো বাবা তপন? বললো, তোমার জামাইএর জন্য খাবার করবো বলতে আমার লজ্জা করে—জামাই তোমার বোঝে না কেন?

বিস্ময়ে হতবাক তপন দুই মুহূর্ত্ত পরে উত্তর দিল,—লজ্জার একটা সুমিষ্ট সৌরভ আছে মা, আপনার খুকীর আচরণে এ যাবৎ সেটা পাই নি। কিন্তু মা, ও কথা এবার বন্ধ করুন। অপ্রিয় আলোচনা না করাই ভালো মা।

—হাঁ বাবা, থাক!—পাছে কেঁচো খুঁড়িতে কেউটে উঠিয়া পড়ে, ভয়ে মা আর কোন কথাই তুলিলেন না। তপন চলিয়া গেলে তপতীকে কহিলেন,—তোর কিন্তু এতোটুকু বুদ্ধি নাই খুকী, মিছেই লেখাপড়া শিখ্‌ছিস্।

তপতী আজ এই ভৎ র্সনা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। তাহার জন্মার্জিত সংস্কার আজ যেন তাহাকে চাবুক মারিয়া বুঝাইতেছে, আপনার স্বামীকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত সে এত বিদ্যাতেও অর্জন করে নাই! মা'র কথার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া তপতী হাসিল—

এবং আপন ঘরে গিয়া সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া একটা প্ল্যান খাড়া করিয়া ফেলিল।

বিকালে জলযোগের জন্য তপন আসিতেই মা কহিলেন,—খুকীর বড্ড মাথা ধরেছে বাবা, ভীষণ কাতরাচ্ছে। ওকে একটু বেড়িয়ে আনো।

—মাথা ধরেছে! কিন্তু আমার সঙ্গে বেড়িয়ে ও বিশেষ কিছু আনন্দ পাবে না মা—ওর বন্ধুদের সঙ্গে যেতে বলুন না! গল্প করলে মাথা ধরা সেরে যাবে শীঘ্রি।

তপতী সোফায় শুইয়া সব শুনিতেছিল। নিতান্ত করুণ কণ্ঠে কহিল, —থাক্ মা, যেতে হবে না—ওর হয়ত কাজ আছে! না হোক বেড়ানো আমার!

তপন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল,—কিন্তু আমি না গেলে বেড়ানো হবে না কেন, বুঝতে পারছি না মা—রোজই তো ও বেড়াতে যায়!

তপতীর আর বলিবার মত কথা ফুটিতেছে না। মা ব্যাপারটা বুঝিলেন, কহিলেন,—এতকাল ছেলেমানুষ ছিল, বাবা, চিরকাল কি আর বন্ধুদের সঙ্গে যায়!

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুমিষ্ট হাস্যে সারা বাড়ীটা মুখরিত হইয়া উঠিল। বলিল,—বেশ যা হোক মা, গত কালই বলেছেন, আপনার খুকী ছেলেমানুষ, আর আজই বড় হয়ে গেল! আপনার বাপের বাড়ীতে তাই হয় বুঝি? ঝিঙে—বেগুন, করলা দুই-বেলা কিন্তু বাড়ে মা—আপনার খুকী কি তাহলে……

তপনের বলার ভঙ্গীতে খুকী অবধি হাসিয়া ফেলিল।

মা বলিলেন,—দুষ্টুমি কোরো না বাবা—যাও, দু'জনে বেড়িয়ে এসো গে!

—আচ্ছা মা—যথাদেশ! বলিয়া তপন গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট্ মাইল বেগে গাড়ী চলিতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই। তপতী বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া বসিয়া আছে। তপনের দৃষ্টি দূর দিক্‌চক্রে সমাহিত। হুড্ শূন্য গাড়ীর উপর দিয়া যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। তপতী মাথাটা টিপিয়া বার দুই 'উঃ-আ' করিল। তপন নির্ব্বিকারে গাড়ী চালাইতেছে। তপতী মাথার চুলগুলো এলাইয়া দিল—তপনের চোখে-মুখে লাগিতেছে—তপন মুখটা সরাইয়া লইল। ঘাড়টা কাত করিয়া তপতী পিছনের ঠেসায় রাখিল, তপনের বাম বাহুতে তাহার মাথা ঠেকিতেছে—তপন নির্ব্বিকারে গাড়ীর গতিটা বাড়াইয়া দিল। তপতী 'ওগো মাগো' বলিয়া মাথাটা তপনের বুকের অত্যন্ত নিকটে আনিয়া ফেলিয়াছে—তপনের নিশ্বাস তাহার ললাট স্পর্শ করিবে। তপন অকস্মাৎ গাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্দ করিয়া দিল—এবং একটু পরেই থামাইয়া ফেলিল। ঘাড় তুলিয়া তপতী চাহিয়া দেখিল, গঙ্গার কূলেই তাহারা আসিয়াছে।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া তপন নামিয়া পড়িল। তপতী বিস্মিতা, ব্যথিতা, বিপন্না বোধ করিতে লাগিল। আপনাকে এতখানি অসহায় তাহার কোন দিন মনে হয় নাই। চাহিয়া দেখিল, তপন গঙ্গার জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তপতীও নামিল এবং একটা আকন্দগাছ হইতে ফুলগুচ্ছ ছিঁড়িয়া তপনের গায়ে ছুড়িয়া দিতে দিতে কহিল, "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় তার নামটি কি? বলুন তো?'

তপন পিছন ফিরিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল! তপতীর এই নির্লজ্জ ন্যাকামী তাহার চির-সহিষ্ণু অন্তরকেও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছে। যে নারী দিনের পর দিন বিবাহিত স্বামীর অন্তরকে অপমানে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে—একবার ফিরিয়া দেখে নাই, কতখানি শোণিত ক্ষরণ হইল, যে স্বেচ্ছায় অন্য পুরুষের অঙ্গে শয়ন করিয়া স্বামীর কাছে মুক্তি মাগিয়া লয়—আজ আবার কোন সাহসে সে স্বামীর সহিত রঙ্গ করিতে আসে!

ইহাই কি আধুনিকার প্রগতি! কিন্তু, তপন কাহাকেও আঘাত করে না—তপতীকেও কিছু বলিল না।

তপতী আশা করিয়াছিল, তাহার কবিতার উত্তরে তপন বলিয়া উঠিবে—তার নাম 'তপতী'। কিছুই তপন বলিল না, এমন কি মুখও ফিরাইল না দেখিয়া তপতী অত্যন্ত মুষড়াইয়া পড়িল। তাহার এতক্ষণকার ব্যবহার মনে করিয়া লজ্জায় তাহার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। নিরুপায়ের শেষ অবলম্বনের মত সে শুধু বলিল,—বসবেন না একটু?

তপন নীরবে আসিয়া একটু দূরেই বসিল। সবুজ তৃণমণ্ডিত মাঠে একান্ত আত্মীয় দুইটি মানবের একান্ত নীরবতা বুঝি প্রকৃতিকেও পীড়িত করিতেছে—কোথায় একটা পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল—পিউ কাঁহা? তপতী নির্ভুল ভাবেই বুঝিয়াছে, তপন আর কথা কহিবে না। উপায়হীনা তপতী উঃ বলিয়া সেই ঘাসের উপরই তপনের হাঁটুর কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

হয়ত সত্যই উহার কষ্ট হইতেছে। কারুণ্যে কোমল তপন সস্নেহে হাত দিল তপতীর ললাটে। মাথাধরার কিছুমাত্র লক্ষণ নাই, দিব্য শীতল স্নিগ্ধস্পর্শ কপাল, রগ দুটি যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই টিপ্ টিপ্ করিতেছে। এই মিথ্যাবাদিনী ছলনাময়ী নারীকে তপন বিবাহ করিয়াছে। ঘৃণায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—কিন্তু কিছুই সে বলিল না—তপতীর শীতল মসৃন কপালে তাহার নিপুণ অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল! আরামে তপতীর চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। এক-একবার সে ভাবিতেছে তপনের হাঁটুর উপরে মাথাটা তুলিয়া দিলে কেমন হয়—কিন্তু থাক্—অতটা বাড়াবাড়ির দরকার নাই—যদি নিজেই তুলিয়া লয় তো আরো ভালো হইবে।

—নমস্কার—

তপতী সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল মিঃ বোস তপনকে নমস্কার করিতেছে। তপতীকে চোখ খুলিতে দেখিয়াই কহিল,—মাসিমার কাছে শুনলাম আপনার মাথাব্যাথা, তাই এলাম সন্ধান করে করে—কেমন বোধ করছেন এখন? য়্যাসপিরিন খাবেন?

মিঃ বোসের এত কথার জবাবে তপতী কিছু না বলিয়া পুনরায় চোখ বুজিল। তাহার অত্যন্ত রাগ হইতেছে—কি জন্য আসে এই মিষ্টার বোস্? সে স্বামীর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছে, মাথা ধরুক আর মরিয়া যাক্—তিনি দেখিয়া লইবেন; মিঃ বোসের য়্যাসপিরিন লইয়া দরদ দেখাইতে আসিবার কী প্রয়োজন! কিন্তু তপতীর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—কাঁটার যে জাল সে এতকাল ধরিয়া নিজের চারিদিকে বয়ন করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে হাত-পা এক আধটু ছড়িয়া যাইবেই। অন্য কোন অঘটন ঘটিবার আশঙ্কায় তপতী কথাই কহিল না। চতুর মিঃ বোস তপতীর মনের ভাব বুঝিয়া ফেলিলেন। হাঁ, মাঝে মাঝে স্বামীর সহিত বেড়াইতে না আসিলে লোকে মন্দ বলিবে! তপতীর আজিকার অভিনয় একটা বিশেষ ধাপ্পা। কহিলেন,

—'ওয়েল' মিঃ গোস্বামী আমি আবার মার্জ্জনা চাইছি আপনার কাছে।

—কি হেতু?—তপন পরম ঔদাসিন্যের সহিত প্রশ্ন করিল!

—সেই দিনকার ব্যাপারটার জন্য, সত্যিই আমি লজ্জিত!

তপনের মনটা একেই তো তপতীর লজ্জাকর অভিনয়ে তিক্ততায় ভরিয়াছিল,—তার উপর মিঃ বোসের আগমনের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়বার ক্ষমা চাওয়ার সঙ্গে চতুরা তপতীর কোন উদ্দেশ্য যুক্ত আছে কি না সে বুঝিতে পারিতেছে না—যথাসম্ভব সংযত হইয়াই উত্তর দিল,—সে কথা আর নাই বা বললেন মিঃ বোস। আর অপরাধ তো আপনার কিছু নয় —ওর পিছনে ছিল যাঁর সমর্থন, অপরাধ যদি কিছু ঘটে থাকে তো সে তাঁর। কিন্তু যারই হোক—আমি সর্ব্বান্তকরণে ক্ষমা করেছি। বারবার

এক কথা বলার দুঃখ থেকে আমায় রেহাই দিন—এই মিনতি করছি আমি।

তপতীর মাথাটা ভূমি হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল। তপন এমনি করিয়া ভাবিতে পারে! মিঃ বোসের কৃত আচরণের অন্তরালে রহিয়াছে তপতীর সমর্থন! তপনের মননশীলতাকে তপতী আজ কি বলিয়া মিথ্যা প্রমাণ করিবে! আর মিথ্যা তো নয়! তপতীর সমর্থন না পাইলে মিঃ বোসের সাধ্য কি যে তপনের অসম্মান করে! তপতী চাহিল তপনের মুখের দিকে। মুখ অন্যদিকে ফিরানো রহিয়াছে—তথাপি তপতী বুঝিল, সে মুখে রাগ বা দ্বেষের কোন চিহ্ন নাই!

মিঃ বোস বড় বেশি থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন। একটু সামলাইয়া কহিলেন,—আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম মিঃ গোস্বামী; আজ কিন্তু সত্যিই আপনাকে আমরা বন্ধুভাবে পেতে চাই—'নাও উই মাষ্ট বি ফ্রেণ্ডস্!'

তপন চুপ করিয়া রহিল। তপতীর মাথায় হাত তাহার সমানে চলিতেছে।

—চুপ করে আছেন যে মিঃ গোস্বামী? আমার বন্ধুত্ব আপনি স্বীকার করলেন তো?

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ বোস—আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কি করে সম্ভব হতে পারে! আমি দীন, দরিদ্র, নগণ্য, অশিক্ষিত মানুষ, আপনারা অভিজাত; আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলা আমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয় শুধু, অসম্ভব!

—কিন্তু আমি সেটা প্রার্থনা করছি। আমি চাইছি অপনার বন্ধুত্ব!

—ক্ষমা করবেন মিঃ বোস—আমি জীবনে অসত্য কথা উচ্চারণ করিনি, আমার অভিধানের 'অত্যাগ সহনো বন্ধু' কথাটার সঠিক অর্থে আপনাকে পাচ্ছিনে—আপনাকে বন্ধু ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মিঃ বোস নীরব হইয়া গেলেন। অপমানিত বোধ করিলেন তিনি। মুখখানি তাঁহার কালো হইয়া গেল। তপন পুনরায় কহিল,—হয়ত আপনি দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু উপায় কি বলুন! আমার নীতি জগতের কিছুর জন্যই বদলায় না। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দুদিনে পড়ল আজই। এর মধ্যে এমন কিছু হয়নি যে আমার বিরহে আপনি বুক ফাটাবেন বা আপনার জন্য আমি বুক ফাটাবো। অবশ্য বন্ধু না বলে আলাপি বলা যেতে পারে।

মিঃ বোস যেন বিদ্রূপ করিবার জন্যই বলিলেন,—এরকম বুকফাটা বন্ধু আপনার ক'জন আছেন মিঃ গোস্বামী?

বিদ্রূপটাকে গ্রাহ্যমাত্র না করিয়া তপন উত্তর দিল,—বেশি তো পাওয়া যায় না, মাত্র একজন আছে!

—আশা করি, তিনিও আপনার মত সংস্কৃত সূত্র মিলিয়ে বন্ধুত্ব করেন?

—তিনি কি করেন, আমার তো জানার দরকার নেই মিঃ বোস. আমি যা করি তাই আপনাকে বললাম—তপন উঠিয়া গিয়া তপতীর ললাট-আহৃত ক্রীমটার তৈলাক্ত পদার্থটা গঙ্গার জলে ধুইতে বসিল!

মিঃ বোস চাহিলেন তপতীর দিকে সহাস্যে। স্মিতমুখে বলিলেন, —এমন অদ্ভুত গোঁড়ামী আর দেখেছেন মিস্ চ্যাটার্জি? ধন্য আপনার ধৈর্য্য যে ওর সঙ্গে এতক্ষণ বসে রয়েছেন!

—আপনার অধৈর্য্য বোধ হয়ে থাকে তো চলে যান—বলিয়াই তপতী উঠিয়া বসিল এবং তপনের অত্যন্ত নিকটে গিয়া বলিল,—চলুন বাড়ী যাই—ভালো লাগছে না এখানে!

নিস্পৃহের মত তপন গাড়ীতে আসিয়া বসিল, তপতী পাশে বসিয়াই বলিল,—চলুন, খুব জোরে চালাবেন না লক্ষ্মীটি! ভয় করে।

মিঃ বোস যে ওখানে তখনো বসিয়া আছেন তপতী লক্ষ্য মাত্র করিল না। সারা পথ সে তপনের বাম বাহুতে মাথা রাখিয়া চুপচাপ বসিয়া

রহিল—তপন একটা কথাও কহিল না, একবারও জিজ্ঞাসা করিল না—তপতীর ব্যথাটা সারিয়াছে কিনা!

গাড়ী গেটে ঢুকিতে দেখিয়া তপতী মাথা তুলিল। বুকের আটকানো নিশ্বাসটা যেন তাহাকে রিক্ত-সর্ব্বস্ব করিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছে।

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিতেই মা বলিলেন,—আয় খুকী, কিছু রান্না কর দেখি।

তপতী কুণ্ঠিত পদে আসিয়া কহিল,—আজ থাক মা, ও ভাববে, তুমি আমায় প্ররোচিত করেছ, নিজের ইচ্ছায় আমি রান্না করিনি—দুদিন যাক্, তারপর রাঁধবো!

মা কথাটার মূল্য উপলব্ধি করিলেন।

তপতী কহিল,—ও তো রবিবারে যাবে মা, শনিবার একটা পার্টি আছে, ও না গেলে কিন্তু আমি যাবো না—লোকে বড্ড কথা বলে!

—তা তুই বলিস নে কেন? অত লাজুক তো তুই নোস খুকী?

—লজ্জা নয় মা, ও এড়িয়ে যায় নানা ছুতোয়—তুমি তো জানো না—বড্ড চালাক ও! আর দেখো মা, এবার যেন ও থার্ড ক্লাসে না যায়, বলে দিও তুমি!

তপতী একটা বালিসের ওয়াড়ে ফুল তুলিতেছিল। মা'কে বলিল,—এটা ওর বিছানার সঙ্গে দিতে হবে মা, কি লিখবো বলো তো?

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা মেয়ে তুই, কী লিখবি আমি তার কি জানি? নিজে না জানিস্, ওকেই জিজ্ঞাসা করিস্।

—ও কথাই বলতে চায় না—যা গম্ভীর মেজাজ! ভয় করে আমার!

—মোটে গম্ভীর নয় খুকী, তবে এই কদিন বোধ হয় একটু ব্যস্ত আছে, তাই।

তপন আসিয়া ঢুকিল খাইবার জন্য। মা হাসিয়া বলিলেন,—তুমি কেন এত গম্ভীর হচ্ছো বাবা তপন? এর মধ্যে এমন বুড়ো তুমি কিছু হওনি—বড্ড কাজের মানুষ হয়েছ, না? কথা বল না কেন?

উচ্চ হাস্য করিয়া তপন বলিল,—আমাদের বয়সের কাঁটাটা আপনার ঘড়িতে ঠিক আপনার প্রয়োজন মতই চলে—না মা? কিন্তু কি কথা শুনতে চান—বলুন?

—যে-কোন কথা বলো বাবা—গম্ভীর হওয়া তোমার মানায় না।

—আচ্ছা,—'মা যদি তুই আকাশ হতিস্ আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায় হোত কথার নাচ।'

শুনলেন কথা, আপনি আকাশ তো আছেনই, আমি চাঁপা গাছ হতে পারবো বলে মনে হচ্ছে—বোশেখের খর রোঁদে ফুটবে আমার ফুল, যখন আর সব ফুলের মেলা শেষ হয়ে যাবে, সাঙ্গ হয়ে যাবে বাসন্তী-উৎসব!

মা তপনের বেদনাহত চিত্তের সন্ধান জানেন না, কিন্তু তপতীর অন্তর আলোড়িত করিয়া আজ অশ্রু-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। তপন স্মিতমুখেই খাইতে বসিয়াছে।

মা বলিলেন,—মাদ্রাজে যাবে বাবা, তোমার বিছানাপত্র সব ঠিক করতে হবে। খুকী একটা ওয়াড় তৈরী করছে, কি লিখবে, ওকে বলে দাও তো?

—কিছু তো দরকার নেই। বিছানা আমার ঠিক আছে। কিছু লাগবে না মা।

—কোথায় ঠিক আছে বাবা! তোমার বোনের বাড়ী? তাহলে ওয়াড়টাই নিও শুধু!

—ঘরের জিনিষ বাইরে কেন নিয়ে যাব মা—বাইরের জিনিষ ঘরে আনাই তো দরকার!

তপতী অত্যন্ত বিষণ্ণা হইয়া উঠিল। তাহার পাণ্ডুর মুখশ্রী দেখিয়া মা অত্যন্ত কষ্টবোধ করিলেন, কিন্তু তপনের সহিত বেশি কথা বলিতে তাঁহার ভয় করে। আজন্ম সত্যনিষ্ঠ এই ছেলেটি একবার 'না' বলিয়া বসিলে সহস্র চেষ্টাতেও আর 'হাঁ' হইবে না। অন্য কথার জন্য মা বলিলেন,—এবার কিন্তু তোমায় রিজার্ভ গাড়ীতে যেতে হবে বাবা, কথা শুনো মায়ের।

—ওরে বাপরে! রিজার্ভ গাড়ীতে তো রোগী আর ভোগীরা যায় মা! আমি ভোগী তো নই-ই, আপনার আশীর্ব্বাদে রোগও নেই কিছু আমার!

—দুষ্টুমি কোর না বাবা, আজই গাড়ী রিজার্ভ কর গিয়ে; টাকা নিয়ে যাও।

—আমি তো অফিসের কাজে যাচ্ছি না মা। নিজের কাজে যাচ্ছি।

—হোলই বা তোমার নিজের কাজ! টাকা নাও—নইলে আমি বড্ড দুঃখ পাবো!

তপন বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিল। সত্য বলিলে মা বেশি দুঃখ পাইবেন। এই স্নেহশীলা নারীর ব্যথা চোখের সম্মুখে তপন দেখিতে পারে না,—কি সে জবাব দিবে? ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল,—নিজের কাজটা নিজের টাকায় করা কি বেশি পৌরুষের কথা নয় মা? সন্তানগর্ব্ব তাতে তো মায়ের বাড়াই উচিৎ—! তপন হাসিয়া উঠিল।

মা নিরুত্তর রহিলেন। এ কথার পর কিছু বলিতে যাওয়া চলে না। একটু ভাবিয়া কহিলেন,—কিন্তু তুমি থার্ড ক্লাসে গেলে আমাদের যে অসম্মান হয় বাবা! তোমার শ্বশুরের দিকটাও তো তোমার দেখা উচিৎ।

—আচ্ছা মা, ইণ্টার ক্লাসে যাবো—কেমন খুসী হয়েছেন?

মা চুপ করিয়া রহিলেন। তপতী বুঝিতে পারিল না কেন মা টাকা লইবার জন্য তপনকে এত ব্যাকুল হইয়া সাধিতেছেন। মা'র কোলের কাছ ঘেঁসিয়া গিয়া সে কহিল,—পর্টিটার কথাও তুমি বলো মা!

—তুই কেন বলতে পারিস নে খুকী? শুনছো বাবা, শনিবার তোমাদের একটা পার্টি আছে—যেতে হবে তোমায়, বুঝলে?

—আমার না-গেলে হয় না মা? আমি তো কোন দিন যায়নি।

—না-বাবা, যাওনা বলে আমাদের কথা শুনতে হয়। লোকে বলে, জামাইকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি। তুমি তো লুকোবার মত জামাই নও বাবা; আমাদের সম্মান তোমায় রক্ষা করতে হবে তো!

তপন নীরবে খাইতে লাগিল। মা আবার বলিতে লাগিলেন,—এখানে না থাকলে অবশ্য কথা ছিল না, কিন্তু বাড়ীতে থেকেও তুমি সমাজে মুখ দেখাবে না এ আমাদের বড় লজ্জার কথা। খুকী দুঃখ করে।

—আচ্ছা মা যাবো—বলিয়া তপন উঠিল।

তপন বাহিরে যাওয়ার পর তপতী মা'কে প্রশ্ন করিল,—কিছুই কি নিতে চায় না, মা? টাকা নেবার জন্য তুমি অত সাধাসাধি কেন করছো?

—না খুকী, কিছুই নেয় না। ওর দু'শ টাকা মাসোহারার সব টাকাই আমার কাছে জমা রয়েছে, একটি পয়সা কোন দিন নেয় নি!

—তা হলে দু'লাখ টাকা নিয়েছে, শুনেছিলাম যে? সে কথা মিথ্যে?

—না। দু'লাখ টাকা ও নিয়েছে, কিন্তু কী যে করলো সে টাকা নিয়ে তার কোন খবর পাচ্ছি না আমরা। জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হয় বাছা—ও অদ্ভুত ছেলে। যদি অপমান বোধ করে বলে' বসে, 'চল্লুম আপনার বাড়ী থেকে', তা হলে নিশ্চয় তখুনি চলে যাবে।

—কি করে বুঝলে তুমি? টাকা দু'লাখ নিশ্চয় নিজে নিয়েছে মা, নইলে ওর এই সব হিল্লি-দিল্লী যাওয়ার খরচ জুটছে কোথা থেকে?

—ও টাকা সে নিজের জন্য নেয়নি খুকী। আমায় কতবার বলেছে, 'আপনার স্নেহঋণ কি করে শুধবো তাই ভাবছি মা, টাকা নিয়ে আর ঋণভার বাড়াতে চাইনে'। কারো দান গ্রহণ করে না, কখনো মিথ্যে বলে না ও। একদিন এসে বলল—'দিন মা ভাত!' ভাত রান্না হয়নি,

বল্লাম 'ভাত তো রাঁধিনি বাবা।' তাতে বল্লে কি জানিস,—বললো—'রান্না তবে করুন মা—না হলে চাকরদের ভাত আনিয়ে দিন। ভাত খাব বলেছি, ভাতই খেতে হবে, নইলে মিথ্যে কথা বলা হবে।' সেই রাত্রে চাকরদের ভাত ওকে দিতে হল। খেয়ে আবার বল্লে—'আপনার বাড়ীতে চাকররা কেমন খায় মা, সেটা দেখে নিলুম কেমন কৌশলে—আপনি বুঝতেই পারলেন না!'

তপতী বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল,—তারপর করুণ কণ্ঠে কহিল,—এসব কথা তুমি আমায় একদিনও তো বলনি মা!

—তুই যে কিছু খবর রাখিস না, তা আমি কি করে জানবো বাছা!

তপতী আর কথা না বাড়াইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ভুল তাহার হইয়া গিয়াছে, অত্যন্ত সাংঘাতিক ভুল, সংশোধনের উপায় আছে কি না কে জানে!

তপতী সারারাত্রি বসিয়াই কাটাইয়া দিল।

জীবনের ধারাই যেন বদলাইয়া যাইতেছে তপতীর। স্নান সারিয়াই সে আসিয়া দাঁড়াইল তপনের কক্ষের সম্মুখে। পূজারত তপন স্তোত্র পাঠ করিতেছে, 'শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে, সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে' তপতীও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া গেল মনে মনে। এমনি কত কিছুই সে তাহার ঠাকুরদার কাছে শিখিয়াছিল, সবই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ এই মহার্ঘ রত্নগুলি রহিয়াছে তাহারই স্বামীর কণ্ঠে। হাঁ, স্বামী! তপতীর যেন আজ তপনকে স্বামী ভাবিতে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ হইতেছে। কেন সে এতদিন দেখে নাই তপনকে! কেন এতবড় ভুল করিল! ঐ যে সুমিষ্ট কণ্ঠের প্রণতি ঝরিতেছে,—

'অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গ জটাধরায়,
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥'

কি অপরূপ সুন্দর ঐ শ্লোকমালা! শেলী, কীটস্, বায়রণ, টেনিসন সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ যে—'অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি!' উহাই কি কিছু কম সুন্দর—কম আন্তরিকতা পূর্ণ!

তপতীর মনে হইল, ঠাকুরদা বাঁচিয়া থাকিলে তাহার আজ এই দুর্গতি হইত না। কিন্তু ঠাকুরদা তাঁহার কাজ যথাসম্ভব করিয়া গিয়াছেন, ষোল বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তপতীকে শিখাইয়া গিয়াছেন আর্য্যনারীর কর্ত্তব্য—স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি, সমাজের প্রতি! আধুনিক সমাজের সহিত সে পদ্ধতি হয়তো মিলে না, কিন্তু তপতী সমন্বয় করিতে পারিল না কেন? কেন সে ঠাকুরদার এতদিনের শিক্ষা একেবারে ভুলিয়া গেল!

তপতীর মনে হইল তাহার পিতামাতাই ইহার জন্য দায়ী। একদিন তপতীর অন্তর ছিল শুদ্ধ হোমাগ্নির মত পবিত্র, আজ তাহা বাড়বাগ্নি হইয়া উঠিয়াছে। দুটাই অগ্নি, কিন্তু তফাৎ আছে, কত বেশী তফাৎ তাহা হোমশিখা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না। তপতীর মনে পড়িল—জন্মদিনে তপন তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল—'জীবনে তোমার হোমশিখা জ্বলে উঠুক', হয়ত আজ তাই হোমশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঋত্বিক তো আসিতেছে না! আসিবে, আসিবে, তপতীর জীবনে তাহার পিতামহের আশীর্ব্বাণী ব্যর্থ হইবে না।

তপন উঠিয়া কখন খাইতে গিয়াছে। তপতীও বুঝিতে পারিয়াই খাবার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, —খেয়ে একটু ঘুমো গিয়ে মা,—মা মৃদু হাসিলেন।—লজ্জায় তপতী লাল হইয়া উঠিল। মা হয়তো ভাবিয়াছেন, তপনের সহিত তপতী রাত্রী জাগরণ করিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তপতী। কথাটা সত্য হইলে আজিকার লজ্জাটা তপতীর আনন্দেরই দ্যোতক হইতে পারিত, কিন্তু সত্য নয়—কবে যে সত্য হইবে, তাহাও তপতী জানে না। তাহার

শ্বাস ভারি হইয়া উঠিল। তপতীর দিকে না চাহিয়াই তপন কহিল, —অধ্যয়ন একটা তপস্যা মা, ভাল করে ওকে পড়তে বলুন।

—হাঁ, বাবা, পড়ছে তো, আর তুমি কি করবে বাবা?—মাতা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

তপনও হাসিয়াই জবাব দিল,—'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। ও বিদ্যার চিন্তা করুক মা, আমি অর্থ চিন্তা করছি। ওর তো অর্থের অভাব নেই।

—তোমার বুঝি বড্ড অভাব?—মা প্রশ্নটা করিলেন অভিমানাহত স্বরে।

—অর্থের অর্থটা অত্যন্ত ব্যাপক মা, তার অভাব আমারও আছে বৈকি। ধরুন, পুরুষার্থ, পৌরুষার্থ, পরমার্থ—অর্থের মানে তো শুধু টাকা নয়!

মা চুপ করিয়া রহিলেন; তপতী মা'কে লক্ষ্য করিয়াই যেন অত্যন্ত নিম্নস্বরে কহিল,—আবার অনর্থের মূল হয় অর্থটা সময় সময়।

—ব্যবহার না জানলেই হয়। ব্যবহারের গুণে বিষও অমৃত হয়ে উঠে। —উত্তরটা তপনই দিল।

তপতী চুপচাপ বসিয়া ভাবিতেছে. তপন তাহার কথার উত্তর দিয়াছে। আরো কিছু কথা বলিয়া দেখিবে কি, তপতীর উপর উহার মনের ভাব কিরূপ? বলিল,—অনেক সময় বিষকেও আবার অমৃত বলে ভ্রম হয়।

—বিষকে বিষ বলে চিনবার শক্তিটা মানুষ লাভ করে জন্মার্জিত সংস্কার থেকে, আর শিক্ষা দ্বারা অর্জন করে তাকে অমৃতরূপে ব্যবহার করার শক্তি!

মা উহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। আনন্দিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন,—বিষ আর অমৃতে তাহলে তফাৎ কোথায় বাবা?

—শুধু ব্যবহারে মা। আর কোন তফাৎ নেই। সব ভাল আর সব মন্দর অতীত এই বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু! দেশ ভেদে, কাল ভেদে, পাত্র ভেদে সে বিষ হয়, আবার অমৃতও হয়; যেমন নারী, কোথাও বিলাসের ধ্বংস মূর্ত্তি, কোথাও কল্যাণী মাতৃমূর্ত্তি।

তপনের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, উঠিয়া যাইতেছিল, তপতী কহিল—ধ্বংসমূর্ত্তিকে কল্যাণী মূর্ত্তি করে গড়ে তোলবার ভার থাকে শিল্পীর হাতে।

—হাঁ, কিন্তু শিল্পীর নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাত সইবার জন্য মূর্ত্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয়।—বলিয়াই তপন চলিয়া গেল! কিন্তু কি সে বলিয়া গেল? তপতীকে কী তাহার নিষ্ঠুর ছেনীর আঘাত সহ্য করিতে হইবে? হয় হোক,—তপতী সহ্য করিবে। কথায় কথায় যে লোক বাক্যের এমন ফুলঝুরি ফুটাইতে পারে, অত্যন্ত সহজ ভাষায়, অতিশয় আন্তরিকতা দিয়া যে বলিতে পারে, আমি শিল্পী, আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়াই আমার নিষ্ঠুর অস্ত্রাঘাতে তোমায় নিখুঁৎ করিয়া তুলিব, তপতী তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। আসুক ঐ রূপকার, আঘাতে আঘাতে তপতীর সমস্ত কুশ্রীতা ঝরাইয়া দিক, ফুটাইয়া তুলুক তপতীর সারা দেহ-মনে অপরূপের মহিমান্বিত ঐশ্বর্য্য!

তপতীর চোখে দুই বিন্দু জল টলমল করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল মা'র কাছ হইতে। আশ্চর্য্য! এমন না হইলে মা-বাবা উহাকে কেন এত ভালবাসিবেন? তপতী কেন এতকাল দেখে নাই? কেন সে বন্ধুদের কথা শুনিয়া আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনকে এমন করিয়া অবহেলা করিয়াছে!

কালই মাদ্রাজ চলিয়া যাইবে। আজ বিকালে উহাকে পার্টিতে লইয়া যাইতে হবে। দেখিবে সকলে, তপতীর স্বামী অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য!

বিকালে সুসজ্জিতা তপতী অপেক্ষা করিতেছিল, তপন আসিতেই তাহাকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং গাড়ী চালাইয়া চলিল। মুখখানি তাহার

হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে তাহার অন্তর আজ প্রেমের রক্তিমায়! যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার সহিত তপন ও তপতীকে বসানো হইল। তপন ভাবিতেছে, তাহাকে এভাবে এখানে লইয়া আসিবার কি কারণ থাকিতে পারে তপতীর পক্ষে! তপতী কি আজ এতকাল পরে তাহাকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করিল নাকি? না,—লোকের কথা বলা বন্ধ করিবার জন্যই তপতী এ-খেলা খেলিতেছে! আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য তপতীর মত মেয়ে সবই করিতে পারে। কিন্তু তপতীর অদ্যকার আচরণ অত্যন্ত আন্তরিক। তপন নীরবে ভাবিতে লাগিল।

একটি মেয়ে বলিল,—আপনি নিরামিষ খান—এখানে অসুবিধা হবে না তো?

—না, কিছু না। মাংস ছুঁলেই আমার জাত যায় না।

—তাহলে খান না কেন? গোঁড়া তো আপনি নন দেখছি?

—অনেকগুলো কারণ আছে না-খাবার। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক কারণটা হচ্ছে,—বহু যুগ ধরে সিদ্ধকরা খাদ্য খেয়ে আর শাকশব্জি খেয়ে মানুষের পাকস্থলী বেশী মাংস খাবার যোগ্যতা হারিয়েছে! যে-কোন মাংসাশী জন্তুর পাকস্থলীর সঙ্গে মানুষের পাকস্থলীর তুলনা করলেই সেটা বোঝা যাবে।

—অন্য কারণটা কি?

—পৃথিবীতে ফল-মূল-শস্যের তো অভাব নাই—মাংস খাওয়া নিষ্প্রয়োজন; অন্ততঃ আমাদের গরম দেশে, অলস কর্ম্ম-জীবনে কিছুই দরকার হয় না মাংস খাবার।

—মাংস কিন্তু শরীরে যথেষ্ট শক্তির সঞ্চার করে।

—ওটা ভুল ধারণা—ঘোড়ার থেকে শক্তি নেই বাঘের। থাবা থাকলে ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধে বাঘ নিশ্চয়ই হেরে যেতো! ঘোড়া মাংস খায় না।

তপনের যুক্তির উৎকৃষ্টতা সকলকে আকৃষ্ট করিল। মেয়েটি বলিল,—আরো কোন কারণ আছে না কি আপনার মাংস না-খাবার?

—হাঁ, মনের স্বাত্বিকতা ওতে ক্ষুণ্ণ হয়। মনকে যারা লালন করতে চায় মানুষের মত করে'—এই উষ্ণ দেশে তাদের মাংস না-খাওয়াই উচিত। পার্থিব চিন্তার ধারা হয়তো ওতে বিকৃত না হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর ওপারের বিষয়ও চিন্তা করে এমন লোকের অভাব নাই।

আলোচনাটা গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে, তরল করিবার জন্য একজন কহিল,—আপনি এতকাল আমাদের কাছে আসেন নি কেন, বলুন তো! ভয়ে?

অপরাধটা তপতীরই। সে তপনকে লইয়া আসিবার জন্য কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তপন কি বলে, শুনবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল। তপন হাসিয়া উত্তর দিল,—অত্যন্ত বে-মানান ঠেকবে বলে'। পলাশ ফুল বনেই থাকে—নিউ মার্কেটের কাচের ঘরে ওকে মানায় না!

কথাটায় তপনের বিনয়াতিশয্যের সহিত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ মিশিয়া আছে।

—আমরা বুঝি কাচের ঘরে থাকি!—আমাদের এমনি অসম্মান করবেন নাকি আপনি? মেয়েটি বলিল।

—ঐ ভয়েই তো আসিনি! আপনাদের সম্মান এবং অসম্মানের দেওয়ালগুলো এত ঠুন্‌কো যে ঢুকতে ভয় করে। অতি সাবধানে টেলিফো করে বলতে হয়—চার ডজন গোলাপ, দু'ডজন ক্রীসান্থীমাম, পাঁচ ডজন কস্‌মস্‌...

তপনের বলার ভঙ্গীতে অনেকেই হাসিয়া উঠিল? কিন্তু যে মেয়েটি অসম্মানের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল বিদ্রূপ করিয়া—আর বনে গিয়ে আপনার ঘাড় মটকে আনতে হয়, কেমন! তপন নিঃশব্দে হাসিল। মেয়েটি পুনরায় বলিল,—আমরা যে কাচের ঘরের সাজানো ফুল, সেটা আপনি প্রমাণ করুন, নইলে ছাড়ছি না।

—না ছাড়লে অসুবিধা হবে না, কাচের ঘরে ঢুকতে সাধ হয় মাঝে মাঝে !

—তা হলে এবার ঢুকে পড়লেন—কেমন ? মেয়েটি তপনকে ঠকাইয়াছে !

—আমায় ঢুকবার অনুমতি দিয়ে এবার কিন্তু আপনিই প্রমাণ করলেন যে এটা কাচের ঘর !—তপন হাসিল।

মেয়েটি আপনার বাক্যজালে জড়িত হইয়া এমন নির্ব্বোধের মত ঠকিয়া গেল দেখিয়া সকলেই বলিল,—যা-যা, কথা কইতে জানিস নে !—লজ্জিত হইয়া মেয়েটিও হাসিতে লাগিল। তপতীর অন্তর আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছে ! এই তপন, তাহার স্বামী, যাহার সহিত কথায় পাল্লা দিতে পারে, এমন মেয়ে এখানে একটিও নাই !

মিঃ অধিকারী এবং মিঃ বোস আসিয়া দর্শন দিলেন তপনের আসনের পার্শ্বে ! মিঃ বোস ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—পূজোর সঙ্গে পার্টির মিক্সচারের ঋষি-সূত্রটা কি তপনবাবু ?

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তপন উত্তর দিল,—মোগলের সঙ্গে খানা খাওয়া।

মিঃ বোসকে পরাজিত দেখিয়া মিঃ অধিকারী আরম্ভ করিলেন,—টিকির মাহাত্মটা একটু বর্ণনা করবেন তপনববাবু, আপানার পাঁচালী থেকে ?

সদাহাস্যময় তপন তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করিল,—

টিকির মাহাত্ম্য-কথা করিব বর্ণন,
অবধান কর সব টিকি-হীন জন !
টিকিটী রাখিবে যেবা জয় হবে তার,
টিকি না-থাকায় হারে জজ্ ব্যারিষ্টার !
কহিল টিকির কথা বেচারা তপন,
টিকিতে বাঁধিয়া নিও রমণীর মন !

হা-হা করিয়া তরুণীর দল কলহাস্যে সভা মুখরিত করিয়া তুলিল। মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস রেষে ফুলিয়া উঠিতেছিলেন—মিঃ বোস কহিলেন,—অত উৎফুল্ল হবেন না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, 'ফুলস্ রাস্ ইন্—হোয়্যার এঞ্জেল্‌শ্...' মিঃ বোস থামিলেন!

ক্রোধে তপতীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাহার স্বামীকে তাহারই সম্মুখে ইহারা 'ফুল' বলিবে এবং তাহা তাহারই জন্য? কিন্তু তপনই জবাব দিল,—দেবদূতরা বেশি সাবধানী, তাদের পথ গোণা-গাঁথার গলিতে, আর বোকাদের পথ দরাজ বড় রাস্তা—তাই এ সব ব্যাপারে বোকারাই জয়ী হয় চিরদিন! জয়ী না হলেও তারা মরতে পিছোয় না, চালাক দেবদূতদের মত লাভ আর লোকসান খতিয়ে দেখবার বুদ্ধি তাদের নেই।

মুখের মত জবাব হইয়া গিয়াছে। নির্ভীক তপন নিঃসঙ্কোচে নিজেকে বোকা মানিয়া লইয়াই যাহা জবাব দিল, তরুণীর দল তাহার প্রশংসা না করিয়াই পারে না।

জনৈক মহিলা কহিলেন,—আপনি বোকা? চালাক কে তবে!

—যাদের 'লাক্' চা-চকোলেট আর চপ খেয়ে দিনে দিনে ফুলে ওঠে। তপন উত্তর দিল।

কথাটার মধ্যে যে হুল ছিল তাহার বিষ তপতীকে পর্যন্ত কুণ্ঠিত করিয়া দিল। মিঃ অধিকারী দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—আপনি আর আমাদের চা-চপ খেতে ডাকবেন না তপতী দেবী, উনি সইতে পারেন না, বোঝা যাচ্ছে!

তপতী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল,—আমি বড্ড লজ্জা পেলাম মিঃ অধিকারী, আমিই আপনাদের কাছে মাফ্ চাইছি এর জন্যে। তপতী হাত যোড় করিল।

যেন কোন মহার্ঘ বস্তু লাভ করিয়াছে, তপন এমনি ভাবে হাসিয়া উঠিল, বলিল,—আমিও মাফ্ চাইছি মিঃ অধিকারী, কিন্তু রসিকতা করে আঘাত করতে এলে প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত —এই কথা আমাদের বোকার অভিধানে লেখে। আর আমি শুধু প্রমাণ করে দিলাম যে বোকা অসুররা মাঝে মাঝে জয়লাভ করলেও স্বর্গরাজ্য পরিণামে দেবতাদেরই, কারণ, বোকা অসুররা সেটা রক্ষা করতে পারে না—একথা জেনেও তারা স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য হাত বাড়ায়—বোকা কি না তাই! স্বর্গ কিন্তু দেবতাদের পথ তাকিয়েই থাকে!

মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস খুসী হইয়া উঠিয়াছেন তপতীর সহানুভূতি পাইয়া! তপন বলিয়া চলিয়াছে তখনো,—আপনারা আমার এই ইচ্ছাকৃত অপরাধটা ক্ষমা না করলেও জয়ী আপনারাই!

তপন কি বলিতে চাহিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস তাকাইয়া রহিলেন। তপতী কিন্তু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেন সে মরিতে সহানুভূতি দেখাইতে গেল! মিঃ অধিকারীরা চটিলে তাহার কি বহিয়া যাইবে! কিছু একটা বলা উচিত ভাবিয়া সে বলিল, —খাওয়ার খোঁটা দেওয়া খুব অন্যায়!

তপন কহিল,—চা-চপ-খাদকদের চালাক আর 'লাকী' বলায় কোন ব্যক্তিকে খোঁটা দেওয়া হয়, আমার ধারণা ছিল না।

—অন্য ক্ষেত্রে হয়ত কথাটা দোষের নয়, এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভদ্র শোনাচ্ছে।

তপন নির্ব্বিকার চিত্তে তপতীর কথার উত্তরে মিঃ অধিকারীকে হাসিয়া কহিল,—ভদ্র তো আমি নই মিঃ অধিকারী—বুদ্ধিও নাই। আমার কথাটা তো আপনাদের সুবুদ্ধি হেসেই উড়িয়ে দিতে পারতো!

একটি তরুণী কহিল,—রিয়েলি। রসিকতা করতে এসে রাগ করা চলে না। আপনারা 'ফুল' বলায় উনি কত সুন্দর করে জবাব দিলেন

আর উনি এমন কিছুই বলেন নি যাতে আপনাদের চটে যাওয়া চলে।

মিঃ অধিকারী এতক্ষণে বুঝিলেন, চটিয়া যাওয়া তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। কহিলেন,—আপনাকে এ রকম কথা বললে কী আপনি করতেন?

তপন বলিল,—আমার বোকা বুদ্ধিতে চা আর চপ বেশি করে খেয়ে 'লাকী' হতাম।

তপনের মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ বোস কহিলেন,—আচ্ছা যেতে দিন—আসুন, চা'ই খাওয়া যাক আর এক এক কাপ!

একটি মেয়ে বলিল,—তা হলে আপনি সত্যই চালাক হতে চান?

মিঃ অধিকারীর মুখখানা তখনও গম্ভীর ছিল, বলিলেন,—দিন, খেয়েছি কিন্তু!

তপন হাসিয়া কহিল,—কিছু কিন্তু না মিঃ অধিকারী, অধিকন্তুটা অনেক সময় আরাম দেয়। যেমন ধরুন—চশমার উপর সান্-গগল্, চিবুকের নিচে নেকটাই, পাঞ্জাবীর উপর চাদর, চামড়ার উপর উল্কী, চায়ের উপর চাঁদ মুখ……

হাসিতেছে সকলেই। মিঃ অধিকারীও আর না হাসিয়া পারিলেন না। স্মিতমুখে কহিলেন,—রিয়েলি—বাংলা ভাষাটা আপনার আশ্চর্য্য রকম আয়ত্তে।

মিঃ বোস কহিলেন,—কিন্তু উনি আমাদের বন্ধু হতে চান না; 'সো শ্যরী!'

—'সার্টেনলি হি উইল বি।' নইলে আমরা ওঁকে ছাড়বো না—মিঃ অধিকারী কহিলেন।

তপন নীরবে চা খাইতেছে। ইচ্ছা করিয়াই যে কঠিন পরিস্থিতির সে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা হইতে সে মুক্তি লাভ করিল এতক্ষণে।

তপতীর মনে এখনো ইহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তপন বুঝিল, ইহাদের এতটুকু অসম্মান আজও তপতী সহিতে পারে না! আর তপনের বেলায়?—আমাকে এবার যেতে হবে, অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন! তপন আবেদন করিল।

—না—না—না, ভারী সুন্দর লাগছে আপনার কথা, এখনি কেন যাবেন?

তরুণীর দল তপনকে ছাড়িতে চাহে না। মিঃ অধিকারী ও মিঃ বোস ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিতেছেন! তাঁহাদিগকে অসম্মান করিয়াই লোকটা তরুণীমহলে খাতির জমাইয়া ফেলিতেছে! মিঃ বোস কহিলেন,—কারো কথায় ওঁর নীতি বদলায় না, শুনেছি। অনুরোধ বৃথা।

মিঃ অধিকারীও কথাটায় সায় দিয়া কহিলেন,—কাজের মানুষদের আটকাতে নেই।

তরুণীদের একজন চটিয়া বলিল,—আপনারা চান, যে, উনি চলে যান, নয়? রাগটা সামলাইতে গিয়া মিঃ বোস ও মিঃ অধিকারী চুপ হইয়া গেলেন। সমস্ত অবস্থাকে সামলাইবার জন্য তপতী কহিল,—না রে, কাজ আছে—যাই আমরা।

—তুই থাম্ তো তপি! ওকে এতকাল কিসের জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলি? বল্!

তপতী কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তপন হাসিয়া কহিল,—অচল টাকা বার করা বোকামী—লুকিয়েই রাখতে হয় নিতান্ত ফেলে দিতে না পারলে!

তপন উঠিল; তপতীর সারা মন আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বেদনার সুর! তপনকে সে অচল টাকাই মনে করিয়াছে। বারম্বার আঘাত করিয়াছে হাতুড়ি দিয়া,—নখের কোণায় বাজাইয়া দেখে নাই।

গাড়ীতে চলিতে চলিতে তপন একটা কথাও বলিতেছে না; তপতীর মন বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। কেন সে মিঃ অধিকারীদের

সহানুভূতিদেখাইতে গেল ? যে-কোন অবস্থা-বিপর্যায়কে অনায়াসে আয়ত্তে আনিবার শক্তি যে তপনের অসাধারণ, ইহা তপতী আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তপন নিজেই তো সমস্ত সামলাইয়া লইল; বরং রসিকতা করিতে আসিয়া চটিয়া যাওয়ার জন্য মিঃ অধিকারী লজ্জাই পাইলেন। কিন্তু তপন কী ভাবিতেছে তপতীর সম্বন্ধে ? হয় তো ভাবিতেছে, তপতী আজও উহাদের জন্য তপনকে অভদ্র বলে। এখনো তপতী উহাদের অসম্মান সহিতে পারে না! তপতীর মাথা ঠুকিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

গেটে গাড়ীটা ঢুকাইয়া দিয়া তপন পুনরায় বাহির হইয়া গেল।

প্রেম যখন অন্তরে সত্য সত্যই জাগিয়া উঠে তখন অনেক কথাই বলিবলি করিয়া বলা হয় না। সমস্ত রাত্রি তপতী জাগিয়া রহিয়াছে; এতটা সময় চলিয়া গেল, অথচ কিছুই তাহার বলা হইল না তপনকে। কতবার তপতী ভাবিল—ঐ তো ও-ঘরে তপন ঘুমাইতেছে, তপতী গিয়া ডাকিলেই পারে, কিন্তু লজ্জায় পা চলিতেছে না। এত কাণ্ডের পর তপতী আজ কি করিয়া তপনকে ভালোবাসার কথা বলিবে! পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তপতী আপনাকে নিঃশেষে তপনের কাছে মুক্ত করিয়া দিবার কোনো পথই খুঁজিয়া পাইতেছে না। তপন যদি তাহাকে তাড়াইয়া দেয়! যদি বলে—কেন এ ছলনা করিতে আসিয়াছ? তপতী সে অপমানও সহ্য করিতে পারে; কিন্তু তপন হয়ত কিছুই বলিবে না, নীরবে শুনিবে এবং নির্লিপ্তের মত চলিয়া যাইবে। তথাপি তপতী একবার চেষ্টা করিবেই; রাত্রিতে আর উঠাইয়া কাজ নাই, ঘুমাক, সকালে সময় পাওয়া যাইবে নিশ্চয়।

প্রত্যূষে স্নান সারিয়া তপতী গিয়া দাঁড়াইল খাইবার ঘরে। মাও আসিলেন, তপনের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে হইবে।

—কাল পার্টিতে তপনকে দেখে সবাই কি বললো রে খুকী? মাতার প্রশ্নের উত্তরে তপতী হাসি মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর বলিল, —সবাই খুব ভালো বললো।

মা মধুর হাসিয়া বলিলেন,—আমার কথা ঠিক তো? দেখ্ এবার!

তপতী কিছু বলিল না; হাসি মুখে লুচি বেলিতে লাগিল। তপন আসিয়া ঢুকিল। এত সকালে আসিবে, মা তাহা ভাবেন নাই। বলিলেন, —আটটায় ট্রেণ বাবা, এত তাড়া কেন তোমার? ছটা তো বাজলো।

—সাতটায় বেরবো মা, খাবো, কাপড় পরবো,—এক ঘণ্টা তো সময়! দিন।

তপন খাইতে বসিল। তাহার ললাটের ত্রিপুণ্ড্র-রেখায় আজ রক্ত-চন্দনের আভা, পরণে ক্ষৌম-বস্ত্র, গলায় উত্তরীয়। তপতী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল এই অসাধারণ পবিত্রতার দিকে। তপন কথা বলিতেছে না দেখিয়া মা কহিলেন,—পৌঁছেই চিঠি দিও বাবা, ভুলো না যেন।

—না মা, চিঠি দেবো পৌঁছেই।

—খুকী তো ষ্টেশনে যাচ্ছিস্ 'সি-অফ্' ক'রতে?

—না মা, ও কি জন্যে কষ্ট করে যাবে? ফিরতে বেলা হয়ে যা'বে অনর্থক! তা'ছাড়া আমি ট্যাক্সিতে যাচ্ছি,—বাড়ীর গাড়ী নিলাম না—বলিয়া তপন খাইতে লাগিল। তপতী কিছুই বলিতে পারিল না।

বাকী যাহা বলিবার তপতী বলিবে ভাবিয়া মা আর কিছু বলিলেন না। তপন নীরবে খাইয়া উঠিয়া গেলে মা তপতীকে চা ও খাবার দিয়া বলিলেন,—সুটকেশগুলো গুছিয়ে দিয়েছিস?

দারুণ মানসিক উত্তেজনায় তপতীর সে কথা মনেই ছিল না।

—যাচ্ছি—বলিয়া তপতী তাড়াতাড়ি চা খাইয়া তপনের ঘরে আসিল।

স্থটকেশ গুছানো এবং চাবিবন্ধ রহিয়াছে ; তপনের কাপড় পরাও হইয়া গিয়াছে। একটা চাকর তাহার জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিল। অন্য একজন স্থটকেশ দুইটি গাড়ীতে লইয়া গেল। তপনও বাহিরে যাইতেছে,—সম্মুখে তপতীকে দেখিয়া বলিল,—আচ্ছা চল্লাম, নমস্কার। তপন চলিয়া গেল মাকে প্রণাম করিতে, পরে মিঃ চ্যাটার্জিকেও প্রণাম করিল—এবং নীচে নামিয়া গেল।

সম্বিতলব্ধা তপতী ছুটিয়া নীচে আসিবার পূর্ব্বেই তপন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে।

কিছুই বলা হইল না—না, বলিতেই হইবে। তপতী তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ী আনাইয়া ষ্টেশনে ছুটীল। ট্রেণ ছাড়িতে মাত্র কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে। তপতী ছুটিতে ছুটিতে গিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিয়াই দেখিল—বোনটির হাত ধরিয়া তপন দাঁড়াইয়া আছে। মনটা তাহার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু সবলে সমস্ত দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া তপতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—মেয়েটা কাঁদিতেছে, উদ্বেল, আকুল, হইয়া কাঁদিতেছে। তপন বলিতেছে তাহাকে,—লক্ষী বোনটি, এমন করে কাঁদে না—যাও, স্বামীর কাছে যাও, স্বামীর চেয়ে বড় বস্ত নারী-জীবনে আর কিছু নেই, এই কথা তোকে আমি আজন্ম শিখিয়ে এসেছি—ওরে ধর ওকে। একটি সুন্দর যুবক আগাইয়া আসিল। মেয়েটা কিছুতেই তপনকে ছাড়িতেছে না, হু হু করিয়া কাঁদিতেছে। তপন তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল,—ছিঃ মীরা, এতকালের শিক্ষা আমার পণ্ড করে দিবি তুই? চুপ্ কর্—আয়, ওঠ্, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হোস্—আকাশের মত উদার হোস্—সূর্য্যালোকের মত পবিত্র থাকিস্।

গাড়ী ছাড়িতেছে। তপন পা-দানিতে উঠিয়া পড়িল। চোখের জলে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, তথাপি মেয়েটা তাকাইয়া আছে অপস্রয়মান গাড়ীটার দিকে। তপতী যে এত কাছে দাঁড়াইয়া আছে,

উহারা কেহ দেখিলই না। তপন এমুখে ফিরে নাই, আর ইহারা তপতীকে চেনে না। কিন্তু কেন ও এত কাঁদিতেছে? মাদ্রাজ গেল, কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে,—তাহার জন্য এত কান্নার বাড়াবাড়ি কেন? তপতী বিস্মিতা এবং ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। কি গভীর কারণ থাকিতে পারে ঐ কান্নার? ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া সে সহানুভূতি জানাইতে মীরার হাতটা ধরিতে গেল, চমকিয়া মীরা কহিল,—কে আপনি?—তৎক্ষণাৎ তপতীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,—ওঃ লজ্জা করলো না আমায় ছুঁতে?—হাতখানা মীরা টানিয়া লইল।

তাহার স্বামী বলিল,—ছিঃ ছিঃ, ওরকম করে বলতে আছে?

মীরা সরোষে গর্জিয়া উঠিল,—জুতোর ঠোক্করে ওর নাক ভেঙ্গে দেবো না! দাদাকে আমার দেশান্তরী করে দিল, আবার 'লাভারের' দেওয়া আংটী হাতে পরে 'সি-অফ্' করতে এসেছে! চলো—চলো—ওর মুখ দেখলে গঙ্গা নাইতে হয়। মীরা তৎক্ষণাৎ স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

যে কথা কেহ কোনদিন বলে নাই, বলিবার কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারে না, মীরা তাহাই বলিয়া গিয়াছে। তপতীর সমস্ত আভিজাত্য সমস্ত অহঙ্কার ধরার ধূলায় লুটাইয়া দিয়া গেল। 'লাভারের আংটি হাতে পরে—তপতী শিহরিয়া আপনার বাম হাতের অনামিকার দিকে চাহিল; মিঃ অধিকারীর প্রদত্ত আংটিটার হীরকখণ্ডটি জল্‌জল্ করিতেছে, জলন্ত অঙ্গারের মত। আপনার অজ্ঞাতসারেই তপতী আংটিটা খুলিয়া ফেলিল।

তপন যাহা কোন দিন বলে নাই, মীরা তাহাই নিতান্ত সহজে বলিয়া দিল। বিরুদ্ধে তপতীর কিছুই বলিবার নাই। আজ দীর্ঘ পাঁচ মাস সে ঐ আংটি পরিয়া আছে। তপতীর চরিত্রের বিরুদ্ধে এই জলন্ত, জাগ্রত প্রমাণকে লুপ্ত করিবার শক্তি আজ আর কাহারও নাই।

মৃত্যু-পাণ্ডুর তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

—ওর বোনের ঠিকানাটা তুমি জানো মা? তপতী মাকে প্রশ্ন করিল।

—না রে—কেন, তুই জানিস্ নে? দেখিস্ নি তাকে তুই? মা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন!

—দেখেছি সেদিন ষ্টেশনে—কিন্তু ঠিকানা জানবার আগেই চলে গেল।

—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে মা; ওকে একদিন তোর গিয়ে আনা উচিৎ ছিল।

—তুমিও তো বলোনি মা, আজ বলছো অন্যায় হয়েছে। তপতীর কণ্ঠস্বর ব্যথাকরুণ শুনাইতেছে।

স্বামী-বিরহ-বিধুরা কন্যার কথা শুনিয়া মা সস্নেহে বলিলেন,—তপন ফিরে এলেই যাবি একদিন;—আজ বোধ হয় তার চিঠি পাবি তুই!

বিষণ্ণা তপতী বিশুষ্ক মুখে চলিয়া গেল। সে চিঠি পাইবে! এত বড় ভাগ্য সে অর্জ্জন করে নাই আজও! এই দীর্ঘ সাত দিন প্রতিটি মুহূর্ত্ত তপতীর অন্তর ধ্যান করিয়াছে তপনের মূর্ত্তি—কিন্তু তাহার অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে। শুধু দেরী হইলেই হয়তো ক্ষতি হইত না, তপতীর অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কার তপনকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে, বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে তপতীর অন্তর হইতে তাহার অন্তরতমকে। ভাবিয়া ভাবিয়া তপতী ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার পুণ্যশ্লোক ঠাকুরদা যেন তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলেন,—এতো শেখালাম খুকী—সব পণ্ড করে দিলি! কিন্তু কেন সে এত ভাবিতেছে! তপন তো কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে। মীরা বলিয়াছে তাহাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ কথা, কিন্তু তপন তো কোনদিন কিছু বলে নাই। যেদিন সে মিঃ ব্যানার্জির কোলে শুইয়া

তপনের কাছে মুক্তি-ভিক্ষা মাগিয়াছিল, সেদিন—হ্যাঁ সেদিন কিন্তু তপন অসহ্য বেদনায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

সময় আর কাটিতে চাহে না—কতক্ষণে ডাক আসিবে! তপতী জানে তপন তাহাকে চিঠি লিখিবে না—কিন্তু মা'র পত্রে খবরটা জানা যাইবে। অতদূর রাস্তা, ইণ্টার ক্লাসে গিয়াছে, ভালয় ভালয় পৌছাইলেই ভাল।

মা ডাকিলেন,—আয় খুকী—চিঠি এসেছে, পড়।

তপতী পড়িল,—'মা, আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে নিরাপদে এসে পৌছেছি; আছি সমুদ্রের কিনারে। এ নীড় কালই ছাড়তে হবে। গত রাত্রে শুনেছি সাগরের অশ্রান্ত কল্লোল; মনে হচ্ছিল, দুহিতা ভারতের দুর্দ্দশায় বিগলিত-হৃদয় মহাসিন্ধুর আর্ত্তনাদ বুঝি আর থামবে না।

আমার কোটি কোটি প্রণাম জানবেন, ইতি,—তপন।'

সামান্য কয়েকটা লাইনমাত্র, কিন্তু তপতীর মনে হইল, দুহিতা ভারতের দুর্দ্দশায় বুঝি কোন হৃদয়-সমুদ্র ক্রন্দনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। মা'কে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া তপতী আসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

বিকালে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ বোস, মিঃ অধিকারী ইত্যাদি সব আসিয়াছেন। তপতী যাইতে পারিবে না বলিয়া দিল। মা মেয়েকে একটু অন্যমনা করিবার জন্য বলিলেন, —যা-না মা, একটু গল্প কর গিয়ে—না হয় খেলা কর গে একটু!

তপতী অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—যাবো না যাও!

মা তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া নীরবেই চলিয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন—সেই তপতী, যে দিনরাত হাসিখুশি আর গল্প লইয়া মাতিয়া থাকিত, সেই কিনা স্বামী-বিরহে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

তাঁহার আনন্দ হইল, হাসিও পাইল। ভাবিলেন, তপন খুকীকে আলাদা পত্র না দেওয়ায় উহার অভিমানটা হয়তো বেশী হইয়াছে। যা

রাগী মেয়ে! তপন যে খুব ব্যস্ত রহিয়াছে সেখানে, ইহা খুকী কেন বুঝিতেছে না!

কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, প্রায় পনর দিন কাটিল, না-আসিল খুকীর চিঠি, না-বা মা'র চিঠি। মা-ও এখন ভাবিতেছেন। স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনিও তপনের কোনপত্র পান নাই। তপতীকে ডাকিয়া কহিলেন,—তোকে কি বলে গেছে রে খুকী?

—মাস দুই দেরী হবে, বলেছে মা—তপতী মৃদুস্বরে উত্তর দিল।

মা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তপতী অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ে কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া মা আর কোন কথা তুলিলেন না।

তপতীর কিন্তু মনে পড়িয়া গিয়াছে মীরার কথাটা। 'দাদাকে আমার দেশান্তরী করে দিল!' সত্যিই কি তাই? সত্যই কি তপন আর আসিবে না? তারই জন্য কি মীরা সেদিন অত কান্নায় ভাঙিয়া পড়িতেছিল! হয়তো তাই—হয়তো তপতীকে সত্য সত্যই তপন মুক্তি দিয়া গিয়াছে!

তপতী আর অধিক ভাবিতে ভরসা পাইতেছে না। ভাবনার সূত্র ধরিয়া উঠিয়া আসিতেছে মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ বোস, মিঃ সান্যাল, তপনকে অপমান করিতে তপতী যাহাদিগকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছে। যাহারা বারংবার বলিয়াছে,—তপন নির্লজ্জ, উহার মান-অপমান জ্ঞান নাই, তাহারাই আজও সহস্র অবহেলা সহ্য করিয়া তপতীর দরজায় ধর্ণা দেয়। আর তপন, প্রত্যেকটি কথায় যাহার অনুভূতির মণি-মাণিক্য ছড়াইয়া পড়ে, যাহার বিনয়ের মধ্যেও জাগিয়া থাকে যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের আভিজাত্য, অপমানকে যে নীলকণ্ঠের মত আত্মসাৎ করিয়া অমৃতবর্ষণ করিয়া যায়, সেই ঋষির মত স্বামী তপনকে সে অপমান করাইয়াছে ঐ সব পথের কুক্কুর দিয়া!

বেদনায় তপতীর অন্তর অসাড় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কি করিবার আছে! ঠিকানা পর্য্যন্ত দিল না। বোনের ঠিকানাটাও জানিয়া লওয়া হয় নাই। তপতী চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

মিঃ চ্যাটার্জি আসিয়া কহিলেন,—ওগো শুনছো, তোমার জামাইএর কাণ্ড দেখ!

তপতী তৎক্ষণাৎ কাণ খাড়া করিল। মা বলিলেন,—খবর পেয়েছ?

—না! খুকী চিঠি পায়নি? মিঃ চ্যাটার্জি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

—না! বলিয়া তপতীর মাতা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। পুনরায় বলিলেন,—কি কাণ্ড তবে?

—অফিসের একটা কেরাণীর অসুখ ছিল প্রায় তিন চার মাস। তপন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। আজ সে ফিরে এসে আমার পায়ে আছড়ে পড়ে বল্লে—সে এনিমিক হয়েছিল, তপন তাকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছে।

—রক্ত!—তপতী শিহরিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁরে—তুইও জানিস না তাহলে! তারপর হাসপাতালে কত টাকা দিয়েছে, ঐ রকম রোগীদের কিনে রক্ত দেবার জন্যে! সেই দু'লাখ টাকায় ঐ সবই করছে বোধ হয়। আমায় বলেছিল, ভাল কাজেই টাকাটা লাগাবো বাবা!

দু'লাখ কেন দশ লাখ তপন খরচ করুক, সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিক, কিন্তু নিজের রক্ত কেন দিল। কবে সে করিল এ কাজ? তপতীর সারা মন ব্যথা-কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। কারুণ্যের শীতলতম স্রোতে অবগাহন করিয়া ফিরিতেছে তাহার অন্তর। হৃদয়টা বুঝিবা ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে।

অনেকক্ষণ একা বসিয়া থাকার পর অকস্মাৎ তপতী উঠিয়া মা'র কাছে গিয়া বলিল,—ওর ঘরের চাবিটা দাও তো মা!

মা চাবি বাহির করিয়া দিলেন। তপতী আসিয়া ঘরটা খুলিয়া ফেলিল। একটা ছোট টেবিল রহিয়াছে, উপরে মোটা কাচের আবরণের প্যাড। কাচটার নীচে একখণ্ড কার্ডএ কি লেখা আছে, টানিয়া পাড়ল তপতী :—'আমার বিদায়-অশ্রু রাখিলাম, লহ নমস্কার'

তপতীর স্নায়ুতন্ত্রী অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। সামলাইবার জন্য সে টেবিলের উপরেই মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল তপনেরই চেয়ারটায়।

কতক্ষণ কাটিয়াছে খেয়াল নাই তাহার, মা স্নেহভরা তিরস্কার করিয়া ঢুকিলেন—কি তুই করছিস খুকী! স্বামী সবারই বিদেশে যায়, অমনি করে কাঁদে নাকি তার জন্যে? আয়, খেতে আয়।

—কাঁদিনি মা, যাচ্ছি—তুমি যাও—যাচ্ছি আমি!

তপতীর কণ্ঠস্বরে মা অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িলেন। প্রশ্ন করিলেন, —এমন করে কেন কথা বলছিস্ খুকী? চিঠি না পেলে কি অত করে কাঁদে?

ঠাকুর্দ্দা আমায় ঠকায় নি মা, ঠকায়নি গো, ঠকায় নি! বলিতে বলিতে তপতী ছুটিয়া গিয়া পড়িল পিতামহের প্রকাণ্ড অয়েল-পেন্টিংটার পদপ্রান্তে!

বিমূঢ়া মাতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যথিত নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন, স্নেহময় পিতা ছুটিয়া আসিয়া হাজার প্রশ্নে তপতীকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু তপতীর মুখ হইতে শুধু একটি মাত্র কথাই বাহির হইল,—ও আর আসবে না মা, আসবে না!

দিনের পর দিন, করিয়া দীর্ঘ দুইমাস অতীত হইয়া গেল, না আসিল তপন, না-বা তাহার চিঠি। প্রতীক্ষমানা তপতী ম্লান হইতে ম্লানতরা হইয়া উঠিয়াছে; বিশুষ্কা, বিবর্ণা হইয়া উঠিয়াছে তাহার রক্তাভ কপোলতল। তপতী আশা ছাড়িয়া দিয়াছে তপনের, মিঃ চ্যাটার্জিও আর

আশা করেন না, কিন্তু তপতীর মা এখনো আশায় বুক বাঁধিয়া আছেন—তপন তাঁহার ফিরিয়া আসিবে। অমন ছেলে, হৃদয়ে যাহার অতখানি কোমলতা, সে কি তাহার বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে! নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। হয়ত কোন বিপাকে পড়িয়াছে। হয়ত অসুস্থ হইয়াছে—হয়ত—না, মা আর অধিক ভাবিতে পারেন না।

তপতীকে প্রশ্ন করা বৃথা; সে কাঁদে না পর্য্যন্ত, উদাস দৃষ্টিতে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে। বাবা একদিন ডাকিয়া বলিলেন,—চল খুকী, পূজার বন্ধে শিলং যাই, নতুন বাড়ীটা দেখিস নি তুই।

তড়িতাহতের মত তপতী চমকিয়া উঠিল। ঐ বাড়ীতে তাহাদের মধুচন্দ্রিমা যাপনের কথা ছিল। নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস আর কি!

বুদ্ধিমতী তপতী বুঝিতে পারিয়াছে, পিতামাতার হৃদয়ে সে কি দারুণ শেল বিঁধিয়াছে। তপন তো যাইত না, তপতী যে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, একথা কেমন করিয়া সে বলিবে! শত অপমান সহ্য করিয়াও তপন যায় নাই, গিয়াছে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া। কিন্তু যেদিন সে গেল, সেদিন তো তপতী তাহাকে চাহিয়াছিল। তপনের মত আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান কেন সে কথা বুঝিল না!

চিন্তার কূল-কিনারা নাই। কলেজ হইতে ফিরিয়া সেই যে তপতী ঘরে ঢোকে, আবার বাহির হয় রাত্রে খাইবার সময়। বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কাহারও সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিতে চাহে না। মা সেদিন বহু কষ্টে তাহাকে বাহির করিয়া 'লেকে' বেড়াইতে লইয়া গেলেন। তপতী জলের ধারে গিয়া বসিতে যাইতেছে,—হাসির শব্দে চাহিয়া দেখিল, শিখা এবং মীরা বসিয়া আছে অদূরে একটা বেঞ্চে। তপতী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, মীরাই বটে। মাকে বলিল,—ঐ শিখার কাছে বসে রয়েছে মা, ওর বোন! মাতা সাগ্রহে বলিলেন,—আয় তবে দেখি—আয় শীগ্‌গীর—মা তপতীকে টানিতেছেন। কিন্তু তপতীর ভয় করিতেছে। যদি মা'র

সম্মুখেই মীরা তাহাকে অপমান করিয়া বসে! করিবেই তো! তপতী যাইতে চাহিতেছে না। মা কিন্তু টানিয়া লইয়া গেলেন। তপতী ধীরে ধীরে গিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল,—শিখা! উভয়েই চকিতে চাহিল। শিখা দৃষ্টি নত করিয়া বলিল,—আয়, বোস্! মীরা কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন,—তুমি তপনের বোন? তোমার দাদার খবর…

—তার তো আর কিছু দরকার নেই! মেয়ের বিয়ে দিন গে আবার। দাদা এসে মুক্তিপত্রটা রেজিষ্টারী করে দেবেন, যেদিন বলবেন আপনারা!

মা একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন,—সে কি কথা মা! কি বলছো তুমি?

অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিল মীরা, কহিল,—আপনার খেলুড়ে মেয়ে বুঝি কিছুই বলেনি আপনাকে। বেশ, বেশ, আমি বলে দিচ্ছি। আপনার মেয়ে আমার দাদার কাছে মুক্তি চেয়ে নিয়েছে—বেশ স্থির চিত্তেই—যাকে বলে 'কুল ব্রেনে'। দীর্ঘ সাত মাস ধরে দাদা তাকে ভাববার সময় দিয়েছিল—আর সেই সাত মাস আপনার গুণবতী কন্যা আমার দেবতার মত দাদাকে নিজে অপমান করেছে, বন্ধু দিয়ে অপমান করিয়েছে, শেষকালে একজন বন্ধুর কোলে শুয়ে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছে মুক্তি। যান এখন সেই বন্ধুটিকে কিম্বা যাকে ইচ্ছে জামাই করুন গিয়ে।—মীরা খানিকটা দূরে চলিয়া গেল। শিখা নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে তপতীর দিকে! তপতীর দেহের সমস্ত রক্ত যেন শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতেছে। মা'র কিছুক্ষণ সময় লাগিল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে, কিন্তু তপতীর এই দুই মাসের আচরণ তাঁহাকে চকিত করিয়া দিল—ইহা সত্য অতিরঞ্জন নহে।

—'খুকী!' মা ডাকিলেন। তপতী সাড়া দিতে পারিতেছে না। —এমন সর্ব্বনাশ তুই করেছিস খুকী? বল—উত্তর দে! তপতী কাঁপিতেছিল, শিখা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। অস্থির হইয়া মা মীরাকে গিয়া ধরিলেন,—তোমার দাদা কি ফিরেছে মা?

—না, ফিরতে দেরী আছে! কিন্তু তার ফেরায় আপনার আর কি কাজ? আমার দাদা আপনার মেয়ের যোগ্যপাত্র নয়; যোগ্যপাত্র দেখুন গিয়ে।

কি কথা বলিবেন, মা খুজিয়া পাইতেছেন না। মীরাকে এতটুকু চটানো তাঁর ইচ্ছা নয়। অত্যন্ত সাবধানে তিনি বলিলেন,—মুক্তি চাইলেই কি হয় মা? আমরা ওকে তপনের হাতে দিয়েছি—ও ছেলে মানুষ—যদিই বা···

মীরা আবার সজোরে হাসিয়া উঠিল,—ছেলে মানুষ! বেশ মা, আপনার ছেলেমানুষ খুকীকে জিজ্ঞেস করুন তো, রাত বারোটার সময় ক্যাসানোভায় বসে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে ধর্মান্তর গ্রহণ করার মতলব আঁটা কোন দেশী ছেলেমানুষি?

তপতী রুদ্ধশ্বাসে মীরার কথা শুনিতেছিল সরোষে কহিল,—মিথ্যা কথা!

—চুপ কর শয়তানী! আজন্ম সত্যসিদ্ধ তপনের বোন শ্রীমতী মীরা কোন কালে মিথ্যে বলে না। ডাইরীতে তারিখ অবধি লিখে রেখেছি, তোদের দু'জনার ফটো পর্য্যন্ত তোলা হয়ে গেছে। আর চাস্ প্রমাণ?

মা বুঝিলেন, তপতী বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে। তপতী করুণ কণ্ঠে কহিল,—প্ল্যানটা আমার নয় মা, মিঃ ব্যানার্জি বলেছিলেন একদিন···

—বেশ! রাজি হোন গে এবার—মীরা আরো খানিকটা চলিয়া গেল।

মা মীরাকে কোনরূপে একবার তপতীর বাবার নিকট লইয়া যাইবার জন্য হাতে ধরিয়া বলিলেন,—তুমি একবার আমার বাড়ী চলো মা, ওর বাবাকে সব কথা বলো গিয়ে।

—কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই মা, যার সঙ্গে খুসি, আপনার খুকীর বিয়ে দিন গে।

—হিন্দু মেয়ের কি দু'বার বিয়ে হয় মা?

—খুব হয়! আপনাদের আবার হিন্দুত্ব! হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, আপনারা কিছু নন…

—যাবে না মা একবার? চলো—লক্ষ্মী মেয়ে আমার, চলো!

—যেতে পারবো না—মাফ করবেন। যে বাড়ীতে আমার দাদার অসম্মান হয়, সে বাড়ীর ছায়াও আমি মাড়াইনে!

—তোমার দাদা তাহলে নিশ্চয় ফিরবে না?

—আমার দাদা আপনার ধন-দৌলতের প্রত্যাশী নয়। আপনার সঙ্গে আর কি সম্পর্ক তার?

ক্রোধে অকস্মাৎ তপতী জ্ঞানহারা হইয়া উঠিল। এই ভণ্ডামী তাহার অসহ্য, বলিল,—দু'লাখ টাকাটা বুঝি খোলাম-কুচি? সেটা গ্রহণ করতে তো বাধেনি?

হাসিতে মীরা ফাটিয়া যাইবে যেন! হাসি থামিলে বলিল,—ঐ দু'লাখ টাকা আপনার দ্বিতীয় বিয়েতে যৌতুক দিয়ে আসবো গিয়ে!

শিখা ম্লানকণ্ঠে কহিল,—ছিঃ তপি, টাকার কথাটা তুলতে তোর লজ্জা করলো না?

মীরা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া ডাকিল,—আয় রে শিখা! শিখাও চলিয়া যাইতেছে। মা ছুটিয়া আসিয়া তপতীকে কহিলেন,—তুই নিজে একবার ডাক খুকী। যন্ত্র-চালিতের মত তপতী গিয়া মীরার হাত ধরিল, বলিল, —আসুন—চলুন আমাদের ওখানে—।

সরোষে মীরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—ছেড়ে দিন, আপনাকে ছুঁলে গঙ্গা নাইতে হয়। অকস্মাৎ ক্রোধে তপতীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! কী এমন সে করিয়াছে যাহাতে তাহাকে ছুঁইলে গঙ্গা নাইতে হইবে?

সক্রোধে সে বলিয়া উঠিল,—যান, যান, আপনার দাদা না এলেও আমার চোলবে। গাড়ীটায় 'ষ্টার্ট' দিয়া 'ষ্টিয়ারিংটা' ধরিয়া মীরা অত্যন্ত সহজ সুরে কহিল,— তাই চলুক।—

'তোমারে যে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায়
ভাল মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তা'রি আপনারে দিও তুমি বলি !'

মীরা কি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছে ! তাহার শান্ত কণ্ঠস্বর তপতীকে অভিভূত করিয়া দিল। এই অত্যন্ত কোপন স্বভাবা মেয়েটি এত সহজে তাহাকে কবিতা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারে ! মীরার হাতটা পুনরায় ধরিতে গিয়া তপতী বলিল,—যাবেন না একবার ?

হাতটা সরাইয়া গাড়ীখানা চালাইয়া দিতে দিতে মীরা কহিল—না, এখনও আমার সময় হয়নি ! 'সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।'

শিখা ও মীরা এক গাড়ীতেই চলিয়া গেল। মা তপতীর সঙ্গে কথা বলিতেও বিরক্তি বোধ করিতেছেন আজ। কী ভয়ানক কাণ্ড তপতী করিয়াছে ! অথচ কিছুই তাঁহারা জানেন না ! তপতী আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া এক কোনে বসিল। মা বুঝিলেন, কথা সে আর কহিবে না। বাড়ী যাইবার জন্য তিনিও গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে শিখা কহিল,—তপতী কিন্তু একবারে বদলে গেছে মীরা—বড্ড রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা !

—একটুও বদলায় নি। তুই জানিস কচু ! ও মেয়ে অত শীগ্‌গীর বদলাবে !

—কিন্তু যদি সত্যি বদলায়, তাহলে কি দাদা নেবে ওকে আবার ?

—না, সে অসম্ভব। ও অন্য কাউকে বিয়ে করলেই আমাদের ভাল হয় !

শিখা চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কহিল,—দাদা যে নীল গোলাপ ফুটালো—যার জন্য কৃষি প্রদর্শনী ওকে প্রথম পুরস্কার দিয়েছে, সে গোলাপের নাম 'নীল-গোলাপ' কেন দিল, জানিস্ ?

—না ভাই, জানি না তো! মীরা চাহিল শিখার দিকে!

—তপতীর মা'র নাম নীলা! ওঁর নামটা দাদা অমর করে দিল!

—ওঃ! দাদা একদিন বলেছিল,—শাশুড়ীর স্নেহঋণ কি দিয়ে শুধবো মারা—তাই চাষ করতে আরম্ভ করেছি। তাই বুঝি 'নীল গোলাপ'!

উভয়েই চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ। মীরাই কথা কহিল,—পুরস্কারের টাকাটা দাদা বোটানী শিক্ষার জন্য দান করেছে।

—আমাকে লিখেছে চিঠিতে। কিন্তু বিদেশে দাদা আর কতদিন থাকবে রে?

—কাজ হয়ে গেছে। এবার ফিরবে, এই মাসেই; দুজনে একসঙ্গে দেশে যাবো।

মীরার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইতে গিয়া করুণ হইয়া গেল। বলিল, —ঐ হতভাগীটাও যেতে পারতো! শিখা, আজ 'ঠাট্টা করে উড়াই সখী, নিজের কথাটাই।'...কেঁদে কি করবো বল! আমার কতদিনের সাধ, দাদা গল্প বলবে, তার ডানদিকে থাকবো আমি, বাঁদিকে বৌদিদি —দুজনায় ঝগড়া করবো আবার ভাব করবো!...সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটা মীরা আর চাপিতে পারিল না।

শিখার দুই চোখে জল টলমল করিতেছে। মুছিয়া আস্তে কহিল, —বিয়ের সময় আমি থাকলে এমনটা হয়ত হোত না। ওর বন্ধুগুলোই ওকে ভুল পথে চালিয়েছে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। কিন্তু আমার আশা ছিল, ওর মা ওকে সামলে নেবেন!

—ছন্নমতিকে কেউ সাম্‌লাতে পারে না শিখা। ওর পতন বোধ হয় বিয়ের পূর্ব্বেই হয়েছে—ও আর পবিত্র নেই, মনে হয়।

—আমি কিন্তু তা মনে করিনে মীরা। ওর বাল্যজীবন বড় সুন্দর। আর ও বন্ধুদের কেবল খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতো। কেউ ওর মন কোনদিন

এতটুকুও টানতে পারে নি। আজও যে ও কাউকে ভালোবাসে তা আমার বিশ্বাস হয় না—হয়তো সে···

বাধা দিয়া মীরা বলিল,—তাতে ক্ষতি বেশী আমাদের। ও বিয়ে না করলে দাদা শান্তি পাবে না। দাদা ওকে নেবে না, এ সূর্য্যের মত সত্য —ভালবেসে ও মরে গেলেও নয়। দাদার সত্য কিছুর জন্য ভাঙ্গে না শিখা, একথা তুই-ও তো জেনেছিস্!

—হুঁ, বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরকণ্ঠে কহিল, —দাদা মুক্তিটা না দিলেই পারতো। অত শীগ্‌গীর কেন দিল ভাই?

—তুই বন্ধুর দিকটা বেশী মমতায় দেখছিস শিখা, দাদার দিকটা তেমনি দেখ দেখি! মিঃ ব্যানার্জির কোলে মাথা রেখে সে দাদাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, মুক্তিই সে চায়, দাদাকে চায় না। সেদিনের সে-চাওয়ায় তার কোন ছলনা ছিল্ না। ছিল সত্য, সহজ চাওয়া।

—কিন্তু আজ সে আবার দাদাকে চাইছে কেন? ভালোবাসছে বলেই তো!

—ও প্রেম অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী শিখা! দাদা চলে যাওয়ায় ওর নারীত্ব-গর্ব্বে আঘাত লেগেছে। দাদাকে ও বশ করতে পারলোনা বলেই এই আকুতি ওর। তুই এত পড়াশুনো করেছিস, এসব কিছু বুঝিস নে! উপেক্ষা সইতে পারে না নারীহৃদয়। দাদাকে পেলে ও আবার অপমান করবে।

—কিন্তু এবার বিরহের আগুনে খাঁটি হয়ে ও দাদাকে সত্যি ভালোবাসতে পারে তো?

—সেদিন যেন না-আসে শিখা, সে কামনা আর করিস নে। ও যাক্!

শিখা চুপ করিয়া গেল। তপতীর অদৃষ্টের নির্ম্মমতা তাহাকে অত্যন্ত বিমনা করিয়া তুলিতেছে তপনের জন্যও মন কাঁদে। কিন্তু তপন অসাধারণ শক্তিমান মানুষ, সমস্ত দুঃখ সে সহ্য করিতে পারিবে, কিন্তু

তপতী—যদি সত্যই সে তপনকে আবার ভালোবাসে তবে তাহার জীবন দুঃখের অমানিশার চেয়েও কালো !

—বিনুদার খবর কি রে ? কত গরু হোল তোর গোয়ালে ? মীরা প্রশ্ন করিল।

—তা হাজার খানেক। আমি রোজই যাই ওঁর সঙ্গে দমদম। আজ তুই আসবি বলে গেলাম না।

—দুজনে তোরা অত গরুর যত্ন করিস্! দুধটা কি করিস ভাই ?

—যত্ন করবার জন্য লোক রয়েছে। দুধটা বিক্রী করা হয়, একচতুর্থাংশ বিলি করা হয় শিশু আর রোগীদের। গোবরে হয় দাদার চাষ-বাড়ীর সার। খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না বলে দুধের চাষ করা ভাই! দেশের লোক দুধ খেয়ে বাঁচুক।

—আমার ওঁকে দাদা আদেশ করেছেন, বিনি মাইনের স্কুল কলেজ করতে। খরচ অবশ্য দাদার সমস্ত উপার্জ্জন, আমাদের আয় আর দেশের বড় লোকদের তহবিল থেকে আসবে। কিন্তু পড়ানো হবে খাঁটি বৈদিক প্রথায়, আর ছাত্র হবে যাদের একপয়সা দেবার সামর্থ্য নেই। তার নারীবিভাগের কর্ম্মী হবো তুই আর আমি! দাদার মনে কষ্ট আছে, পয়সার অভাবে কলেজে পড়তে পায়নি। তাই গরীবদের জন্যই তার স্কুল কলেজ। কোন বড়লোকের ছেলেমেয়ে সেখানে ঠাঁই পাবে না।

শিখাও কথাটার কিছু কিছু জানিত। বলিল,—আরম্ভ হোক, আমরা তো আছিই।

—হয়ে গেছে আরম্ভ! শিবপুরে আমাদের যে হাজার বিঘে পতিত জমি ছিল সেখানে পাঁচ শো খোলার কুঁড়ে ঘর তৈরী হয়েছে। গেটে লেখা হয়েছে—

'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।
'মানুষের মাঝে, হে মানুষ—তুমি সত্যেরে দিও ঠাঁই॥'

শেষের লাইনটা অবশ্য দাদার রচনা—মীরা আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

শিখা মীরার মনের তল পাইতেছে না। তপতীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ব্যথিতা শিখা মীরার কলহাস্য শুনিয়া কহিল,—মীরা, দাদা মহতোমহীয়ান, এ কথা তুই জানিস, আমিও জানি। কিন্তু তপতীর জন্য তোর মন কি এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না আজ?

মীরা মিনিটখানেক চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল,—সে কথা তোকে অনেকক্ষণ বলেছি সখী, ঠাট্টা করেই আজ ওড়াতে চাইছি আমার সেই একান্ত আপনার কথাটা। তাহার কণ্ঠস্বরে শিখা চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, মীরার দুই গণ্ড অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া গেছে।

মা'র মনে যে আশাটুকু ছিল তাহা একেবারে নিবিয়া গেছে। স্বামীকে সমস্ত জানাইতে তিনিও কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তপতী মা-বাবার সুমুখে আসাটা এড়াইয়া যাইতেছে। কিন্তু এমন করিয়া দিন চলা কঠিন! পূজায় কলেজ বন্ধ হইলে পিতা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—যা হবার হয়ে গেছে; তুই ভাল করে পড়াশুনো কর; যদি নিতান্তই সে না ফেরে—তখন অন্য পথ দেখা যাবে।

তপতী চুপ করিয়া রহিল। বাবা তপনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, ইহা সে জানে! বাবা আবার বলিলেন,—তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে, তোর সুখের জন্য সবই আমরা করতে পারি খুকী—তোর আবার বিয়ে দেব—।

কথাটা বলিয়াই যেন মিঃ চ্যাটার্জি চমকিয়া উঠিলেন।

তপতী এখনো কোন কথা কহিল না দেখিয়া তিনি, 'আঙুর ফল টক' এই নীতি অনুসরণ করিবার জন্যই বোধ হয়, এবং তপতীর নিকট তপনকে এখন খাটো করিবার জন্যই হয়ত বলিয়া উঠিলেন,—এতো গোঁয়ার সে, জানলে কি বিয়ে দিতাম! আমারই বোকামী!

মা কথাটা কিন্তু সমর্থন করিতে পারিলেন না, নীরবেই বসিয়া রহিলেন!

—কাপড়চোপড় গুছিয়ে নে—কাল শিলং যাব সবাই বলিয়া বাবা চলিয়া গেলেন।

কাপড়চোপড় গুছাইয়া তপতী শিলং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। নাই যদি আসে তপন, কী সে করিতে পারে! তপনকে পাইলে হয় তো সে সুখীই হইতে পারিত, কিন্তু যদি একান্তই না পাওয়া যায় তো তপতী কি তাহার পিতামাতার বুকে শেলাঘাত করিয়া বিধবার মত বসিয়া রহিবে! এই কয়দিন ধরিয়া তপতী বারম্বার এই চিন্তাই করিয়াছে। যে লোক একটা দিনের জন্য এতটুকু রাগ দেখায় নাই, একটু প্রতিবাদমাত্র করে নাই, সে কিনা একেবারে অকস্মাৎ সমস্ত ছাড়িয়া চলিয়া গেল! তপতী ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তাহার পিতার কোটি মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি, তাহার অতুলনীয় রূপগুণ, তাহার মাতার এত যত্ন আদর, কিছুই কি তপনকে পুনরায় এখানে ফিরাইয়া আনিতে পারে না! থাক্—ফিরিবার দরকার নাই; তপতী তাহার ভাগ্য-বিধাতার উপরেই নির্ভর করিয়া চলিবে। এমন কিছুই ভয়ঙ্কর অপরাধ তপতী করে নাই, যাহার জন্য তপন তাহাকে এমন ভাবে ত্যাগ করিতে পারে। অকস্মাৎ তপতীর মনে পড়িল তপনের কথাটা—'ত্যাগ মানে মুক্তি, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, লঘিষ্ঠ থেকে গরিয়ানে।' হাঁ, মুক্তিই সে তাহাকে দিয়া গেছে। বেশ, —তপতীরও চলিয়া যাইবে।

শিলংএ আসিয়াই আলাপ হইল মিঃ রায়ের সহিত। রূপবান্ যুবক, সঙ্গীতে তাঁহার অসামন্য অনুরাগ, অই-সি-এস পাশ করিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্রই কার্য্যে যোগদান করিবেন।

মিঃ চ্যাটার্জি সাদরে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া কন্যার সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তপতী মা'কে বলিয়াছে,—যদি সে একান্তই না আসে

মা,—আমাকে বিবাহিতা বলে পরিচয় দেবার কি দরকার এখানে!—মা-বাবা কোন উত্তর দেন নাই। তপতী মিস্ চ্যাটার্জি নামেই সম্বোধিতা হইতেছে। মিঃ রায়ও তাহাই জানিয়া রহিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই মিঃ রায়এর অসামান্য বাক্পটুতা, অনুপম সঙ্গীতকুশলতা এবং বিলাতী ধরণধারণের গুণে তপতীর জরাক্রান্ত মনটা শীতলতার দিকে নামিতে লাগিল। রোজই তাহারা দল বাঁধিয়া বেড়াইতে যায়—পাহাড়ের গাম্ভীর্য্য, ঝরণার চাপল্য, পাইন বনের শ্যামল সুষমা চোখ জুড়াইয়া দেয়, মন ভরাইয়া তুলে।

পূজার সময় শিলং-প্রবাসী বাঙালীগণ একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তপতী দুই দিনেই তাহার নেত্রী হইয়া পড়িল। এসব কাজে সে চিরদিন দক্ষ। তাহার পটুতা মিঃ রায় দুই চোখ ভরিয়া দেখেন, আর বলেন,—'দি এঞ্জেল অব পাইন বন—দি ডিভাইন নাইটিংগেল'...

তপতী রুমাল দিয়া তাঁর গায়ে ছপ্ করিয়া আঘাত করিয়া বলে, 'নটি বয়'!

অভিনয়ের আয়োজন সমারোহে চলিতেছে। বিজয়ার দিন অভিনয়। কল্যাণী দেবী কহিল,—মিস্ চ্যাটার্জির সঙ্গে মিঃ রায়ের বিয়ের দৃশ্যটা বড্ড হাসির।

—কেন? প্রশ্ন করিল তপতী।

—মিঃ রায় বিলেতে কিছু করে এসেছেন কি-না, কে জানে!

—অভিনয়ে তার কি ক্ষতি হবে? তপতী রূক্ষস্বরে প্রশ্ন করিল।

—অভিনয়টা মাঝে মাঝে সত্য হয়ে ওঠে কি না। কথাটা বলিয়া কল্যাণী হাসিল।

—আপনার কথাটাকে সত্যের মর্য্যাদা যদি উনি দেন কল্যাণী দেবী, তা'হলে আমি আপনাকে নিজের খরচে বিলেত পাঠাব 'এন্কোয়ারী' করতে—বলিলেন মিঃ রায়।

মিঃ রায়ের এই কথায় সবাই হাসিল।

কল্যাণী কহিল,—আপনি তো বেশ চালাক! আমার কথাটাকেই ঘুরিয়ে ওর কাছে 'প্রপোজ' করে বস্‌লেন! বুদ্ধি আপনার সত্যি হাকিমের মত!

অতসী কহিল,—হাকিমী আর করার দরকার হবে না, হুকুম তামিল করবেন এবার থেকে!

তপতী এতক্ষণে চুপ করিয়াই ছিল। হঠাৎ একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই কহিল, —ঠাকুরদা বলতো, যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই, আপনাদের দেখছি সেই অবস্থা! কিন্তু আমার একটা কথা আছে।

সমস্বরে প্রশ্ন হইল? কি?

—বিয়ের দৃশ্যটা বাদ না দিলে নাটকের মর্য্যাদা থাকবে না! বিয়ের বন্ধনে ঐ নায়ক-নায়িকাকে বাঁধা যায় না। নাট্যকার বিয়ের কথা মোটে লেখেন নি?

—নাটকটা ভাল বলেই আমরা নিয়েছি। কিন্তু পূজোর দিন একটা করুণ নাটক!

তপতী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—এই জগতে বহু মানুষের মনে ওর থেকে ঢের বেশী করুণ নাটকের অভিনয় হচ্ছে।

প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল। অর্থাৎ তপতীর কথার প্রতিবাদ করিতে কেহই উৎসাহ দেখাইল না। তপতীর এ রকম করার উদ্দেশ্য কিন্তু মিঃ রায় বুঝিলেন না। মিলনের দৃশ্যটা তিনিই লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত অংশটুকুকেই তপতী পরিত্যাগ করিল কেন?

তপতীকে বাড়ী পৌঁছাইবার পথে একখণ্ড শিলাসনে বসিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—বিয়ের দৃশ্যটা কেন বাদ দিলেন মিস্ চ্যাটার্জি?

তপতী আর্টের দোহাই দিয়া কহিল,—ও বই কেন ধরলেন? আর কি বই ছিল না? জ্যোতি গোস্বামীর বই অভিনয় করা অত্যন্ত কঠিন।

—বহুদিনের বিরহের পর প্রিয়-মিলনের দৃশ্যটা ভালই জমতো!

—না; জমতো না। যাদের এতোটুকু কলা রসজ্ঞান আছে, তারা বলবে, নাটকটাকে খুন করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ মিঃ রায় চুপ করিয়া রহিলেন। বহুদিন তিনি বিলাতে থাকায় বাঙালা সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, প্রশ্ন করিলেন, —জ্যোতি গোস্বামী পুরুষ না মেয়ে! খুব ভাল লেখে বুঝি?

—জানি না, কিন্তু লেখে অদ্ভুত! বইএর নামও অদ্ভুত 'মুক্তির বন্ধন'

মিঃ রায় আশ্বস্ত হইলেন। আর্ট না ক্ষুণ্ণ করার জন্যই বোধ হয়, তপতী তাঁহার লিখিত অংশটি ছাঁটিয়া দিল; তপতীর হাতের মালা তিনি সেদিন্ পাইবেন না—'বাট্ ইফ্ গ্রেশাস গড্ উইল্স'...।

বাড়ী ফিরিয়া আপন কক্ষে একাকী বসিয়া তপতী ভাবিতে লাগিল, মিঃ রায় বেশ সুন্দর ছেলে। উহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে, অবশ্য তার পূর্ব্বে তপনের সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদটা আইনসিদ্ধ করা দরকার। যে আশা সে এতকাল পোষণ করিয়াছে, তপনকে তাড়াইয়া তাহাই ফলবতী হইয়া উঠিল! এ ভালই হইল। তপনের মত একজন নিতান্ত গোঁড়া অদ্ভুত প্রকৃতির লোক লইয়া সে করিবে কি? তাহার বর্ত্তমানের শিক্ষা-দীক্ষা মোটেই তপনের উপযুক্ত নয়। মিঃ রায়ই তাহার ভালো।

কিন্তু এত তাড়াতড়ি করিবার কি আছে? কলিকাতা গিয়া আগে বিবাহ-বিচ্ছেদটা পাকা করিয়া লওয়া যাক্—তার পর মিঃ রায়কে আরো একটু ভাল করিয়া বোঝা যাক্—এম-এ পড়াটাও শেষ হইয়া যাক—পরে দেখা যাইবে।

মিঃ রায় কিন্তু বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। আজই তো তিনি প্রায় বলিয়া ফেলিয়াছেন! ইহার মূলে শুধুই কি তপতীর রূপগুণ? না, আরো কিছু আছে,—তাহার বাবার টাকা, যে টাকার জন্য তপনকে তাড়াইয়া দিয়াছে তপতী! কিন্তু এ ভাবনাও ভাবিয়া লাভ নাই। যে তাহাকে বিবাহ

করিবে, সেই তাহার বাবার টাকা পাইবে। মিঃ রায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তিনি তো অশিক্ষিত তপন নন! টাকার তোয়াক্কা তিনি নিশ্চয় রাখেন না। মুখে পাউডার পাফ্‌টা আর একবার বুলাইয়া লইয়া তপতী মা'র কাছে আসিল।

মা কন্যার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন, কহিলেন,—তোর গলায় ইংরাজি গানগুলো বেশ মিষ্টি লাগে খুকী, ক'টা শিখলি ?

—শিখেছি তিন-চারটা। মিঃ রায়ের শেখাবার পদ্ধতিটা বেশ মা; চট্‌পট্‌ শেখা যায়।

মা খুসী হইয়া কহিলেন,—বেশ ছেলেটি। কথা-বার্ত্তা, চালচলন চমৎকার!

তপতী বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—তোমার তপনের চেয়ে নাকি!

মা ব্যথিতা হইয়া কহিলেন,—তার কথা আর কেন খুকী? সে তো সব ছেড়ে চলে গেছে!

তপতী বলিল,—এখনো বিচ্ছেদটা কোর্ট থেকে পাকা হয় নি। তুমি তো বোকা মেয়ে, বোঝো কচু! দু'লাখ টাকায় ওর পেট ভরেনি, আরো অন্ততঃ লাখ-খানেক চায়—তাই মুক্তিপত্রটা এখনো হাতে রেখে দিয়েছে!

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন,—যাক্ গে খুকী—যেতে দে!

—টাকাটাই ওর লক্ষ্য ছিল মা, আমি যে ওকে নেবো না, সে-কথা ওকে প্রথম দিনই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ঘর থেকে বার করে দিয়ে। লোকটা এতো বেশী চালাক যে সাত মাস ধরে অভিনয় করে তোমাদের ঠকিয়ে গেল। মাসোহারার টাকাটা তোমার কাছে জমা রেখে ও বোঝালো, কারো দান ও নেয় না,—আর বোকা তোমরা দু'লাখ টাকা দিয়ে দিলে—একটা হিসাব পর্য্যন্ত চাইলে না।

—কিন্তু অফিসের কেরাণীটাকে রক্ত দেওয়া ?

তপতীর একটা খট্‌কা লাগিল। পর মুহূর্ত্তেই তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহাকে সাহায্য করিল, কহিল,—ও একটা মস্ত চাল। অফিসের টাকায় তাকে হাঁসপাতালে রেখেছে—শিখিয়ে দিয়েছে ঐ কথা বলতে, কিম্বা দিয়েছে একটু রক্ত, তাতেই কি! শরীরটায় তো রক্তের তার অভাব নেই—যা খাওয়া তুমি খাওয়াতে ওকে! তপতী আপনার কথায় আপনি হাসিয়া উঠিল।

মারও মনে হইতেছে, হয়ত ইহাই সত্য হইবে। তথাপি তিনি বলিলেন,—না চলে গেলেও তো পারতো ?

—না ; ধরা ও পড়তোই ; তাই জেলে যাবার ভয়ে পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। বিস্তর বাংলা বই ও পড়েছে, বুঝলে মা, বাংলা কথা কইলে ওকে কিছুতেই ধরা যায় না !

মা সত্যই আজ বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তপন কি তাঁহাদের এমনি ভাবে সত্যই ঠকাইয়াছে !

তপতী আহার সারিয়া শয়নকক্ষে গেল। শয়নের বেশ পরিধান করিতে গিয়া সে আপনাকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিল দর্পণে। নিটোল কপোল আবার রক্তাভ হইয়া উঠিতেছে। কটাক্ষের বিদ্যুৎ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে পূর্ব্বের মত। মসৃণ বাহুতে তরঙ্গায়িত হইতেছে দেহের দ্যুতি! রক্ত-রাঙা ঠোঁটটা উল্টাইয়া তপতী আপন মনে বলিল এই ওষ্ঠে যে প্রথম প্রেমচুম্বন আঁকিবে সে তপন নয়।

ওঃ কি দারুণ ভুল সে করিতে বসিয়াছিল! শরীরটা তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল আর কি! প্রথম জীবনের প্রণয়োচ্ছাস! বোকামী আর কাহাকে বলে! সেই ভণ্ডটার জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছিল তপতী! গান গাহিতে গাহিতে তপতী শুইয়া পড়িল—'হোয়েন মাই বিলাভেড্ কামস্'...

অভিনয়ের দিন আর একবার মিঃ রায় অনুরোধ করিলেন শেষ দৃশ্যটা জুড়িয়া দিবার জন্য। কিন্তু তপতী দৃঢ়স্বরে কহিল,—না, তা'হলে আমি অভিনয় করবো না—বিয়ের বন্ধন আমি সইতে পারিনে!

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—অর্থাৎ! বিয়ে আপনি করবেন না নাকি?

কলহাস্তে সকলকে চমকাইয়া দিয়া তপতী কহিল,—বিয়ের চেয়ে বড়ো কিছু আমি করতে চাই!

মিঃ রায় কহিলেন,—আইডিয়াটা চমৎকার, কিন্তু কি সেটা?

—যিনি আমায় বিয়ে করবেন, তিনিই সেটা আমায় বলবেন!

মিঃ রায় ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—তাহা কি হইতে পারে? বিবাহের চেয়ে বড় তো প্রেম। কহিলেন,—প্রেম!

—আমি পাদ্রী নই যে যিশুকে প্রেম নিবেদন করব!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ রায় আরো খানিক ভাবিয়া বলিলেন, বুঝেছি! আপনার ইচ্ছে 'কম্পেনিয়নেট ম্যারেজ'।

হো হো করিয়া হাসিয়া তপতী কহিল,—আপনার বুদ্ধিতে কুলোবে না মিঃ রায়, চুপ করুন।

চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া মিঃ রায় থামিয়া গেলেন।

তপতী কহিল,—আমিই বলে দিচ্ছি, শুনুন; বিবাহের চেয়ে বড় হচ্ছে অবিবাহিত ছেলেদের মাথাগুলো চিবিয়ে খাওয়া!

হাসিয়া কল্যাণী কহিল,—ওরটা বুঝি এখন আস্বাদন করছিস্?

—চুপ্ কর লক্ষ্মীছাড়ি! ওঁর মাথায় গোবরের গন্ধ!

সকলেই হাসিয়া উঠিল। মিঃ রায়ও হাসিলেন, কিন্তু তপতীকে তাঁহার অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বোধ হইতেছে। উহার মনের ইচ্ছাটা কি?

অভিনয় হইয়া গেলে তিনি খানিকটা পথ তপতীর সহিত আসিতে আসিতে কহিলেন,—বিয়ে কি আপনি সত্যি করবেন না মিস্ চ্যাটার্জি?

—আমার বাবার ঠিক করা আছে একটি ছেলে। তাকে যদি বিয়ে না করি তো আপনার কথাটা তখন ভেবে দেখব!

মিঃ রায় কথা শুনিয়া দমিয়া গেলেন। আরো কিছুটা আসিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

তপতী হাসিয়া উঠিল আপন মনে। এক ঢিলে দুই পাখী সে মারিয়াছে। কৌশলে সে মিঃ রায়কে জানাইয়া দিল, বিবাহিতা না হইলেও স্বামী তাহার ঠিক করা আছে—তপনের কথাটা প্রকাশ পাইলেও আর বেশী ভয়ের কারণ থাকিবে না, দ্বিতীয়, মিঃ রায়ের অন্তরে তপতী আরো গভীর ভাবে আসন গড়িবে কিম্বা মিঃ রায় তাহাকে ভুলিতে চাহিবেন, তপতী পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়। আর সে ঠকিবে না। অবশ্য মিঃ রায়কে বিবাহ করিতে তপতীর কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না; তথাপি, মিঃ রায়ের দিকটাও সে ভালো করিয়া জানিয়া লইতে চায়। কারণ এ বিবাহ অন্তরের নয়, বাহিরের।

পরদিন সকালেই আসিল একখানি চিঠি—মা'র নামে—

'বিজয়ার সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদন, মা আপনাদের অপরিশোধ্য স্নেহ-ঋণের বিনিময়ে কিছুই আমি দিতে পারিনি। অভাগা ছেলেকে মার্জ্জনা করবেন!

ইতি—প্রণতঃ তপন।'

মা চিঠিখানার দিকে চাহিয়াই রহিলেন! কলিকাতার একটা ঠিকানা রহিয়াছে। ঐখানে হয়ত আছে সে। উঠিয়া তিনি স্বামীকে গিয়া কহিলেন,—আসতে টেলিগ্রাম করে দাও, খুকীর সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক। আর মুক্তিনামাও তো লিখিয়ে নেওয়া চাই একটা!

মিঃ চ্যাটার্জি খানিক ভাবিয়া বলিলেন,—খুকীকে জিজ্ঞাসা করেছো? কি বলে সে?

—না, ওকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নাই। টেলিঃ করে দাও এক্ষুনি প্রি-পেড্।

তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম করা হইল। উত্তরে তপন জানাইল যে, সে ত্রয়োদশীর দিন শিলং আসিবে, কিন্তু উঠিবে হোটেলে!

মা তপতীকে খবরটা জানাইলেন না। আগে আসুক তপন, মা তাহার সহিত কথা বলিবেন, তার পর যাহা হয় করা যাইবে। সত্য বলিতে কি এখনো তপনের দিকে মন তাঁহার স্নেহাতুর হইয়া রহিয়াছে।

প্রতিদিন সকালে মিঃ রায় আসেন তপতীর সহিত বেড়াইবার জন্য। সেদিনও তপতী সাজিয়া গুজিয়া মিঃ রায়ের সহিত বেড়াইতে গেল।

পথের ধারে একটা গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, মিঃ রায় একটা ডাল নোয়াইয়া ধরিলেন—তপতী ফুল তুলিয়া খোঁপায় গুজিতে লাগিল, আর দুই চারিটা ফুল ছুড়িয়া মিঃ রায়কে মারিতে লাগিল। মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন,—বড্ড বেশী 'সুইট্'…।

তপতী আর এক গোছা ফুল ছুড়িয়া দিয়া কহিল,—দেখছি, কতখানি আমার 'ইডিয়টের উইট্'।

কে একজন মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে খুব কাছে। তপতী যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—তপন! নীরবে তপন পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের বিদ্রূপ-হাসিটা বিদ্যুতের মতই তপতীর চোখে লাগিল। তপতী চাহিয়াই রহিল তপনের পানে! মিঃ রায় কহিলেন,—চেনেন নাকি?

—হাঁ—বলিয়া তপতী একটা উঁচু পাথরের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল তপন কোন দিকে যায়। কিন্তু পথের বাঁকে তপন অদৃশ্য হইয়াছে। নিশ্চয় তাহাদের বাড়ী যাইতেছে। তপতী ভাবিতে ভাবিতে আরো খানিক বেড়াইল। ও কেন এখানে আসিল। আর আসিয়াই দেখিল, তপতী মিঃ রায়ের সহিত কেমন স্বচ্ছন্দে খেলা করিতেছে। যদি দেখিয়াছে তো

ভালো করিয়াই দেখুক! যে বিদ্রূপের হাসি সে হাসিয়া গেল, তপতী তাহাকে গ্রাহ্য মাত্র করে না! হয়ত সে ভাবিয়াছিল, উহার বিরহে তপতী বুক ফাটিয়া মরিবে! হায়রে কপাল!

তপতী মিঃ রায়কে লইয়াই গৃহে ফিরিল। ইচ্ছাটা, তপনকে ভালো করিয়া দেখাইয়া দিবে, তপতী তাহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই;—তাহার জীবন-সাথীর স্থান সে অনায়াসে পূরণ করিয়া লইতে পারে।

—কৈ মা, তোমার সেই ভণ্ড ছেলেটিকে লুকোলে কোথায়? বার করো!

মা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—কাকে রে? তপন এল নাকি?

—হাঁ; কিন্তু কৈ সে? এখানে আসে নি?

—না, হোটেলে উঠবে বলেছে! এখানে কাল আসবে বিজয়ার প্রণাম করতে!

তপতী অত্যন্ত বিস্মিতা হইল। হোটেলে উঠিবে কেন? এখানে আসিতে তো কেহ বারণ করে নাই। মা'কে শুধাইল,—তুমি জানতে ও আসবে?

—হাঁ আমিই তো টেলিগ্রাফ করেছিলাম আসতে। তোর সঙ্গে একটা পাকাপাকি কথা হয়ে যাক—আর মুক্তি-নামাটাও করিয়ে নি।

—বেশ। কিন্তু বলে রাখছি, কথা যা কইবার, আমি কইবো।

মা কিছু বলিলেন না। বিকালে তপতী সুসজ্জিতা হইয়া মিঃ রায় সমভিব্যাহারে চলিল তপনের সহিত দেখা করিতে হোটেলে। তাহার আর সবুর সহিতেছিল না। মিঃ রায়কে লইয়া গিয়া তপতী এখনি দেখাইয়া দিবে যে কত সহজে তাহার যোগ্য স্বামী সে লাভ করিতে পারে!

তপন একটা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া পাইন বনের দিকে চাহিয়াছিল।

—নমস্কার তপন বাবু! প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের ওখানে না ওঠার জন্য; অনর্থক একটা 'ডিসটারবেন্স ক্রিয়েট' না করে ভালোই করেছেন।

তপন ফিরিয়া চাহিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল,—আসুন, মীরার কাছে শুনছিলাম, আপনি অসুস্থা ; আশা করি ভাল আছেন এখন !

—হাঁ, ভালো আছি। আসুন মিঃ রায়, আলাপ করিয়ে দিই। এঁর সঙ্গে আমার হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছিল একদিন ; আর তপনবাবু, ইনি মিঃ বি, সি, রায়, আই-সি-এস, বাঙলায় অনুবাদ হচ্ছে, বোকা চন্দ্র রায়, —তপতী হাসিতে উজ্জল হইয়া উঠিল—ওঁর সঙ্গে আমার ভাবী সম্বন্ধটা আশা করি আপনি অনুমান করতে পারছেন ?

মৃদু হাসির সহিত নমস্কার করিয়া তপন বলিল,—বড্ড সুখী হলুম মিঃ রায় ! প্রার্থনা করি—আপনাদের জীবনে যেন নেমে আসে পাইন বনের শীতল শান্তি, আর এই নির্ঝরিণীর নন্দিত কল্লোল !—বসুন, চা খান একটু।

তপন বয়কে চা আনিতে বলিল।

আশ্চর্য্য ! বাংলা ভাষাটা উহার কণ্ঠে কি বিদ্যুতের মতই খেলিতে থাকে ! কি কবিত্বময় ভাষা !

তপন মিঃ রায়কে বলিল,—কোথায় কর্ম্মস্থান হোল আপনার ? বাঙলার বাইরে নয় তো ?

—না, নদিয়ায়। বড্ড ম্যালেরিয়ার দেশ—তাই ভাবছি।

—ম্যালেরিয়া বুভুক্ষুর ব্যাধি। আপনাদের তো কিছু ভয়ের কারণ নেই ?

—অনুপ্রাস না দিয়ে কি আপনি কথা বলেন না তপন বাবু ?—তপতী প্রশ্ন করিল।

—অনুপ্রাসটা চ্যবনপ্রাসের মত, উপাদেয় আর উপকারী।—তপন মৃদু হাসিল।

—কথা বলার আর্টটা আপনি চমৎকার আয়ত্ত করেছেন ! তপতীও মৃদু হাসিল।

চা আসিলে তপন স্বহস্তে তিন পাত্র প্রস্তুত করিয়া মিঃ রায়কে ও তপতীকে দুই পাত্র দিয়া নিজে একপাত্র লইল ! কি কথা বলিবেন

মিঃ রায় বুঝিতে পারিতেছেন না। তপতীও কিছুটা উন্মনা হইয়া রহিয়াছে।

তপন কহিল,—মীরা অপনার কাছে বড্ড অন্যায় করেছে, আমি ওর হয়ে মাফ্ চাইছি। আপনি শিক্ষিতা, ওর মত একটা পল্লী-মেয়ের দোষ নেবেন না!

তপতীর বিস্ময় ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। তপনের ইহাও কি ভণ্ডামী! সংযত কণ্ঠে কহিল,—না, কিছু মনে করিনি। আপনি আমাদের ওখানে আজ যাবেন না?

—আজ একটু খাসিয়া পল্লীতে যাবার কথা আছে, এখুনি বেরুবো!

—সেখানে কি দরকার আপনার?—চলুন তা'হলে—আমরাও যাবো ঐ দিকে!

তপন বিস্মিত হইল তপতীর এই আহ্বানে। কিছু না বলিয়া সে বাহির হইল উহাদের সঙ্গে। তিন জনেই নির্ব্বাক চলিতেছে; প্রত্যেকের মন যেন একটা গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

পথের ধারে একটা গাছের উঁচু ডালে গুচ্ছগুচ্ছ ফুল ফুটিয়া আছে। তপতী মিঃ রায়কে বলিল,—দিন-না ফুলটা পেড়ে! মিঃ রায় দু' একবার লম্ফ দিয়াও ডালটা ধরিতে পারিলেন না। আপনার চাদরের খুটে একটা ছোট পাথর বাধিয়া তপন ডালের উপর ছুঁড়িল। সরু ডালটা নুইয়া পড়িতেই মিঃ রায়কে ডাকিয়া বলিল,—তুলে নিন ফুলটা! মিঃ রায় ঘাড় উচু করিয়া ফুলটি তুলিতে যাইতেই তাঁহার চোখে পড়িল ডালের ঝরা একটা কুটা। মিঃ রায় ফুল না তুলিয়াই চোখে রুমাল চাপিয়া মাথা নীচু করিলেন। তপন নিজেই শাখা সমেত ফুলটি ছিঁড়িয়া আল্‌গোছে তপতীর হাতে ফেলিয়া দিল, তারপর পরম যত্নে মিঃ রায়ের চোখের উপরের পাতাটি নীচের পাতার মধ্যে ঢুকাইয়া চোখ মর্দ্দন করিয়া দিতেই কুটাটা বাহির হইয়া আসিল।

এখনও তপন তাহাদের উপর এতটা সহানুভূতি কেন দেখায়—তপতী ভাবিয়া পাইতেছে না! মিঃ রায়কে সে লইয়া আসিল তপনকে আঘাত করিতে, আর তপন কি না পরম যত্নে তাহারই সেবা করিতেছে! এতটুকু বিচলিত হইল না লোকটা, আশ্চর্য্য!

—পাইন বন আপনার কি রকম লাগছে?—তপতী প্রশ্ন করিল নীরবতাটা অসহ্য বোধ করিয়া।

সহাস্যে তপন উত্তর দিল,—মা'র মুখের প্রশান্ত স্নিগ্ধতার মতো স্নেহমাখা।

দূরের একটা আবছা পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তপতী কহিল,—ঐ পাহাড়টা?

তপন নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল,—দুঃখের দিনে সুখের স্মৃতির মতো বিষাদময়।

কয়েকটা পুষ্পিত বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া তপতী বলিল,—ঐ ফুলবীথিকা।

রূপসী মেয়ের সীঁথির মতই সুন্দর, সুকুমার, ওদের সীমন্তের শোভা অক্ষয় হোক।

তপতী হার মানিয়া গেল।

একটা নির্ঝরিণীর দিকে অঙ্গুলী তুলিয়া তপতী মিঃ রায়কে কহিল,—এবার আপনি বলুন—ঐ ঝরণাটা কেমন লাগছে?

মিঃ রায় কহিলেন,—আপনার দোদুল্যমান বেণীর মতন!

হাসিয়া তপতী কহিল.—'ইউনিভার্সেল' হোল না; আপনি বলুন তো তপনবাবু!

—মৌন গিরিরাজের মুখর বাণী, বিষণ্ণা বনানীর আনন্দ কলগান, স্থিরা ধরিত্রীর অস্থির আঁখিজল।

একটি খাসিয়া মেয়ে দূরে বসিয়া আছে, তপতী কহিল,—বলুন মিঃ রায়, ঐ মেয়েটীকে কেমন লাগছে?

মিঃ রায় বলিলেন,—ওঁর সঙ্গে এ বিষয়ে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তবু বলছি, নির্জন পাহাড়ের পটভূমিকায় যেন একখানি জীবন্ত ছবি।

তপতী খুসী হইয়া কহিল,—খুব নতুন না হলেও সুন্দর! এবার আপনারটা বলুন,—তপতী অনুরোধ করিল তপনকে।

তপন কহিল,—কিন্তু আপনারও একটা বলবার আছে আশা করি, বলুন সেটা!

তপতী কহিল,—অলকার অলিন্দে বিরহিনী বধূ—এবার আপনারটা বলুন।

তপন প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চহিয়া কহিল,—চমৎকার, আমারটা আর থাক্!

—না, বলুন—বলতেই হবে—তপতী খুকীর মত আব্দার ধরিল।

—আমি যদি অদ্ভুত কিছু বলি? তপন মৃদুমধুর হাসিল।

—তাই বলুন—যা আপনার ইচ্ছে, বলুন। তপতীর আগ্রহ অদমনীয় হইয়া উঠিতেছে।

তপন বলিল,—মরণের বীথিকায় জীবনের উচ্ছ্বাস,
জীবনের যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী…

সরু রাস্তাটী নামিয়া গিয়াছে খাসিয়া পল্লীর দিকে। তপন হাসিমুখে নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল। তপতী পরমাশ্চর্য্যের সহিত কবিতাটির টীকা করিতে আরম্ভ করিল মনে মনে। কি বলিয়া গেল তপন ঐ কবিতার মধ্যে? তপতী চিন্তা করিতেছে দেখিয়া মিঃ রায় কহিলেন,—ওর কবিত্ব আপনাকে মুগ্ধ করলো নাকি মিস্ চ্যাটার্জি?

—'জেলাস্' হবেন না মিঃ রায়। ওর কবিতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নাই। আর. ও 'জেলাস' হয় না।

—না—না, 'জেলাসি' কিসের? ও তো আপনাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছে। ও কি যোগ্য আপনার?

তপতী তড়িতাহত হইয়া উঠিল। স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়াছে! না, তপতী মুক্তি চাহিয়াছিল। চাহিবার পূর্ব্বে সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও তপন তাহাকে মুক্তির কথা বলে নাই। মুক্তি দিবার সময়ও বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং মুক্তি দিয়া অজস্র উদ্বেলিত ক্রন্দনে পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল তাহার পূজার বেদীমূল।

তপনের অযোগ্যতা কোথায়। ঐ সুন্দর আননশ্রী, ঐ অদৃষ্ট পূর্ব্ব সংযম, ঐ হীরকদীপ্ত বাক্যালাপ, তপতীর অন্তর যেন জুড়াইয়া যাইতেছে। একমাত্র অপরাধ তপনের, সে দুই লক্ষ টাকার হিসাব দেয় নাই। নাই দিল—টাকা তো সে চুরি করিয়া লয় নাই, চাহিয়া লইয়াছে!

তপতী বাড়ী ফিরিতে চাহিল। মিঃ রায় আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। তপনকে তাঁহার অত্যন্ত ভয় করিতেছে। লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির—হিমাচলের মত অবিচল, আবার সাগরের মত সঙ্গীতময়। কহিলেন তিনি—আর একটু বেড়ানো যাক্ না—আসুন ঐদিকে। তপতীর ভাল লাগিতেছে না। নিতান্ত নিশ্চিন্ততায় যে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে এমন করিয়া নিঃশেষে মুছিয়া দিতে পারে, সে কে? মানুষ, না পাথর—না দেবতা?

—আর বেড়াবো না মিঃ রায়—চলুন। বাড়ী যেতে হবে আমায়!—বলিয়াই তপতী ফেরার পথ ধরিল। অগত্যা মিঃ রায়ও ফিরিলেন। সারা পথ নীরবে তপতী হাঁটিয়া আসিল; মিঃ রায়ও কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

রাত্রি গভীর!

আপন কক্ষে বসিয়া তপতী চিন্তা করিতে লাগিল, তপনের প্রত্যেকটি ব্যবহার, প্রত্যেকটি কথা যতদূর মনে পড়ে। মনে পড়িল, তাহাকে জন্মদিনে দেওয়া অশোকগুচ্ছের সহিত ঋষিজনোচিত আশীর্ব্বাদ; মনে

পড়িতেছে অন্তকার কবিত্বময় আশীর্ব্বাণী, মনে পড়িয়া গেল—'জীবনের যাতনায় মৃত্যুর মাধুরী' কি বলিয়া গেল তপন ঐ কথাটার মধ্যে ? তপতীর বিরহে তপন এতটুকু ব্যথা পাইয়াছে, তাহাতো তপতীর কোনদিন মনে হয় নাই। কিন্তু আজিকার ঐ কথাটা,—হাঁ, উহাই তপনের অন্তর-বেদনার আত্মপ্রকাশ, মধুরতম, করুণতম কিম্বা বিষাক্ত, জ্বালাময় !

তপতীর অন্তর তৃপ্তিলাভ করিতেছে। তপনের মর্ম্ম মাঝে তবে আজো আছে তাহার আসন !

ঠাকুরদা যদি একবার আসিয়া তপতীকে বলিয়া যান, প্রেমের নবীনতম বাণী তাহাকে শুনাইবে ঐ তপন, তবে তাঁহার আদরের তপতী আজ বাঁচিয়া যাইবে।—তপতী আচ্ছন্নের মত শয্যায় পড়িয়া রহিল। চিন্তাশক্তি তাহার বিলুপ্ত হইয়াছে যেন।

সকালে নিয়মিত সময়ে মিঃ রায় আসিবামাত্র তপতী জানাইল, বেড়াইতে যাইবে না।

মিঃ রায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন,—বেড়াবার জন্যই তো এখানে আসা মিস্ চ্যাটার্জি !

—সেটা আপনাদের পক্ষে—আমার আসা অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

—কে করেছে অপমান আপনাকে ?—মিঃ রায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

—ঐ তপন ! ও আমার নারীত্বকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করেছে ; আমার প্রেমধারাকে পাষাণের মত প্রতিহত করেছে. আমার বন্ধনকে বিদায়ের নমস্কারে বঞ্চিত করেছে, বলে গেছে, 'আমার বিদায়-অশ্রু রাখিলাম, লহো নমস্কার।'

তপতী হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিস্ময়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত মিঃ রায় নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তপতী আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল,—বিকালে

আসবেন মিঃ রায়—ও আসবে সেই সময়। আর শুনে রাখুন, ওকে আমি আজো ভালোবাসি! ভালোবাসি আমার শিরার শোণিতের মতো—বুকের স্পন্দনের মতো,—জীবনের যাতনার মতো।

তপতী চলিয়া গেল অন্যত্র। মিঃ রায় মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেলেন। বুঝিলেন, তপতী তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

বিকালে সুসজ্জিতা তপতী বেণী দোলাইয়া বসিয়া রহিল তপনের অপেক্ষায়। কয়েকটি নারী এবং পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মিঃ রায়ও শেষ চেষ্টা দেখিতে আসিয়াছেন। তপতী বলিল,—ওকে যে ঠকাতে পারবে, তাকে বকশিস দেব!

সলিলা বলিল,—ভারি তো! একটা পুরুষকে ভেড়া বানাতে কতক্ষণ লাগে!

মাধুরী বলিল,—অত্যন্ত সহজে জব্দ করে দিচ্ছি—দাঁড়া!

মিনতি বলিল,—পদ্মবনে পথভ্রান্ত পথিক করে ছাড়বো ওকে। কাঁটার ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবে।

তপতী বলিল,—ও কিন্তু তপন, পদ্মরাই ওর পানে চেয়ে থাকে।

মিঃ রায় ভ্রূকুটি করিলেন তপতীর শ্রদ্ধাভরা কথা শুনিয়া। বলিলেন,—গোলাপবাগে গুব্‌রে পোকার মত করতে পারলে তবে জানি!

তপতী মিঃ রায়ের অন্তরের ঈর্ষা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—গোলাপ-বাগের ও গোপন্ মধুকর, গুব্‌রে পোকার মত ও ভ্যানভ্যানায় না। ও থাকে গোপনের অন্তঃপুরে।

এমনভাবে কথা বলিতে পারিয়া তপতী যেন অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমনই দেখাইতেছে তাহার চোখ দু'টি। আপনার অজ্ঞাতসারেই

তাহার কণ্ঠে যেন আজ তপনের ভাষার মাধুরী ঝরিতেছে। ইহাই কি বৈষ্ণব-সাহিত্যের 'অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই!'

মিঃ রায় বিপদ বুঝিয়া কথা বন্ধ করিয়া দিলেন।

তপন আসিয়া প্রথমেই বাড়ী ঢুকিয়া মিঃ চ্যাটার্জি ও মিসেস চ্যাটার্জির পাদবন্দনা করিল। অতঃপর সকলকে বিনীত নমস্কার জানাইয়া আসনে বসিল।

প্রথমালাপের পর সলিলা বলিল,—আপনার কথা অনেক শুনেছি, চোখে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যাদুকর!

—আমার ভাগ্যটাকে অন্যের ঈর্ষার বস্তু করে তুলবেন না মিস্ গুপ্তা, জগতের যাদুকরের আদর এখনো রয়েছে।

—কিন্তু আপনিই বা অনাদৃত কিসে?

—না—তবে, আদরটা আমার সহ্য হয় না—তুষারের পরে যথা রৌদ্রের আদর, উত্তপ্ত বালুতে যথা আদর অশ্রুর!

কথাটার কোথায় যেন বেদনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। একটা হাসির কিছু আলোচনা হইলেই ভাল হয়। মাধুরী বলিল,—ওসব কথা থাক, চায়ের মজলিসে হাসির গল্পই জমে ভালো।

মিঃ রায়ের পটুতা এ বিষয়ে সর্ব্বজনবিদিত, কহিলেন,—রাইট, হাসি সব সময়েই কাম্য।

অন্য প্রান্ত হইতে তপতী কহিল,—সবারই মত্ সমান নয়। মানুষকে মানুষ করতে কান্নাই সক্ষম। আপনার মত্টা কি বলুন তো?—তপতী সাগ্রহে চাহিল তপনের পানে।

বিস্মিত তপন ভাবিয়া পাইল না, তপতী তাহাকে লইয়া আজ কি খেলা খেলিবে; তপতী যেন আজ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ঠেকিতেছে। মৃদু হাস্য সহকারে সে কহিল,—ওঁর মত্টাকেই তো প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ আপনার!

সুমিষ্ট একটা ধমক দিয়া তপতী কহিল—চুপ! আমার মত্ কারো

মতের অপেক্ষা রাখে না। আমার মত্ আমার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত,—মুক্ত স্বাধীন—বলুন এবার আপনারটা।

আরো বিস্মিত হইয়া তপন ধীরে ধীরে কহিল,—আমার মতে, হাসির মধ্যে কান্না আর কান্নার মধ্যে হাসিকে দেখতে শেখাই কাম্য। পৃথিবীর তিনভাগ অশ্রু-সাগরে মাত্র একভাগ হাসির দ্বীপপুঞ্জ আপাতদৃষ্টিতে মনোরম, কিন্তু কুমীরের মাঝে মাঝে জল থেকে উঠে আসার মত আনন্দদায়ক হলেও অস্বাভাবিক। হাসির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু কান্নার প্রয়োজন ততোধিক ; আনন্দ থেকেই হাসির উদ্ভব কিন্তু গভীরতম আনন্দ কান্নাতেই প্রকাশ পায়। তাই মনে হয়, হাসি-কান্নাতে মূলতঃ কোন তফাৎ নেই।

মিনতি বলিয়া উঠিল,—বড্ড দার্শনিক প্রবন্ধের মত শোনাচ্ছে। সহজ হাসি চাইছি আমরা!

তপন বলিল,—সহজ কথাটা পাত্রভেদে বদ্‌লায়। যেমন কাঠবিড়ালের গাছে ওঠা আর উদ্‌বিড়ালের জলে নামা।

মিনতি পুনরায় কহিল,—অর্থাৎ আপনি বলতে চান, আমাদের চেয়ে আপনি উৎকৃষ্ট পাত্র ?

তপন কহিল,—উৎকৃষ্টতার প্রশ্ন অবান্তর। পৃথিবীতে কাঞ্চনের প্রয়োজন থেকে কাচের প্রয়োজন কম নয়। এমন কি, ক্ষুদ্র কেঁচোরও প্রয়োজন আছে।

মুখটেপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তপতী। কাচ ভ্রমে সে তপনকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, কহিল,—আছে, কাগজি লেবু থেকে আরম্ভ করে কাঁচকলার অবধি প্রয়োজন আছে!

সকলেই মৃদুমধুর হাসিতেছে! তপনের ভাষাটাকে এভাবে অনুকরণ করিয়া তপনকেই সমর্থন করার জন্য মিঃ রায় ক্ষুণ্ণ হইতে গিয়া কথার হুল ফুটাইয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—কাচপোকারও—কেমন ?

তপতীর দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আজ তপনকে অনুকরণ করিতেছে, কিন্তু, মিঃ রায় যে ইহা সহিতে পারিতেছেন না, তাহা বুঝিতে তপতীর মূহুর্ত্ত বিলম্ব হইল না। কহিল,—

—হাঁ, কাচপোকাও ভালো, যেমন ভালো কাচের কুঁজোর জলের থেকে কৃষ্ণসায়রের কালো জল!

তপতীর এই উচ্ছ্বাসময় বাণী বিহ্বল করিয়া দিয়াছে সকলকেই। তপন সমস্তই বুঝিল; তাহার দৃষ্টি নিবিড় বেদনায় নির্ণিমেষ হইয়া উঠিয়াছে। মৃদুস্বরে কহিল,—ক'কারের কথা কলঙ্কিত হয়ে উঠছে তপতী দেবী।

মৃদু হাসিয়া তপতী উত্তর দিল,—কাপুরুষের গায়ে কাদাই ছিটানো উচিৎ।

তাঁহাকেই কাপুরুষ বলা হইতেছে ভাবিয়া মিঃ রায় ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—কাপুরুষের উল্টো লোকটি কে এখানে মিস্ চ্যাটার্জি?

তপতী কহিল,—নিশ্চিত পরাজয় জেনেও যারা সম্মুখ যুদ্ধে পিছোয় না, যেমন আপনি।

—আমি! তা'হলে কাপুরুষটি কে আবার?

তপনের দিকে আঙুল তুলিয়া তপতী কহিল,—ঐ 'ইডিয়ট্,' ঐ ভণ্ড, ঐ জোচ্চোর!

সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। মিঃ রায় আনন্দিত হইতে গিয়াও যেন ধোঁকায় পড়িয়া কহিলেন,—ছিঃ ছিঃ মিস্ চ্যাটার্জি, কি সব বলছেন আপনি?

—আপনাকে বারণ করেছি-না আমায় 'মিস্ চ্যাটার্জি' বল্‌তে? বলবেন না আর।

—কিন্তু আপনি ওঁকে অত্যন্ত অপমান করছেন মিস্ চ্যাটার্…

মিঃ রায় বাধা পাইলেন। তপতী সজোরে ধমক দিল,—'শাট্ আপ'—ফের 'মিস্ চ্যাটার্জি?'

তপতীর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া মা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, খুকী হয়ত তপনের সহিত কিছু একটা কাণ্ড বাধাইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া তপন কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—ওঁরা অতিথি, ওঁদের অসম্মান করতে নেই। মা, ওঁকে বারুণ করুন,—তপন মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল মা'র পানে।

অকস্মাৎ তপতী চেয়ার ছাড়িয়া আসিয়া তাহার সুদীর্ঘ বেণীটাকে চাবুকের মত ব্যবহার করিল তপনের বাম বাহুতে—সপাৎ সপাৎ! চীৎকার করিয়া বলিল,—ওরা তোমার অতিথি, তুমি ওদের সম্মান করবে, আর তোমার বিবাহিতা পত্নীকে ওরা বার বার অসম্মান করবে 'মিস্' বলে,—নিশ্চিন্ত বসে দেখবে তুমি? কেন? কিসের জন্যে? বলো!—তপতী আরো একটা আঘাত করিল সজোরে।

এই আকস্মিকতার আঘাতে নিথর হইয়া গেছে রঙ্গভূমি। তপনের সুগৌর বাহুতে প্রত্যেকটি আঘাত রক্তলেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। মা কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন,—কী তুই করলি খুকী!

ক্রোধ-কম্পিত তপতী চাহিয়া দেখিল তপনের শোণিতাক্ত বাহু। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তাহার সীমান্ত লুটাইয়া পড়িল সেই রক্তের উপর; তপতী যেন আজ ঐ রক্ত দিয়াই তাহার শুভ্র সীমন্ত লাঞ্ছিত করিয়া লইবে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—একটু জাম্বক দিয়ে দিই—বড্ড জ্বালা করছে গো?

তপতীর আকুল কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট নিরুপায় তপন নির্লিপ্তের মতই যেন বলিল,—এমন কিছু না! কাঁদবার কি হয়েছে? সেরে যাবে! তারপর তপতীর মাথাটি সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া মা'কে বলিল,—মা, ধরুন ওকে,—পড়ে যাবে এখুনি।

মা গিয়া তপতীকে ধরিলেন। তপতী থর থর কাঁপিতেছে। একটা নীরব নমস্কার জানাইয়া তপন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে, তপতী ছুটিয়া গিয়া তাহার পথ রোধ করিল,—যাচ্ছ যে?

আমি তোমায় মুক্তি দিয়েছি তপতী, তোমায় গ্রহণ করবার সাধ্য আর আমার নেই।

বিস্ময়ে তপতীর চক্ষু বিস্ফারিত হইবে— মুক্তি দিয়েছো?

—হাঁ; আমার সত্য বজ্রের চেয়ে কঠোর, মৃত্যুর চেয়ে নিষ্ঠুর। সত্য ভঙ্গ করে' তোমায় আমার সহধর্ম্মিণীর আসনে আর বসাতে পারবো না।

তপন চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বিমূঢ় তপতী পড়িয়া যাইবে, তপন ক্ষীপ্র হস্তে তাহাকে ধরিয়া স্নেহের শীতলতম মাধুর্য্যে কহিল, —এতদিন পরে, এমন করে' কেন তুমি আজ এলে তপতী? তুমি মুক্ত বিহঙ্গের মত নীল আকাশের বিপুল বিস্তারে পাখা মেলো, আমার ধরার ধূলিতে পড়বে এসে তার ছায়া, একটি মুহূর্ত্তের তরে যেখানে তুমি গ্রহণ করলে তোমার আসন! মুক্তির সেই অবাধ অধিকারে রইল আমাদের চির মিলনের আকুতি!

তপন চলিয়া গেল।

অকস্মাৎ তপতীর আর্ত্ত চীৎকারে দিগ্‌প্রান্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল,— ঠাকুর দা—ঠাকুর দা!

দিন, মাস, বর্ষ চলিয়া যাইতেছে।

বিশাল 'তপতী নিবাসে' তপনের পরিত্যক্ত কক্ষটিতে বসিয়া থাকে তপতী একা, আত্ম-সমাহিতা। কুণ্ঠিত পিতা আসিয়া বলেন,—তোর আবার বিয়ে দেবো খুকি, তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে…

নিয়তির মত নিষ্ঠুর ঔদাসিন্যে তপতী উচ্চারণ করে,—তাই বুঝি ঠাকুরদার সৃষ্ট দেবীমূর্ত্তিকে দানবী করে তুলেছিলে? কিন্তু ওর নিষ্ঠুর

ছেনীর আঘাতে আবার তাকে দেবী করে দিয়ে গেছে বাবা, এ মন্দিরে আর কারো প্রবেশ নেই—যাও!

স্নেহ দুর্ব্বল পিতা পুনরায় বলেন—আমার কাছে দু'লাখ টাকা নিয়ে আমারই বাবার নামে 'শ্যামসুন্দর ভিক্ষুকাশ্রম' করেছে, এতো বড়ো হৃদয়বান সে, খুকী, চল, ওকে ডেকে আনি!

হর্ষদৃঢ় কণ্ঠে তপতী উত্তর করে,—ওর সহধর্ম্মিণী আমি হয়েছি বাবা, সত্য ভঙ্গ করিয়ে বিলাস-সঙ্গিনী হতে আর চাইনে!

মা আসিয়া স্নেহ-সজল স্বরে কহেন,—এমন করে কত দিন তুই থাকবি খুকী?

তপতী স্নিগ্ধ ঔদার্য্যে আত্মপ্রকাশ করে,—এমনি করে আমরণ রাখবো আমার বিরহের চিতা-বহ্নিমান!

গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে তপনের শূন্য শয্যাপ্রান্তে নতজানু তপতীর করুণ মধুর কণ্ঠ-ঝঙ্কার শোনা যায়—

—'তোমায় আমায় মিলেছি প্রিয়, শুধু চোখের জলের ব্যবধানটুকু রইলো!'

* *

*

প্রকাশক—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়
দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর—
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।